লেখকের মুখোমুখি পাঠকেরা

বাংলা বিভাগ

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

(কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি আবাসিক স্বশাসিত কলেজ)

বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২

লেখকের মুখোমুখি পাঠকেরা

লেখকের মুখোমুখি পাঠকেরা

বাংলা বিভাগ

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

(কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি আবাসিক স্বশাসিত কলেজ)

বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২

BENGALI DEPARTMENT

Ramakrishna Mission Vidyamandira

(A Residential Autonomous College affiliated to Calcutta University)

Belur Math, Howrah-711 202 • Phone : 2654-9181/9632

Website : www.vidyamandira.ac.in • e-mail : vidyamandira@gmail.com

প্রকাশক ঃ স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ
অধ্যক্ষ
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির
বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২

মুখ্য সম্পাদক ঃ অধ্যাপক প্রসেনজিৎ বিশ্বাস

প্রকাশ ঃ ১২ই জানুয়ারী ২০১৯

ISBN No. : 978-81-934762-7-7

মুদ্রক ঃ সৌমেন ট্রেডার্স সিণ্ডিকেট,
৯/৩, কে. পি. কুমার ষ্ট্রীট, বালি, হাওড়া
দূরভাষ ঃ ২৬৫৪-৩৫৩৬

শুরুর কথা

বিদ্যামন্দিরে বেশ কয়েকবছর ধরে স্নাতকোত্তর স্তরের ছাত্রেরা বিভিন্ন সাহিত্যিকদের সাক্ষাৎকার নেয় তাদের পাঠ্যক্রমের অঙ্গ হিসেবে। তার উপরে পরীক্ষাও হয়। অনেকদিন ধরেই আমাদের মনে হচ্ছিল যে, এইগুলি যদি ছাপিয়ে বই আকার বের করা যায়, কেমন হয়। স্রষ্টা তাঁর নিজের সৃষ্টিজীবন নিয়ে বলছেন কথা – আর পাঠক সেই সামনাসামনি বসে প্রশ্ন করে যাচ্ছে, উত্তর পাচ্ছে – এমন একটা বিষয় ভাবীকালের জন্যে ধরা থাকলে তো ভালোই হয়। সেই উদ্দেশ্য থেকেই এই বইএর প্রকাশনা।

বিভাগীয় অধ্যাপক প্রসেনজিৎ বিশ্বাসের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সে সাধ্যমত চেষ্টা করে গেছে বইটা যাতে বেরোয়। ভাল লাগছে এই কথাটা বলতে যে, এর প্রতিটি লেখা ছাত্রেরা নিজেরা বাংলায় টাইপ করেছে। স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় বর্ষের (২০১৫-২০১৭) যে ছাত্রদল এখানে প্রশ্নকর্তা, তাদেরই একজন শ্রীমান বেচুরাম মণ্ডল খুব পরিশ্রম করেছে পুরো বইটিকে সাজিয়ে তুলতে। ঐ বর্ষেরই শ্রীমান সঞ্জয় দে প্রুফ দেখেছে। জানি, কিছু ভুল হয়ত থেকে গেছে ; হয়ত সব কটি উপস্থাপনা সমান গুণমানের নয়। কিন্তু এরই মধ্যে লুকিয়ে আছে সৃষ্টির অনন্য রহস্য। কাউকে আমরা তার 'জীবনচিরতে' খুঁজতে যাই নি। কিন্তু নিজের অনুভবের আয়নায় স্রষ্টা নিজেকে কেমনভাবে দেখেন, খুঁজেছি আমরা – খুঁজুক অনাগত সময়।

সূচীপত্র

বাউল সাধনার অন্য দিগন্ত : রাজু দাস বাউল
বিশ্বজিৎ মান্ডি
১

কবির মুখোমুখি : রামকিশোর ভট্টাচার্য
রঞ্জন নায়ক
৭

মধ্যযুগের সাহিত্যচিন্তক ও সাহিত্যপাঠক
অচিন্ত্য বিশ্বাস ও সঞ্জয় দে : প্রশ্নোত্তরে মুখোমুখি
সঞ্জয় দে
১৪

মুখোমুখি বিভাস চক্রবর্তী : একটি সাক্ষাৎকার
অনুদাত্ত মল্লিক
২৮

কবি মৃদুল দাশগুপ্তের মুখোমুখি
শুভায়ন সাঁতরা
৪৯

মধ্যযুগের সাহিত্য পাঠক ও সাহিত্যিক
রামকুমার মুখোপাধ্যায় : পুনর্নির্মাণে মধ্যযুগ
বেচুরাম মণ্ডল
৫১

কবি অমৃতেন্দু মণ্ডলের মুখোমুখি
অনুপ মণ্ডল
৫৭

মুখোমুখি সুব্রত পাল
বিশাল কর্মকার
৬৪

মুখোমুখি আলোক পরিকল্পনা শিল্পী : বাদল দাস
সুদীপ্ত বেতাল
৭২

অধ্যাপক কাননবিহারী গোস্বামীর সাক্ষাৎকার
প্রসেনজিৎ নায়েক
৭৯

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যচর্চাকারী
ড. সত্যবতী গিরির মুখোমুখি
আস্তিক মণ্ডল
৮৬

রাধাকৃষ্ণ লীলা পরিবেশক :
কীর্তনিয়া জয়নারায়ণ দাস মহাশয়ের সাক্ষাৎকার
প্রদ্যুৎ শীল
৯২

কাব্য-সমালোচক হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখোমুখি
সুরেশ দাস
৯৭

জহর সেন মজুমদারের মুখোমুখি
বিশ্বরঞ্জন পাইক
১০৬

গোপীনাথ কীর্তনীয়ার মুখোমুখি
সুমন কুমার বিদ
১১৩

বাউল সাধনার অন্য দিগন্ত : রাজু দাস বাউল

বিশ্বজিৎ মান্ডি

বিশ্বজিৎ : আপনি কবে থেকে বা কতদিন ধরে এই বাউল গান বা সাধনার সঙ্গে যুক্ত আছেন?

রাজু দাস বাউল : আমি ছোটোবেলা থেকেই এই বাউল গান শুনে আসছি, কেননা আমাদের বাড়িতে পূর্বপুরুষরাও এই বাউল গানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু আমি পাকাপাকি ভাবে বাউল দলে যোগ দিই পনেরো বছর বয়সে। আমাদের এটা ঐতিহ্য যে সকলেই এই বাউল গান বা সাধনার সঙ্গে যুক্ত হয়। আমি পঁচিশ বছর ধরে এই বাউল গানের সঙ্গে যুক্ত আছি।

বিশ্বজিৎ : আচ্ছা আপনি কার কাছে বাউল গানের সাধনা বা তালিম নিয়েছেন?

রাজু দাস বাউল : আমি আমার পিতৃদেব শ্যামদাস বাউল-এর কাছেই বাউল গানের তালিম নিই। আমার পিতৃদেবই ছিলেন আমার বাউল গানের গুরু।

বিশ্বজিৎ : আচ্ছা আপনার নাম তো রাজু দাস মেটে, তবে আপনি রাজু দাস বাউল হলেন কীভাবে?

রাজু দাস বাউল : হ্যাঁ, ঠিকিই বলেছেন আমার পারিবারিক টাইটেল হল মেটে। কিন্তু আমার পূর্বপুরুষরা এই বাউল সাধনার জন্যই দাস উপাধি গ্রহণ করেন।

বিশ্বজিৎ : আপনি কতদুর পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন?

রাজু দাস বাউল : আমি ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়াশোনা করেছি। কিন্তু আমার পূর্বপুরুষেরা লেখাপড়া জানতো না। তারা শুধুমাত্র বিভিন্ন জায়গা ঘুরে ঘুরে বাউল সাধনা করত।

বিশ্বজিৎ : আচ্ছা আপনার পূর্বপুরুষেরা কি এখানকারই স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন?

রাজু দাস বাউল : না, আমার পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস ছিলো বাংলাদেশের পাবনা অঞ্চল। সেখান থেকেই আমার পিতামহ এপার বাংলার এই বর্ধমান জেলায় চলে আসেন, তখন থেকেই এখানে বসবাস।

বিশ্বজিৎ : বাউলদের তো গৃহী ও সন্ন্যাসী দুই প্রকার সাধকই আছে, আপনি কোন্ ধরনের বাউল?

রাজু দাস বাউল : আমি গৃহী বাউল সাধক। সংসারধর্ম পালনের সঙ্গে সঙ্গেই আমি বাউল সাধনা করি।

বিশ্বজিৎ : আপনি কোন্ বাউল সম্প্রদায়ের অন্তর্গত?

রাজু দাস বাউল : আমি মহাপ্রভু বাউল সম্প্রদায়ের অন্তর্গত।

বিশ্বজিৎ : আপনার বাউল গানের চর্চা বা অভ্যাসের প্রক্রিয়া কী ধরনের?

রাজু দাস বাউল : আমি যেহেতু একজন সংসারী বাউল সাধক; সেহেতু আমাকে বাউল গান ছাড়াও অন্য পেশার সঙ্গে যুক্ত হতে হয়। চাষবাস ও কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত হতে হয় জীবনধারণের

জন্য; কৃষিকাজের মাধ্যমেই আমার সংসার চলে। বাউল গান করে আমি আমার মনের ক্ষুধাকে মেটাই। অন্যদিকে কৃষিকাজের মাধ্যমে উৎপাদিত দ্রব্যই আমার ক্ষুণ্নিবৃত্তিকে নিবৃত করে। আর বাউল গান চর্চার কথা যদি বলেন তাহলে, বলবো যে – আমরা প্রত্যেকদিন সন্ধ্যাবেলায় আখড়ায় বাউল গানের চর্চা করি। এছাড়া একজন বাউল শিল্পী হিসাবে আমি বলতে পারি যে, আমাদের মতো বাউল প্রিয় সাধক সকল সময়ই বাউল নিয়ে চিন্তা করে, মনে মনে নতুন সুর তৈরি করে গুন গুন করে নিজের মনে। এছাড়া তো সরকারী ও বিভিন্ন বেসকারী অনুষ্ঠানে বাউল গান করা হয়। এভাবেই আমি বাউল গানের চর্চা করি।

বিশ্বজিৎ : আপনি কোন্ ধরনের বাউল গানের চর্চা করেন?

রাজু দাস বাউল : আমি মূলত লালন ফকিরের গান ও রাধাকৃষ্ণ-কে নিয়ে যে সব বাউল গান রচিত সেগুলিই করি।

বিশ্বজিৎ : আচ্ছা আপনার তো আর্থিক অবস্থা ভালো নয়, আপনি কী করে সংসার চালান? আপনি কি লোকশিল্পী হিসেবে সরকারের কাছ থেকে মর্যাদা ও আর্থিক আনুকূল্য পান?

রাজু দাস বাউল : আমি বিভিন্ন জায়গায় বাউল গান করে যে অর্থ পাই তা সংসারে দিই, এছাড়া তো কৃষিকাজ আছেই।

হ্যাঁ, আমি লোকশিল্পীর মর্যাদা ও আর্থিক আনুকূল্য দুই পাই সরকারের কাছ থেকে। যদিও সরকারী অনুদান খুবই কম, মাসে তিন হাজার টাকা। কিন্তু সরকার আমার মতো লোকশিল্পীদের সরকারী উদ্যোগে মাসে দু-তিনটে অনুষ্ঠানে পারফর্ম করার সুযোগ করে দেয়; এর ফলে বাউল গানের চর্চা যেমন হয়, তেমনি কিছু অর্থও সংসারে আসে। এই ভাবেই আমার বাউল সাধনা চলে।

বিশ্বজিৎ : আপনি কতদিন আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে লোকোশিল্পীর মর্যাদা পান?

রাজু দাস বাউল : আমি তিন বছর আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে লোকশিল্পীর মর্যাদা পাই, যা খুবই আনন্দের বিষয়। কেননা, আগে বাউল শিল্পীদের সরকারের পক্ষ থেকে কোনো রকমের আর্থিক সাহায্য ও লোকশিল্পীর মর্যাদা দেওয়া হত না। সরকারের এই উদ্যোগের ফলেই বাউল শিল্পীরা আরো উৎসাহিত বাউল গান চর্চায়। এছাড়া সরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাউল গান গাওয়ার ফলে বাউল গান বিশ্বের দরবারে পরিচিত হয়। বাংলার লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য হিসেবে বাউল গানের এই প্রচার আমার মতো বাউল শিল্পী ও সকল আপামর বাঙালির কাছে গর্বের বিষয়।

বিশ্বজিৎ : আপনি তো বিভিন্ন অঞ্চলে বাউল গান করতে যান, সেখানকার দর্শক বা শ্রোতাদের বাউল গানের প্রতি আকর্ষণ কেমন? তারা কী ধরনের গান শুনতে চায়?

রাজু দাস বাউল : ভালো প্রশ্ন করেছেন, আমি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বাউল গান করতে গেছি, আগে বাউল গানের বহু অনুরাগী মানুষ ছিল; প্রবীণ ও নবীন সকল মানুষই বাউল গান শুনতে আসতো। কিন্তু বর্তমানে যখন কোনো জায়গায় বাউল গানের অনুষ্ঠান করতে যাই,

সেখানকার বাউল গানের দর্শক বা শ্রোতার সংখ্যা দেখে আমার নিজের দুঃখ হয়। আগে যেখানে ১,৫০০–২০০০ লোক হতো, এখন তা ৫০০–৭০০ লোকে এসে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয় বাউল গানের প্রতি নবীন প্রজন্মের রুচিরও পরিবর্তন হয়েছে। তারা এখন আর আদি বাউল গান শুনতে চায় না, তারা এখন বিভিন্ন আধুনিক গান ও দ্রুত গতি সম্পন্ন গান শুনতে চায়। এই কারণেই বাউল গানের দর্শক কমে যাচ্ছে। নবীন প্রজন্মের অনুরোধে আমাদেরকেও বাউলকে আধুনিক ভাবে পরিবেশন করতে হচ্ছে। যেমন – 'তোমায় হৃদমাঝারে রাখবো ছেড়ে দেবো না' এই বাউল গানটিকে সুরের পরিবর্তন করে পরিবেশন করতে হচ্ছে যুগের বা সময়ের চাহিদা মেনেই।

বিশ্বজিৎ : আপনি তো বাউল গানের ভূস্বামী, বাউল গানের এই আধুনিকীকরণ-কে আপনি কীভাবে দেখেন?

রাজু দাস বাউল : বাউল গানের এই আধুনিকীকরণ-কে আমি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখি। কেননা, বর্তমান প্রতিযোগিতার বাজারে লোকে বাউল গান শোনে না বললেই চলে, সেই পরিস্থিতিতে বাউলকে অন্যভাবে পরিবেশন করে মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়; সেটা বাউল গানের পক্ষে ভালো দিক। তবে বাউলের এই যে আধুনিকীকরণ তা কখনই বাউল-কে বাদ দিয়ে নয়। বাউল গানের আধুনিকীকরণের ফলে নবীন প্রজন্মও এখন বাউল গান শুনছে, বাউল গান নিয়ে চর্চা করছে। আমার নিজের একটি বাউল সঙ্গীতের দল আছে; আমি বিভিন্ন জায়গায় বাউল গানের অনুষ্ঠান করতে গিয়ে দেখেছি যে প্রথমদিকের লালনগীতির যে সুর, সেই লালনগীতির প্রতি এখন খুব কম মানুষই আকর্ষণ অনুভব করেন। এখন মানুষ গানের মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র আনন্দ উপভোগ করতে চায়, সেই গানের আনন্দের রেস ক্ষণিকের জন্য। আদি বাউল গানের যে মর্মার্থ, গভীরতা তাকে উপলব্ধি করার মতো মানুষের মন, অবসর এবং সময় কোনোটাই নেই এই যান্ত্রিক গতিময় যুগে। তাই তারা বর্তমানের দ্রুতগতি সম্পন্ন বিভিন্ন গান, মিউজিক ও বাজনার ছড়াছড়ি এমন গানের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয়। বর্তমানের এই গ্লোবালাইজেশনের যুগে বাউল গানকেও আধুনিক করে, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহকারে শ্রোতার কাছে পরিবেশন করা হচ্ছে; এর ফলে বাউল গানও বর্তমান প্রজন্মের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। যদিও এই বাজারীকরণের ফলে বাউল গানের নিজস্ব সত্তা বা বাউল গানের নিজস্ব ধরনের পরিবর্তন ঘটছে। বাউল গানের আর সেই প্রচীন ঐতিহ্য থাকছে না। বাউল গানের আধুনিকীকরণের এই নেতিবাচক দিকটি বাদ দিলে, আমার মতে অন্যান্য গানের মতো বাউল গানও সময়ের দাবী মেনে, মানুষের রুচি অনুযায়ী পরিবর্তিত হচ্ছে; এর ফলেই বাউল গান লোকে বেশী করে শুনছে। আধুনিক বাউল গানের মধ্যে বাস্তবতা ও মানুষের কথা নেই বললেই চলে। কিন্তু বাউলকে মানুষের কাছে পৌঁছাতে হলে বাউল গানের আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। বাউল গান বেশী করে মানুষ শুনলে, তবেই মানুষ বাউল সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হবে।

বিশ্বজিৎ : আপনি কী আগেকার বাউল গানের সঙ্গে এখনকার বাউল গানের বা চর্চার পার্থক্য লক্ষ করেন?

রাজু দাস বাউল : হ্যাঁ, আগের বাউল গানের সঙ্গে এখনকার বাউল গান ও চর্চার পার্থক্য লক্ষ করা যায়। আগের দিনে বাউল গান গাওয়া হত একতারা বা দোতারা সহযোগে। তখনকার দিনের বাউল শিল্পীদের কাছে বাউল গান করাটাই ছিল সাধনা। তাদের জীবনে বাউল গানই ছিল ধ্যানজ্ঞান। এই বাউল গানের জন্য তারা ভিক্ষাবৃত্তি পর্যন্ত করত। আর এখনকার বাউল শিল্পীরা বাউল গানকে পেশা হিসাবে নিচ্ছে; কেননা আমার মতো বাউল শিল্পীদের সংসার পরিজনের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিতে হয়। এছাড়া এখনকার বাউলরা বিভিন্ন রকম যন্ত্র ও বাদ্য সহকারে বাউলকে পরিবেশন করার ফলে বাউল আগের তুলনায় মানুষের কাছে অধিক জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এর ফলে বাউল গানের জনপ্রিয়তা যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি বাউল শিল্পীদের আর্থিক সমৃদ্ধি ও মর্যাদা দুইই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখনকার বাউলরা বাউল গান ছাড়াও অন্য পেশার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। কিন্তু আগেকার বাউলরা শুধুমাত্র বাউল গানকেই আশ্রয় করেই সাধনা করতো।

বিশ্বজিৎ : আপনি যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যান সেখানে কী শুধুমাত্র বাউল গানই করেন, না অন্য কোনো ধরনের গানও গান?

রাজু দাস বাউল : আমি মূলত বাউল গানই গায়, কিন্তু দর্শকদের চাহিদা অনুসারে বিভিন্ন জায়গায় ভাটিয়ালী, ভাদু, টুসু, ঝুমুর ও পল্লীগীতি গাই।

বিশ্বজিৎ : আপনি যে বললেন বাউল ছাড়াও পল্লীগীতি, ঝুমুর, ভাদু, টুসু এবং ভাটিয়ালী গান করেন তা কি আপনারই লেখা? তার যদি দু-একটা দৃষ্টান্ত দেন ও সেই সব গান সম্পর্কে আপনার অভিমত –

রাজু দাস বাউল : হ্যাঁ, আমারই লেখা। এমনই একটি পল্লীগীতির দৃষ্টান্ত হল –

"আমার এই মাটি যে খাঁটি সোনা
জনম জনম পেতে চাই
কত না গর্ব আমার
জনম নিয়ে সোনার বাংলায়।"

যে কোনো অনুষ্ঠানে পল্লীগীতি গাওয়ার আহ্বান পেলেই এই গানটিই আমি প্রথমে করি। এই গানটি আমার খুবই প্রিয়। পল্লীগীতি গাইতে আমার নিজেরও খুব ভালো লাগে। কেননা, এই পল্লীগীতির মধ্যে মাটির গন্ধ পাওয়া যায়। পল্লীগীতিতে সহজ-সরল মাটির মানুষের প্রাণের কথাকে তুলে ধরা হয়, এজন্যই পল্লীগীতি মানুষের এতো ভালো লাগে।
এবার একটা ভাটিয়ালী গানের দৃষ্টান্ত দিই –

"আরে এ পার থেকে ভেসে ভেসে
যাব ও পারেতে
মনহংস তুই সাঁতার দেরে কালি সাগরে।"

এই ভাটিয়ালী গানটি আধুনিক করে শ্রোতার কাছে পরিবেশন করা হয়। এই গানের মধ্য দিয়ে বলা হয়েছে যে, আমাদের জীবন যেন বহতা নদীর স্রোতের মতোই একপাড় থেকে অন্য পাড়ে ভেসে যায়। এই ভাটিয়ালী গান মূলত মাঝী-মোল্লারা করে। মাঝি-মল্লারা নদীর স্রোতে ভাসতে ভাসতে মনের আনন্দে ভাটিয়ালী গান করে। এই ভাটিয়ালী গানের মধ্যে দিয়ে নৌকার মাঝি-মল্লাদের জীবনের সুখ-দুঃখ, ভালোবাসা এবং আনন্দানুভূতি সব কিছুই প্রকাশিত হয়। বর্তমানে এই ভাটিয়ালী গানের সুরেরও পরিবর্তন হচ্ছে।

এবার একটি ভাদু গানের দৃষ্টান্ত দিই –

"ওরে ভাদু লে লে পয়সা দু-আনা
ও তুই কিনে খাবি মিছরীর দানা
ও পাড়াতে যাইয়ো ভাদু
আরে নাম পাড়া যাইয়ো না।"

এই সব গানগুলোই মানুষের কাছে আধুনিকভাবে পরিবেশন করার জন্যই আমি রচনা করেছি। কেননা, বর্তমান প্রজন্মের মানুষ এখন সমস্ত গানই আধুনিক সুরে শুনতে চায়; তা সে বাউল গানই হোক আর পল্লিগীতি। তাই, মানুষের রুচি অনুযায়ীই আমি ভাটিয়ালী, লোকগীতি এবং ঝুমুর গানের সুর পরিবর্তন করে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তা পরিবেশন করি।

বিশ্বজিৎ : আপনি কী আপনার উত্তরপুরুষকে এই বাউল গান বা চর্চার সঙ্গে যুক্ত হতে বলবেন? যদি বলেন তবে কেন?

রাজু দাস বাউল : হ্যাঁ, আমি আমার উত্তরপুরুষকে এই বাউল গানের যুক্ত হতে বলবো। কেননা, এই বাউল গান বা সাধনা পারিবারিক ঐতিহ্য। আমার পূর্বপুরুষরাও যেমন এই বাউল গান করেছে, তেমনি আমিও করছি; আবার আমার পরবর্তী প্রজন্মও বাউল গান করবে এটা আমি মন থেকে চাই। শুধু বাউল গান নয়, যে কোনো গানের সঙ্গে যুক্ত হলেই আমি খুশি হব। কেননা গান-বাজনার চর্চা করলে মানুষের মন ভালো থাকে। গানের সাধনা করা মানে ঈশ্বরের সাধনা করা। গানের সাধনার মধ্যে দিয়েই একমাত্র ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হওয়া যায়। গানের কণ্ঠ ঈশ্বর প্রদত্ত দান, যা সকলের থাকে না। এই কারণেই আমি আমার উত্তপুরুষকে বাউল গানের সঙ্গে যুক্ত হতে বলবো। তবে তাদের ব্যক্তিগত মতামতকে আমি গুরুত্ব দেব, তারা যদি লেখাপড়া শিখে অন্য পেশার সঙ্গে যুক্ত হয় তাতেও আমি বাঁধা দেব না। আবার, তারা যদি চায় যে লেখাপড়ার পাশাপাশি বাউল গানও করবে; সেই মতকেও আমি পূর্ণ সমর্থন জানাবো।

বিশ্বজিৎ : আপনি পরবর্তী প্রজন্মের বাউল গায়ক বা সাধকদের উদ্দেশে কী বলবেন?

রাজু দাস বাউল : বাউল গায়কদের উদ্দেশে আমি এই কথাই বলতে চাই তারা যেন বাউল গানকে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে পৌঁছে দেয়; যাতে করে বাউল গান আরো বেশী জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি যে বাউল গানকে দেশ-বিদেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। বাউল গান যে শুধু প্রবীণ মানুষদের কাছে জনপ্রিয়, নবীন প্রজন্মের কাছে নয়, এই ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করতে হবে। বাউলকে সকল মানুষের কাছে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। তার জন্য যদি বাউল শিল্পীদের অত্যাধুনিক যন্ত্র ও বাদ্য সহকারে বাউল সঙ্গীত পরিবেশন করতে হয়, তাও করা দরকার।

বিশ্বজিৎ : আপনার কী মনে হয় এই বিশ্বায়নের যুগে পরবর্তী প্রজন্মের মনে বাউল গান বেঁচে থাকবে?

রাজু দাস বাউল : এখন বাউল গানের দর্শক বা শ্রোতার সংখ্যা খুবই কম। এখনকার প্রজন্ম খুবই কম বাউল গান শোনে; তারা এখন আধুনিক সঙ্গীত ও অন্যান্য দ্রুত মিউজিক সম্পন্ন গান শুন্তেই অভ্যস্ত। বর্তমানে মানুষ এখন অতিরিক্ত সোস্যাল মিডিয়া ও ভার্চুয়াল নেট দুনিয়ায় পদার্পণ করায় মানুষের সঙ্গে মানুষের মুখোমুখি হয় না বললেই চলে। এর ফলেই একজন মানুষের সঙ্গে আর একজন মানুষের যে সম্পর্ক তাতে ফাটল ধরছে। বর্তমানে মানুষ এখন মাটির কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, এখন শহরের সব দিকেই বড় বড় ফ্ল্যাট উঠছে; এই বৈভব প্রাচুর্যময় অট্টালিকার শহরে অবস্থান করে আমরা আর মাটির গন্ধকে অনুভব করি না। বাউল গান হল মাটির গান। বাউল গান মাটির মানুষের কথা বলে, মায়ের টানের কথা, মায়ের হৃদয়ের কথা বলে। মানুষ মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও মাটির টানকে বা শিকড়কে কখনোই সে অস্বীকার করতে পারে না। মাটির টানকে অস্বীকার করলে মানুষের নিজের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে। তাই যতদিন মানুষ মাটির টানকে অনুভব করবে, মানুষের মধ্যে স্নেহ-মায়া-মমতা-ভালোবাসা থাকবে ততদিন পর্যন্ত মানুষ বাউল গানকে ভালোবাসবে। তাই, আমার মনে হয় যে এই বিশ্বায়নের যুগেও নবীন প্রজন্মের অন্তরে বাউল গানের জন্য ভালোবাসা থাকবে। শুধু বাউল গানই নয়; লোকগীতি, ঝুমুর, ভাদু, ভাটিয়ালী ও কীর্তন এই সমস্ত গানেরও পরিবর্তন হয়েছে; তবে তাকে অবক্ষয় বলা যাবে না। এই সমস্ত গানের আঙ্গিকের পরিবর্তন করা হয়েছে সময়ের বা যুগের প্রয়োজনে। অর্থাৎ মানুষের রুচি অনুযায়ী বাউল গানকেও আধুনিক করে গাওয়া হচ্ছে, এর ফলে বাউল গানের শ্রোতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে; যা বাউল গানের পক্ষে ভালো। এখন সমস্ত গানেরই আধুনিকীকরণ ঘটছে তা সে রবীন্দ্রসঙ্গীত হোক আর নজরুলগীতি। তাই বলে রবীন্দ্রসঙ্গীত বা নজরুলগীতির গুরুত্ব বা মর্যাদা কোনোটাই কমছে না; বরং আধুনিকীকরণের ফলে এই সমস্ত গানের গুরুত্ব যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি সমাজের সকল স্তরের মানুষ রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত যেমন মানুষের অন্তরে চিরকালের জন্য থাকবে, তেমনি বাউল সঙ্গীতও সকল মানুষের মনের মণিকোঠায় চিরকাল থেকে যাবে; তা সে নবীন ও প্রবীণ দুই প্রজন্মের মানুষের কাছেই।

কবির মুখোমুখি : রামকিশোর ভট্টাচার্য

রঞ্জন নায়ক

প্রশ্ন : আপনি কি আপনার সাহিত্য-জীবন শুরু করেছিলেন কবিতা দিয়ে?

উত্তর : হ্যাঁ, আমি আমার সাহিত্য জীবন শুরু করেছিলাম কবিতা দিয়েই।

প্রশ্ন : কার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আপনি কবিতা লেখা শুরু করেন?

উত্তর : আমি সাধারণ ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছি আমার মায়ের কাছ থেকে। আমার মা আমাকে মুখে মুখে রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দের কবিতা পড়াতেন এবং আবৃত্তি করাতেন। মার মুখে ছোটবেলা নানা ছড়ার কবিতা শুনতাম এবং আমার স্কুলের শিক্ষক নিত্যগোপাল ঘোষ, স্কুল ম্যাগাজিনে আমার প্রথম লেখা বেরনোর পর থেকে এখনও পর্যন্ত আমাকে উৎসাহ দিয়ে যান। পরবর্তীকালে তিন জন কবির কবিতা আমাকে ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। একজন হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, অপরজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তৃতীয় জন হলেন জীবনানন্দ দাশ। আমি মনে করি মধুসূদন দত্ত বাংলা কবিতায় একটা নতুন দরজা খুলে দিয়েছিলেন। এমনকি এখনও তাঁর কবিতা আমাকে ভীষণভাবে ছুঁয়ে যায়। আর রবীন্দ্রনাথ তো আমার সারাদিনের মধ্যেই থাকেন। জীবনানন্দ দাশও আমাকে প্রভাবিত করেছেন প্রবলভাবে, কারণ আমি বাংলার নদী, মাঠ, প্রকৃতি চিনতে শিখেছি জীবনানন্দের কবিতা থেকে।

প্রশ্ন : বর্তমানে কাব্য সমালোচকেরা কবি ও কবিতার বিভিন্ন সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করছেন, আপনার কী মনে হয় কবি ও কবিতার কোন সংজ্ঞা আছে ?

উত্তর : পুঁথিগতভাবে কবিতার একটা সংজ্ঞা থাকতে পারে। আর জীবনানন্দ দাশ একটা কথা বলেছিলেন, ‘ সকলেই কবি নয় কেউ কেউ কবি’। এই যে ‘সকলেই কবি নয়’ – আমার মনে হয় কবিসত্তা মানুষ মাত্রে সবার মধ্যে কম বেশি থাকে। মানুষ যে প্রাকৃতিক পরিবেশে বিশেষত বাংলার মাটির পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছে, সেখান থেকেই ভেতরে ভেতরে মানুষের মধ্যে কাব্যিক চেতনা তৈরি হয়। কিন্তু ভাষায় সেটাকে প্রকাশ করা বা কবিতাকে ঠিক মতো বাঁধনে বাঁধা হয়তো সবার পক্ষে হয়ে ওঠে না। কিন্তু কবি বা কবিতার সংজ্ঞা একটা থাকতে পারে এবং বিশেষত যারা আলোচক তারা যে সংজ্ঞায়িত করবেন এটাই স্বাভাবিক।

প্রশ্ন : আপনি এই যে তিনজন কবির কথা বললেন, এই তিনজন কবির মধ্যে আপনার প্রিয় কবি কে?

উত্তর : আমি প্রিয় কবি হিসাবে বেছে নেব জীবনানন্দ দাশকে। যদিও রবীন্দ্রনাথ আমাকে সমস্ত দিনই ছুঁয়ে থাকে, তবু জীবনানন্দ আমার প্রিয় কবি। কারণ জীবনানন্দের কবিতাতে আমি তরুণ বয়স থেকে এখনও পর্যন্ত আমার সমস্ত চেতনা ও ভাবনাকে খুঁজে পাই।

প্রশ্ন : আপনার কবিতা পড়ে মনে হল আপনি আশির দশকের কবি। বর্তমান সাহিত্য সমালোচকরা এই দশকটাকে গুরুত্ব দেন, দশক সম্বন্ধে আপনার মতামত কী? আপনি কী মনে করেন দশকে কবিতা পাল্টে যায়?

উত্তর : একটা কথা হচ্ছে এই যে আশির দশকের কবি এটা আলোচকেরা সংজ্ঞায়িত করেন বা চিহ্নিত করেন। কিন্তু আমার মনে হয় কবি কোনদিন কোন দশকে বা শতকে বাঁধা থাকেন না। সাধারণভাবে আলোচকেরা তাদের আলোচনার সুবিধার জন্য কবিকে দশক দিয়ে চিহ্নিত করেন। সেদিক থেকে দশক দ্বারা কবিতা চিহ্নিত করার ব্যাপারটা আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি না। তবে এটা ঠিক কথা যে, কবিতায় এক এক সময় বাঁক বদল হয়। এই যে আশির দশক বলা হয়েছে, এই আশির দশকের কবিতায় বাঁক বদল ঘটেছে। কিন্তু সবারই হয়েছে তা নয়, যেমন জীবনানন্দ দাশের পরেই বাংলা কবিতায় বাঁক পরিবর্তন হয়েছিল পাঁচের দশকে, তবুও জীবনানন্দ দাশের অনেকটাই প্রভাব ছিল তাদের কবিতায়। আবার তাদের মধ্যে থেকে উৎপল কুমার বসু, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, আলোক সরকার প্রমুখেরা কবিতার নতুন দিকে যেতে চেয়েছিলেন। ছয়ের দশকে কবিতা নিয়ে অনেকটা আন্দোলন চলেছিল, যদিও আমি এই আন্দোলনকে খুব একটা বিশ্বাস করি না। আমার মনে হয় কবির মধ্যে সবসময় একটা আন্দোলন চলতে থাকে। সে আন্দোলনটা হচ্ছে নিজেকে বার বার নতুন করে ভেঙে নতুন পথ খুঁজে পাওয়ার।

প্রশ্ন : বাংলা আধুনিক কবিতার ধারায় জীবনানন্দের সময় থেকে শব্দের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে। কবিতায় শব্দ ব্যবহার সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

উত্তর : কবিতায় শব্দ ব্যবহার অবশ্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। কারণ যদি ধরো তুমি একটা জড়োয়ার নেকলেস্ তৈরি করতে যাও, সেক্ষেত্রে পাথরগুলি ঠিক ঠিক কোন্ জায়গায় বসালে জড়োয়ার নেকলেস্টি সুন্দর হয়ে উঠবে সেটা একমাত্র জহুরী জানে। সে ছাড়া অন্য কেউ খুব বেশি জানে না। ঠিক তেমনভাবে একজন কবি ভালোই জানবে তার কবিতায় ঠিক কোন্ কোন্ শব্দ বসবে। তাই কবিতায় শব্দ ব্যবহার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে শব্দের অর্থও পাল্টে যায়। এ বিষয়ে তোমাকে বলবো অনেক আলোচক বিশেষত যারা উত্তর আধুনিক কবিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন, তারা শব্দের মিনিং নিয়ে কথা বলেছেন। আর এই শব্দের মিনিং নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তারা দেখিয়েছেন, শব্দের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কখনো কখনো এমন অনেক শব্দ আছে যা অন্য একটি শব্দের সাথে মিশে নতুন শব্দ হয়েছে এবং যার ফলে দেখা যায় সেই নতুন শব্দের অর্থও পরিবর্তন হয়েছে। এইভাবে বাংলা সাহিত্য যুগে যুগে কালে কালে সমৃদ্ধ হয়েছে।

প্রশ্ন : জীবনানন্দের কবিতায় যেমন আমরা একটি শব্দকে বার বার ঘুরে ফিরে আসতে দেখি, যেমন - 'পেঁচা', 'ধানসিঁড়ি', 'ধূসর' প্রভৃতি, ঠিক তেমনভাবে আপনার কবিতাতেও 'জোছনা' শব্দটি বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে, আপনি কী শব্দটার মধ্য দিয়ে আলাদা কোনো দ্যোতনা প্রকাশ করতে চান?

উত্তর : হ্যাঁ। একটা কথা হচ্ছে কখনো কখনো কোনো কোনো কবির কাছে বিশেষ বিশেষ শব্দ একটু বেশি প্রিয় হয় এবং সেই শব্দের মধ্য দিয়ে কবি একটু অন্যরকমভাবে ভাব প্রকাশ করার চেষ্টা করে। জীবনানন্দের কবিতায় শব্দগুলি অনেকটা প্রতীকী হয়ে উঠেছে। এখানে আমি 'জোছনা' শব্দটি এক এক অর্থে প্রকাশ করেছি। যেমন ধরো কোন একটি সুন্দর মেয়ে বসে আছে। যেখানে বসে আছে তার রূপের যে ছটা সেটিকে মনে হতে পারে সে মেয়েটির জোছনা। এইরকম শুধু জোছনা নয়, অনেক শব্দ আমার কবিতায় ঘুরে ফিরে এসেছে, যেমন 'স্বপ্ন', 'মিথুন', 'রোদ্দুর' প্রভৃতি।

প্রশ্ন : আপনার কবিতা পড়ে দেখলাম আপনার অনেক কবিতায় সমকাল, সময়, যুগ-যন্ত্রণা বেশ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। আপনার কী মনে হয়, সময়ের জন্য কবিতা নাকি কবিতা সময়কে নির্মাণ করে?

উত্তর : আমার মনে হয় দুটোই একে অপরের পরিপূরক। কবিতা যেমন সময়কে নির্মাণ করে তেমনি কোনো সময়ও একটা কবিতার জন্ম দেয়। অর্থাৎ কিনা একটা কবিতা যেমন সেই সময়ের ইতিহাস তেমনি একটা বিশেষ মুহূর্তও সৃষ্টি করে একটা কবিতা। আমি যে সময়ে বসে লিখছি সেই সময়ের সামাজিক অবস্থা, যুগের যন্ত্রণা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা প্রভৃতি কবিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। যদি লক্ষ করো দেখবে, বাংলা সাহিত্যের আদি যুগে যে সময় চর্যাপদ রচিত হয়েছিল, সেই সময় লুই পাদ, ভুসুকু পাদ, কাহ্ন পাদ প্রভৃতির কবিতায়ও ফুটে উঠেছিল সেই সময়ের সমাজ ইতিহাস। কবিতার আর একটা বড় দিক হচ্ছে কবিতা হল এমন একটি জায়গা যেখানে সত্যভাষণ হয়। কবি তাঁর কবিতায় সত্যভাষণ করে। যার ফলে কবিতায় ধরা দেয় সমাজ ও সময়। এই ভাবে যুগে যুগে কালে কালে সময়কে ধরে নিয়ে কবিতার পথ চলা। তাই বলা যায় সময় যেমন কবিতার জন্ম দেয় তেমনি কবিতায়ও ধরা দেয় সময়ের ইতিহাস।

প্রশ্ন : আপনার কবিতায় কৃষক বা মাটির কাছাকাছি মানুষের কথা বার বার উঠে আসে, বর্তমান আধুনিক নগরায়ণের যুগে আপনার কী মনে হয় এই কৃষক বা মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষদের কথা কোথাও উপেক্ষিত হচ্ছে?

উত্তর : অবশ্যই হচ্ছে। বর্তমান আধুনিক সভ্যতায় মানুষ এতই বেশি নাগরিক হয়ে উঠছে যে, মায়ের সমান মাটি এবং তা কর্ষণকারী কৃষকের কথা ভুলেই যাচ্ছে, ভুলে যাচ্ছে তার আদি সম্পর্ক। কিন্তু আমার মনে হয় কৃষক এবং মাটি এই দুটিকে উপেক্ষা করে কোনো দিন কোনো কিছু হতে পারে না। কৃষক হচ্ছে সেই মানুষ যে আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেয়। তুমি একটা জিনিস লক্ষ করে দেখ, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ দিনের একটি রাজনৈতিক দল শাসন করা সত্ত্বেও আর একটি রাজনৈতিক দল শুধুমাত্র এই কৃষক এবং মাটিকে কেন্দ্র করে, আন্দোলন করে তাদেরকে সরিয়ে দিয়ে শাসন ক্ষমতা দখল করে। গ্রামবাংলার মানুষের কথা, কলকারখানার শ্রমজীবী মানুষের কথা অর্থাৎ কিনা আপামর সাধারণ মানুষকে উপেক্ষা করে কোনোদিন কোনো সভ্যতা বেঁচে থাকতে পারেনি, পরবর্তী কালেও পারবে না। আমি কৃষক শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করতে চাই। একজন সৃজনশীল মানুষ, কবি বলো লেখক

বলো তারাও একধরনের কৃষক। তারাও কাব্যে কৃষিকাজ করে নতুন ফসল ফলান কবিতার মধ্য দিয়ে। অতএব সৃজনশীল মানুষও উপেক্ষণীয় নয়। তোমরা দেখবে 'হল বলরাম স্কন্ধে' অর্থাৎ বলরামের কাঁধে যে অস্ত্র ছিল সেটি কিন্তু 'হল' অর্থাৎ চাষেরই বস্তু। কিংবা শিবপুরাণে দেখা যায় মহাদেবের হাতে যে ত্রিশূলটি রয়েছে সেটিও কিন্তু লাঙলের প্রতীক। তাই সেদিক দিয়ে লক্ষ করলে দেখা যায় কৃষককে বাদ দিয়ে কোনো কিছু হয় না। আধুনিক সভ্যতা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশে কিন্তু কৃষিকাজের উন্নতি করার চেষ্টা করা হচ্ছে, কিন্তু আমাদের দেশে সেই ধরনের কাজ হচ্ছে না। তার ফলে উপেক্ষা থেকেই যাচ্ছে।

প্রশ্ন : আপনার কবিতাগুলোতে বার বার 'বৃশ্চিক', 'মিথুন', 'কন্যা' প্রভৃতি রাশির কথা এসেছে, আপনি রাশিকে কী অর্থে দেখাতে চান? কোনো জ্যোতিষ বা ভাগ্য গণনার বিষয় কী এখানে এসে পড়ে?

উত্তর : না। কোনো জ্যোতিষ বা ভাগ্য গণনার বিষয় এখানে আসে না। আমি শব্দগুলিকে অন্য অর্থে দেখাতে চাই। শুধু রাশি নয়, আমি অনেক সময় অনেক শব্দ রাগ রাগিণী অর্থেও ব্যবহার করেছি, যেমন- 'মল্লার', 'বেহাগ', 'ইমন' প্রভৃতি। সেইরকম 'বৃশ্চিক' এই শব্দটি একটি রাশির নাম হলেও, তা শুধু রাশি নামে সীমাবদ্ধ থাকে না। 'বৃশ্চিক সরণি' অর্থাৎ একটি রাস্তা যখন এঁকে বেঁকে চলে তখন অনেকটা বিছের মতনই চলে। সেই রাস্তাটি পথিককে কখন দংশন করে দুর্ভাগ্যের দিকে ঠেলে দেয় তা কেউ বলতে পারে না। আবার 'মিথুন' অর্থাৎ প্রেমের একটা দুর্দান্ত প্রতীক। অর্থাৎ কোনো জ্যোতিষ বা ভাগ্য গণনা নয়, একটা আলাদা অর্থ প্রদানই হল শব্দগুলি ব্যবহারের মূল লক্ষ্য।

প্রশ্ন : আপনি ''বৃশ্চিক সরণির কারুকাজ'' কাব্যের 'মানবাধিকার' কবিতায় মানবাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুললেন, আপনার কী মনে হয় আমাদের দেশে মানবাধিকার পদে পদে লঙ্ঘিত হচ্ছে?

উত্তর : হাঁ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের দেশে মানবধিকার লঙ্ঘিত হতে দেখা যায়। এই মানবাধিকার লঙ্ঘনের সূত্রপাত ঘটে ঘর থেকে। তারপর ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে সমাজে এবং পরে রাষ্ট্রে। এই মানবাধিকার লঙ্ঘনটাই হচ্ছে সবথেকে বড় ক্ষতি। যদিও মানবাধিকার মানে এই নয় যে, আমি যখন খুশি যা কিছু করব বা সমাজের ক্ষতিসাধন করব। বরং মানবাধিকারের সবথেকে বড় কথা হল এই যে, আমি অন্তত আমার বক্তব্যব্যটাকে বলার চেষ্টা করবো এবং যেটাকে বিভিন্ন বিচারের মধ্য দিয়ে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

প্রশ্ন : আপনি কী কোনো রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাস করেন যা আপনার কাব্য-জীবনকে প্রভাবিত করে?

উত্তর : দেখ কোনো মানুষ বুকে হাত দিয়ে যদি বলে যে, আমি কোনো রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী নই তাহলে সেটা মিথ্যাচার হয় বলে আমার মনে হয়। আমি অবশ্যই রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী। কিন্তু সে রাজনৈতিক মতবাদ মানে একেবারে গোঁড়াভাবে নির্দিষ্ট কোনো মতবাদে বিশ্বাস করি তা নয়। আমি মানবতাবাদে সবচেয়ে বেশি বিশ্বাসী। আমার কাছে মানবতাবাদই

সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা। যে রাজনীতি মানুষের ভালো করবে, যে রাজনীতি দেশের ভালো করবে, আমি যুগে যুগে কালে কালে সেই রাজনীতিকে বিশ্বাস করবো।

প্রশ্ন : আপনি কী মনে করেন একজন ভালো কবি হতে গেলে আগে একজন ভালো মানুষ হতে হবে?

উত্তর : অবশ্যই ভালো মানুষ হওয়াটা তো অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু আমি কারো নাম উল্লেখ না করে বলছি, আমার সামনে অনেক বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক আছেন, যারা কবি হিসাবে সুনামের অধিকারী, তাদের মধ্যে কারো কারো জীবন যাত্রা জানি তারা ভালো মানুষ নন। কিন্তু তাদের কবিতা আমাকে মুগ্ধ করে, আমাকে আবিষ্ট করে। তাই কবি হতে গেলে ভালো মানুষ হতেই হবে তা আমি মনে করতে পারি না। আমার মনে হয় কবির ব্যক্তি-জীবন আর কবির কাব্য-জীবন দুটোই আলাদা। আর আলাদা বলেই কবিকে ভালো মানুষ হতেই হবে এ রকম কোনো নির্দিষ্ট বাঁধনে বেঁধে দেওয়া যায় না।

প্রশ্ন : আধুনিক কবিতার ধারা লক্ষ করলে দেখা যায়, বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বুদ্ধদেব বসু নতুন নতুন কবিদের খুঁজতেন, তাদের প্রচারে আনতেন, বর্তমানে এমন কোনো পত্রিকা দেখতে পান কী যারা ঠিক এরকম কাজ করছে?

উত্তর : বর্তমানে এরকম পত্র-পত্রিকা একেবারে নেই বললে ভুল বলা হবে। দু-একটা পত্রিকা আছে যারা এই কাজ করছে। এখন ছোটো ছোটো লিটিল ম্যাগাজিনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, যারা বুদ্ধদেব বসুর কবিতা পত্রিকার মতো ভূমিকা নেওয়ার চেষ্টা করছে। আজকের সমসাময়িক অনেক কবি এমনকি আমিও ব্যক্তিগতভাবে লিটিল ম্যাগাজিনে লিখে আজকে এই জায়গায় এসেছি। বর্তমানে অনেক ব্যাবসায়ী পত্র-পত্রিকা বেরিয়েছে যেগুলিতে আমি লিখলেও, আমাকে কিন্তু সাধারণ মানুষ চিনেছে এই লিটিল ম্যাগাজিনগুলির জন্যে। তাই কবিতা পত্রিকার মতো এত প্রভাবশালী না হলেও বর্তমান কবি সাহিত্যিকদের প্রচারের আলোয় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে এইসব পত্র-পত্রিকার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

প্রশ্ন : দু'একটা পত্রিকার নাম বলুন যারা বর্তমানে এইরকম কাজ করছে।

উত্তর : আমি আলাদা করে কারো নাম বলতে চাইছি না। কারণ নাম বললে হয়তো এই মুহূর্তে যাদের নাম মনে পড়বে তাদের দু-একটা বলবো। কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ কোনো কোনো পত্রিকার নাম বাদ পড়ে যাবে, যা আমার ক্ষেত্রে ঠিক হবে না। পরবর্তীকালে এর জন্য আক্ষেপ হতে পারে। তাই আমি আলাদা করে কোন পত্রিকার নাম বলছি না।

প্রশ্ন : বর্তমানে বিভিন্ন জায়গায় কবিতা লেখার ক্লাস চলছে, কবিতা লেখা কী কোনো নির্দিষ্ট ক্লাসের মাধ্যমে শেখানো যেতে পারে? আপনি কী মনে করেন?

উত্তর : না। আমি একেবারেই মনে করি না যে কবিতা লেখার ক্লাস করে কবিতা শেখা যায়। সেই কোন্ আদি যুগ থেকে বাল্মীকি, কালিদাসের সময়েও মানুষ কোনোরূপ ক্লাস না করে কবিতা লিখেছে। তাই কবিতা লেখা কাউকে শেখানো যেতে পারে না। লেখার সত্তাটা মানুষের

ভেতরেই থাকে। তবে একথা ঠিক যে যারা অগ্রজ বিশিষ্ট কবি তাদের লেখা পড়লে নিজেকে এবং নিজের কবিসত্তাকে অনেক বেশি সমৃদ্ধ করা যায়। তাছাড়া যারা এই কবিতার ক্লাসে ট্রেনিং দেবেন তারা তাদের ভাবনা-চিন্তাকে অনুজ কবিদের ওপর চাপিয়ে দেবেন। যার ফলে অনুজ কবিদের নিজস্ব ভবনা-চিন্তার জগৎ হ্রাস পাবে। তাই মনে হয় কবিতার ক্লাস করে বা ক্যাম্প করে কবিতা শেখা যেতে পারে না। কবিতা নিজের মধ্যে থেকে আসে, নিজের ভাবনা থেকে আসে।

প্রশ্ন : বর্তমানে বিভিন্ন কাব্য সম্মেলন বা সমালোচনায় বলতে শোনা যায় যে, কবিতার পাঠকের সংখ্যা নাকি দিন দিন কমছে, আপনি কী মনে করেন সত্যিই কী পাঠকের সংখ্যা কমছে?

উত্তর : আদি যুগ থেকে লক্ষ করলে দেখা যাবে কবিতার পাঠকের সংখ্যা কোনদিনই বেশি ছিল না, আজও নেই এবং মনে হয় ভবিষ্যতেও থাকবে না। তবে হ্যাঁ, পাঠকের সংখ্যা ছিল যে কবিতাগুলি মুখেমুখে ছড়ার আকারে রচিত হয়েছিল সেই কবিতাগুলির। কিন্তু যে কবিতাগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কবিতা তার পাঠকের সংখ্যা আজও বাড়েনি। আজকে তুমি লক্ষ করে দেখ জীবনানন্দ দাশ বেঁচে থাকাকালীন তাঁর কটা পাঠক ছিল? তাই আমার মনে হয় কবিতার পাঠক তৈরির দিকে লক্ষ রেখে কবিরা কখনো কবিতা লেখেন না। তবে হ্যাঁ কবিতা হওয়া উচিত মাল্টি ডাইমেন্সেলান, যা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মানুষের কাছে বিভিন্ন ভাবে আসতে পারে।

প্রশ্ন : সমাজের গর্ভ থেকে উঠে আসে স্রষ্টা। প্রতিটি স্রষ্টারই সমাজের প্রতি কিছুনা কিছু দায়বদ্ধতা থাকে। কবি হিসাবে সমাজের কাছে আপনার দায়বদ্ধতা ঠিক কীরকম?

উত্তর : সমাজের কাছে কবিদের দায়বদ্ধতা থাকে একথাটা আমি শুনি। কিন্তু আমার মনে হয় কবি একদম দায়বদ্ধ হয়ে কবিতা লেখেন তা নয়। সেই সময়ের কোন ঘটনা তাকে আনন্দিত করলে বা তাকে আহত করলে কিংবা তাকে কোনরকম ভাবে জারিত করলে তখনই তিনি কবিতা রচনা করেন। আমি দায়বদ্ধতা নিয়ে কবিতা রচনা করছি, এই ভেবে কোনো কবি তার কবিতা রচনা করেন না। কিন্তু আমি আগেই বলেছি যে কবিতায় কবি সত্যভাষণ করেন। যে ঘটনাটি দেখেছেন কবি সেই ঘটনাটি কবি তার কবিতার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলেন। পরবর্তী কালে যারা সমালোচক তারা সেই ঘটনাটিকে কবির কবিতার মধ্যে খুঁজে পাবেন। ফলে এরকম একটা দায়বদ্ধতা থেকেই যায়। আবার সমাজ পরিবর্তনেও অনেক ক্ষেত্রে কবিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে, কিন্তু নেবে এইরকম কোনকিছু ভেবে কবি কবিতা লেখেন না।

প্রশ্ন : জানি না আপনি জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী কিনা। যদি আপনি আবার দ্বিতীয় জন্ম পান তাহলে আপনি কী কবি হতে চাইবেন?

উত্তর : আমি জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। যদি আমি আবারও জন্মাই তাহলে চাইবো আমি আবার বাংলার মাটিতে যেন জন্মাই, যেখানে প্রকৃতি থাকবে, সৌন্দর্য থাকবে। আর এটাই চাইবো আমি যেন আমার মতো করে কবিতা লিখতে পারি। ব্যক্তিগতভাবে আমি আমার কবিতার জন্য পৃথিবীতে

সবকিছু ত্যাগ করতে পারি। আমার জীবনে কবিতার জন্য আমি অনেক কিছু ত্যাগ করেছি। কবিতাই হচ্ছে আমার প্রথম প্রেম। যদি সেইরকম কোনো কিছু হয় আমি ভিড়ের মধ্য থেকে কবিতাকে বেছে নেব।

প্রশ্ন : কবিতা নিয়ে আপনার পরবর্তী ভাবনা কী?

উত্তর : দেখ এরকম নিশ্চিত ভেবে তো কোন কাজ করা যায় না। আমি এখনো বিশ্বাস করি আমি ভালো কবিতা লিখে উঠতে পারিনি। যদি আমি জীবনে এমন কোন কবিতা লিখতে পারি, যে কবিতাটা যুগের পর আরো একটা যুগে বহমান হবে এবং কালের পর আরো একটা কালেও তার স্রোত বয়ে যাবে; তাহলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো। যেমন রবীন্দ্রনাথ খুব অহঙ্কার করে বলেছিলেন, 'আজি হতে শতবর্ষ পরে, কে তুমি পড়িছ বসিয়া আমার কবিতা খানি'। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, একশো বছর পরেও তাঁর কবিতা নিয়ে চর্চা হবে। সেই বিশ্বাস আজও আমার মধ্যে গড়ে ওঠেনি। আমার মনে হয় আমি যা লিখছি তাতে অনেক ভুল ভ্রান্তি রয়েছে। আমি যা লিখছি সেগুলো কি সত্যিই কবিতা হয়ে উঠেছে এই প্রশ্নও আমার মধ্যে জাগে। কবিতা নিয়ে এক একজন এক এক রকমভাবে সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করে, আমি তো আর সংজ্ঞাকে বিশ্বাস করি না। আমি একটা জিনিস বিশ্বাস করি কবিতা কবিতাই হয়ে উঠুক। আর আমি মনে করি এই অতৃপ্তি আমাকে পরবর্তী কালে আরো সামনের দিকে নিয়ে যাবে।

মধ্যযুগের সাহিত্যচিন্তক ও সাহিত্যপাঠক
অচিন্ত্য বিশ্বাস ও সঞ্জয় দে : প্রশ্নোত্তরে মুখোমুখি
সঞ্জয় দে

প্রশ্ন : চর্যাপদকে বাঙালি, অসমিয়া, ওড়িয়া সকলেই তাদের আদি সাহিত্য-নিদর্শন হিসাবে মনে করে থাকে। প্রশ্ন হল চর্যাপদের মধ্যে জায়মান বাঙালির কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ করা যায় যা পরে আরও পুষ্ট হয়ে বাঙালি সত্তা, জাতিকে স্পষ্ট রূপে গড়ে তুলেছে?

উত্তর : চর্যাপদকে চর্যাগীতিও বলা যায়। এগুলোতো সংগ্রহ হয়েছে নেপালে। নেপালে সংগ্রহ হয়েছে, সেটা থেকে বোঝা যায় যে, এটা অন্য আর একটি চর্যাগীতির সংকলন থেকে নেওয়া। সেটাতে ১০০টা গান ছিল। মুনিদত্ত টীকা লিখেছেন, টীকাটার নাম হচ্ছে নির্মলগীরা টীকা। এটা সংস্কৃত ভাষায় লেখা। টীকাটায় তিনি বলেছেন যে আমি তার থেকে ৫০টা আলাদা করে নিলাম। নিয়ে টীকাসহ এটিকে উপস্থিত করছি। তাহলে বোঝা যায় মুনিদত্ত নামে একজন লোক এর সঙ্গে ভালো যুক্ত ছিলেন। আর মুনিদত্ত নিজে বলছেন আমি জগত্তলা মহাবিহারের। জগত্তলা মহাবিহার কোথায়? জগত্তলা মহাবিহার পশ্চিমবঙ্গের কোনো একটি জায়গায়, এখনো স্পষ্ট করে সেটা বোঝা যায়নি। কেউ কেউ বলেন পূর্ববঙ্গের পাবনা-টাবনার কাছাকাছি। যাই হোক সেটা মুখ্যত বাংলার যে ভূগোল, বঙ্গ ভাষাভাষির যে ভূগোল, সেই ভূগোলের। দত্ত পদবিটাও বাংলার বাইরে খুব বেশি জায়গায় নেই, যদি থাকে সেটা Dutt বা এইরকম ধরনের। কিন্তু বাঙালির মধ্যেই দত্ত পদবিটা বেশি। এটা একটা বাইরের প্রমাণ।

দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে বাংলা থেকে প্রচুর বৌদ্ধ বিহারের পণ্ডিত মানুষ দীর্ঘদিন ধরে নেপাল পথে মঙ্গোলিয়া, তিব্বত, চীন ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় যেতেন। এর প্রচুর প্রমাণ আছে। অতীশ দীপঙ্কর, শীলভদ্র বা কমলশীল এরা প্রচুর যেতেন। এই তালিকাতে একজন মাত্র পণ্ডিত মানুষ আছেন যার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি খুব বেশি নেই, কিন্তু তিনি খুব জাদু মন্ত্র করতেন। সেইজন্য তার খুব খ্যাতি ছিল। তিনি হচ্ছেন গুরুপদ্ম সম্ভব। তিনি হচ্ছেন উড়িষ্যার লোক। এছাড়া কিন্তু যে ক'জনের নাম পাওয়া যায় যারা বৌদ্ধ চর্চাকেন্দ্রগুলিতে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, যাদেরকে বোধিসত্ত্ব অবতার বলা হয়েছে। ধরো, বিশেষ করে আমাদের অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান – এরা হচ্ছে সবাই কিন্তু বাঙালি। তাহলে চর্যাগীতির যে সংস্কৃতি, মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কৃতি সেটা বাংলা থেকে নেপাল হয়ে তিব্বত, মঙ্গোলিয়া এবং চীনের এই সমস্ত অঞ্চলে ছড়িয়েছে। এটা আর একটা বক্তব্য।

তৃতীয় যে বক্তব্য সেটা হচ্ছে ভাষা। এটা ঠিক যখনচর্যাগীতি লেখা হয়েছে তখন বাংলা ভাষা এবং অসমিয়া ভাষা আলাদা হয়নি। সুতরাং অসমিয়ারা যদি দাবি করেন তাহলে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। একই উত্তর আছে। কিন্তু ওড়িয়াদের দাবি কিছুদূর পর্যন্ত মেনে নেওয়া যেতে পারে। কেননা বাংলা ও উড়িষ্যা একই Cultural বা সাংস্কৃতিক এলাকা বা অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মগধকেও গ্রহণ করতে অসুবিধা নেই। কিন্তু যে লিপিতে পুথিটি পাওয়া গেছে সেটা বাংলা লিপি। সেটা নেওয়ারি লিপি নয়। নেওয়ারি লিপিতে একটা কপি বা নকল করা হয়েছিল। সেটা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী করিয়েছিলেন। করিয়ে তিনি বাংলায় এসে

এশিয়াটিক সোসাইটিতে জমা দিয়েছিলেন। ফলে এশিয়াটিক সোসাইটি সংগৃহীত যে চর্যাগীতির পুথি সেটা নেওয়ারিতে লেখা। সেটা নেওয়ারি হল কেন? সেটার কারণ হল চর্যাগীতিটি আসলে ওখানকার পুথি লেখক যারা আছেন তারা লিখেছেন। তখন ফটোকপির ব্যবস্থা ছিল না। এখানে একদল লোক থাকতেন যারা মূলত মৈথিলী কায়স্থ। তারা রাজদরবারের লাইব্রেরীর কাছে থাকতেন এবং বিভিন্ন পণ্ডিতদের জন্য লিখে দিতেন। তারা নেওয়ারি লিপিতে অভ্যস্ত ছিলেন। ফলে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যখন বলেছেন তখন সেটা লিখে এনেছেন। যেমন আমি একটা ওড়িয়া পুথি আনিয়েছিলাম ভুবনেশ্বর থেকে। সেটা মাধবরথের 'চৈতন্যবিলাস'। সেটা কিন্তু ওখানকার লিপিকররা বসে বসে লিখতেন। অর্থাৎ ওখানে এখনও জীবন্ত কিছু লিপিকর আছেন। তারা ওড়িয়া লিপিতে লিখেছেন। ওখানে নেওয়ারি লিপি চলত বলে নেওয়ারি লিপিতে লিখেছেন। তাহলে আমাদের বক্তব্য হল এটা কিন্তু স্থানান্তরিত পুথি। অর্থাৎ বাংলা থেকে গেছে, বাংলার লিপি পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় আর একটা Point আছে, সেটা হচ্ছে চর্যাগীতির ভাষা। চর্যাগীতির ভাষাতে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় খুব স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন, অনেক উদাহরণ আছে যাতে বাংলা বোঝা যায়। ধরো বাংলার ভূগোলের কথা আছে। মানে গঙ্গার কথা আছে, গঙ্গার পাশে পউয়া খাল বলে একটা লাইন আছে। আজ ভুসুকু বঙ্গালী ভইলু – বাঙালির কথা বলা আছে। ফলে এই কথাগুলি তো অন্য কোথাও নেই। ঠিক না? সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন 'ইল' অন্তক অতীত এবং 'ইব' অন্তক ভবিষ্যৎ ক্রিয়াপদ চর্যায় খুব স্পষ্ট। মানে ধরো, হইব, ভইব, গেলি, হোলি-এ ধরনের ক্রিয়াপদ প্রচুর আছে। করিব, হইব এই ধরনের উদাহরণ অনেক আছে। এটা একটা অভ্রান্ত যুক্তি। পরবর্তীকালে চর্যাগীতির কবিদের নিয়ে 'চুরাশি সিদ্ধকথা' নামে একটা তিব্বতি বই থেকে অনুবাদ করেছেন অলকা চট্টোপাধ্যায় – 'চুরাশি সিদ্ধর কথা'। এইটা ধরে আমি নবচর্যাপদের উপর বিস্তৃত আলোচনা করেছি। সেখানে আমি দেখিয়েছি যে, এই কবিদের আসল পরিচয় কী ছিল? এ নিয়ে অন্যরা অনেকে আলোচনা করেছেন। কিন্তু আমার আলোচনা সবচেয়ে বিস্তৃত ও প্রথমদিকের। এখন আমার কথা যেটা সেটা হচ্ছে, এই পরিচয় দেখেও বোঝা যায় যে, এরা বাংলার আশেপাশের লোক, বাংলার লোক। সুতরাং কবিরাও বাঙালি। ভাষা বাংলা। লিপি বাংলা। তাহলে একে আমরা বাংলার বাইরের বলব কেন? আর পটভূমি?

পটভূমিতে শবরপাদের কবিতাটা বাদ দিলে – পাহাড়ের ছবি নেই এবং এই শবরপাদের কবিতাটাতেও মোটামুটি বোঝা যায় যে এটা বাংলার পশ্চিমদিকের মানভূম এলাকার ছবি – 'উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবর বালী'। বাকি সবই তো নৌকা চালানো, খুঁটি ওপড়ানো, সাঁকো তৈরি করা – এসব চিত্র তো পরিস্কার বাংলার চিত্র। ফলে এইগুলো থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়।

এছাড়া কাপাস ফুল ফুটে ওঠা – এসব বর্ণনা আছে। কাপাস ফুল তুমি বলবে যে আজকের ছবি। কিন্তু কাপাস ছিল একটা সময় বাংলার প্রধান কৃষিজাত পণ্য। সেটা আসতে আসতে সরে গিয়ে মহারাষ্ট্রের দিকে চলে গেছে। কেন চলে গেছে সেটা বোঝা একটু কঠিন। একটা জিনিস হচ্ছে আমাদের বাণিজ্য ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে। ফলে কাপড় তৈরি হত, কিন্তু বাইরে যেত না। এই কারণে কমেছে। দ্বিতীয় কারণ ইংরেজরা যখন এল তখন বস্ত্র তৈরি করার ব্যাপারে তারা একেবারে তাঁতিদের আঙুল কেটে দিয়েছে বলে অনেক খবর

পাওয়া যায়। ফলে আমাদের দেশে কাপড় বোনার যে ধারাবাহিকতা সেটা অসুবিধার মুখে পড়েছে। এই কারণে কাপাস এখন আমাদের এখানে প্রধান নয়। আখ একসময় এখানে প্রধান ছিল। সেইজন্যে আমাদের অঞ্চলের নাম ছিল গৌড়। গুড় থেকে গৌড়। তো, পুঁড়ো শব্দটার অর্থ একধরনের আখ যেটা থেকে ভালো রস, চিনি পাওয়া যায়। সেইথেকে এসেছে পৌণ্ড্র। এইরকম অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। পুরোনো কৃষি সম্পর্কে আমাদের যদি ধারণা থাকে তা থেকে বোঝা যায়। সুতরাং কাপাস ফুল দেখে তাকে পশ্চিম ভারতে নিয়ে যেতে হবে এরকম কোনো মানে নেই। ফলে এটা বাঙালির সম্পদ।

প্রশ্ন : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য সম্পর্কে নানা মুনির নানা মতামত আছে। কারও কাছে কৃষ্ণ লম্পট যুবক বলে প্রতিভাত, কারও মনে হয়েছে রাধাকে তার আগমনের উদ্দেশ্যের কথা মনে করিয়ে দিতে কৃষ্ণ নানাবিধ কর্মে লিপ্ত হয়েছে। এ কাব্য সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

উত্তর : শুধু জন্মখন্ডে নয়, বারবার শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন আমার সম্ভোগের উদ্দেশ্যে তোমাকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে। তুমি আমার হ্লাদিনী শক্তি। আর রাধা বারবার বলেছেন যে গোঁয়ারগোবিন্দের মতো কথা বোলো না। সবাই এরকম বলে। আমি এ সমস্ত কথা মানি না। এর কারণ হচ্ছে যোগমায়া। তিনি মায়া সৃষ্টি করেছেন। কারণ ঈশ্বর তো এক এবং অভিন্ন। সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের সৎ এবং চিৎ সত্তা আলাদা হয়ে গিয়ে কৃষ্ণরূপে জন্মালেন। আর আনন্দ বা হ্লাদিনী শক্তি রাধারূপে জন্মালেন। এখানে তো স্পষ্টই বলা হচ্ছে দুইভাগে ভাগ। এই ভাগ হওয়ার পিছনে যোগমায়ার কথা বলা হয়েছে। যোগমায়া আছে বলে রাধা বুঝতে পারছেন না। তিনি মায়ায় আচ্ছন্ন। আর কৃষ্ণ তো নিজের স্বরূপ জানে। চিৎ, সৎ। সৎ মানে I am, চিৎ মানে I know, আর হ্লাদিনী মানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন I Express। এই Expression-এর জায়গাটা রাধার মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে। বিশ্বজগত প্রকৃতপক্ষে রূপে রূপে বিভাসিত। বেদান্তে আছে – 'রূপম্ রূপম্ অমৃতম্ যৎ বিভাতি'। তাহলে রূপের Essence যিনি, তিনি হচ্ছেন রাধিকা। রাধিকা শব্দটার অর্থও তাই।

কিন্তু এটার ফলে যা হয়েছে তা পেরিপেতি। অ্যারিস্টটলের তত্ত্ব তো তোমরা জানো। অর্থাৎ চরিত্রগুলির মধ্যে একজন একটা কথা জানে, আর একজন জানে না। তার ফলে নাট্যরস তৈরি হয়। আবার যারা দেখছে, শুনছে তাদের কাছে এটা আরও মজাদার হয়ে ওঠে। কারণ এদের মনে হয়, আরে রাধা তো কিছুই জানে না। রাধা যে কৃষ্ণের শক্তি এটা জানে না। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ধারণাটা যখন থাকবে তখন রাধা-কৃষ্ণের এই বিতর্ক তাদের কাছে অনেক আনন্দজনক হবে। সুতরাং এটা কোনো কামোন্মত্ত মানুষের কাহিনি নয়, এটা দেবতার কাহিনি এবং সেটাকে এমনভাবে উপস্থিত করা হয়েছে যেটাকে বলতে পারি জনমনোরঞ্জক উপস্থাপন। কিন্তু এখানে কৃষ্ণ চরিত্রকে ভ্রষ্ট করার ইচ্ছে লেখকের নেই। আরো ভালো করে বোঝা যায় যদি আমরা পরের দিকের ছত্রখণ্ড বা ভারখণ্ড বা কালীয়দমন খণ্ড দেখি। সেই জায়গাগুলোতে আমরা দেখব ছত্র ও ভারখণ্ডে একজনের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। তিনি

জন্মখণ্ডের পরে আর যে আসেননি সেটা অনেকেরই ধারণা। কিন্তু নারদ সেখানে বসে ধ্যান করছে। তিনি বলছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, যিনি ঈশ্বর, যিনি সবকিছুর সৃষ্টি করেছেন, রাধা তারই অঙ্গ। এটা কী করে হচ্ছে? তা থেকে বোঝা যায় লেখকের পরিকল্পনা ভীষণভাবে ছিল। অন্যদিকে যখন কালীয়দমন খণ্ডে কৃষ্ণ মারা যাচ্ছেন বলে অনেকের মনে হয়েছে তখন দশাবতারের স্তোত্র পাঠ করছে বলরাম। আর রাধা আসছে, নন্দরাণী আসছে। নন্দরাণীর বক্ষমন্ডল দুগ্ধে ভিজে যাচ্ছে। এটাকে স্নেহাদ্র, জননীর চিহ্ন বলা চলে। আর রাধা যে মুহূর্তে মধুর দৃষ্টিতে অপাঙ্গে তাকাচ্ছেন, সে মুহূর্তে কৃষ্ণ জেগে উঠছেন। অর্থাৎ রাধাও ধীরে ধীরে বুঝতে পারছেন যে তাকে কৃষ্ণে সমর্পিত হতে হবে। সুতরাং একতরফা ব্যাপার যেটা, তখন তারা কৃষ্ণের গোঁয়ারতুমিগুলিই দেখেন, শেষের দিকে কৃষ্ণের ভালবাসা দেখেন না যেটা চণ্ডীদাস স্পষ্ট করেছেন। আবার বাণখন্ডে সকলের প্ররোচনায় কৃষ্ণ রাধাকে মেরে ফেললেন। তাকে আবার যখন বাঁচিয়ে দিলেন তখন তার আকুলতা একেবারেই যোগ্য। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলছেন এটা মঙ্গলগান পর্যায়ের লেখা। কেন মঙ্গলগান? উনি বলছেন মঙ্গলকাব্যের নির্দিষ্ট একটা প্যাটার্ন আছে। প্যাটার্নটা হল দেবতাকে যদি অপমান করা হয় তাহলে তার মৃত্যু বা ধ্বংস অনিবার্য, আর ধ্বংস বা মৃত্যু থেকে তাকে যদি অতিক্রম করতে হয় তাহলে তাকে দেবতার কাছে সমর্পণ হতে হবে। এখন কৃষ্ণের পাঠানো পান, সুপুরি, উপহার সব পদদলিত করেছেন রাধা। ফলে ফলাফল তাকে ভোগ করতেই হবে। যেমন চাঁদ সদাগরের নৌকাডুবি এবং প্রায় মৃত্যুর মতো অবস্থা, লোকের কাছে লাঞ্ছিত হওয়ার অবস্থা। রাধারও সেই রকম পরিণতি ঘটেছে। কিন্তু সেখান থেকে তাকে যখন বাঁচিয়ে দেওয়া হয়েছে তখন সেটা ভাবোল্লাস পর্যায়ের পদাবলীর সাহিত্য। অর্থাৎ রাধা-কৃষ্ণের এই মিলন চিরন্তন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে আমরা যতটা সৃষ্টিছাড়া, বৈষ্ণব পদাবলী-পটভূমির বাইরের দিক থেকে ভাবি তা কিন্তু সত্য নয়। ভেতরে ভেতরে লেখকের ভক্তি ভাবুকতা আছে। তার সঙ্গে আর একটি কথা। এটা চণ্ডীদাসের প্রথম জীবনের লেখা। তাঁর পরের দিকের লেখা আমার মতে পদাবলী সাহিত্য। কিন্তু তোমরা বলবে ভাষা এত আলাদা কেন? কারণ ওটা হচ্ছে নাটকের পালা, আর এটা হচ্ছে সকলকে শোনানোর জন্য গান। গানের আসরে লোকে টুকে টুকে নিয়ে যেত। ফলে ছোটো ছোটো লেখা এত বেশি কপি হয়েছে যে এটার ভাষা সহজ হয়েছে। নাটকের লোকেদের ক্ষেত্রে লক্ষ করবে যে নাটকের যারা ওস্তাদ লোক তারা কখনো পাণ্ডুলিপি হাতছাড়া করে না। কারণ অন্য কেউ করে নেবে তাহলে, তারই দল যাতে নাটকটা করতে পারে সেটার জন্য। বড়ু চণ্ডীদাসের পুথি বেশি পাওয়া যায়নি এই কারণে। তবে একেবারে পাওয়া যায়নি তাও নয়। মণীন্দ্রকুমার বসুর 'বাংলা সাহিত্য'-এ, যা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে, প্রায় ১০-১২ টি গান আছে যে গানগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের নানা জায়গায় রয়েছে। এটা আমি আলোচনাও করেছি। করে দেখিয়েছিভাষা বদলে গেছে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাও বদলে গেছে। কিন্তু বদলে যাওয়া ভাষাটিকে আমরা বেশি পাইনি।

পেয়েছি কোথায়? কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে। পেয়েছি আমাদের যে ঝুমুর গান আছে সেগুলোর মধ্যে।

প্রশ্ন : তুর্কি আক্রমণের পর যখন দলে দলে লোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যাচ্ছে, তখন প্রতিরোধের মাধ্যমে হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য স্মৃতি, ন্যায়ের চর্চা শুরু হল। এই সময়ই হিন্দু ধর্মের ধারাবাহিকতার মধ্যে যে বিকৃতির দেখা গিয়েছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের চেষ্টা দেখা গেল। এটাকে কী হিন্দু বাঙালির আত্মসমালোচনা বলা চলে?

উত্তর : আমি প্রথমেই বলছি এই প্রশ্নটার মধ্যে একটু অসুবিধা আছে। কারণ দু-তিনটি জিনিস। একটা, বাঙালি সমাজ enmass মুসলমান হয়েছে এর প্রমাণ নেই। বাঙালি সমাজে মুসলমানের সংখ্যা ৫০ ভাগও অতিক্রম করেনি প্রথম সংখ্যা আমরা যখন গণনা করেছি। অর্থাৎ ১৮৯১ খ্রি.। ইংরেজরা এসে আরো কিছু আদমসুমারি করেছে। তখনও দেখা গেছেবাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমানের সংখ্যা ৫০-৫০। মুসলমানরা বরং ৪৮-৪৯, হিন্দুরা তুলনায় বেশি। এই সংখ্যা কেন এত তাড়াতাড়ি বেড়ে গেল? ১৯০৫-এই দেখা গেল ওদের সংখ্যা প্রায় ৫৫। হল কী করে? এর কারণ হচ্ছে দু-তিনটি আন্দোলন। একটা হচ্ছে তীতুমীরের ওয়াহাবি আন্দোলন, আর একটা সরিফুল্লার ফরাজী আন্দোলন। এই আন্দোলনগুলো বারবার যেটা বলেছে সেটা হল জমি হচ্ছে আল্লার দেওয়া। ফলে এটায় চাষ করবে কেবল আল্লার যারা ভক্ত অর্থাৎ মুসলমান। তারা ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না। আর হিন্দুদের মারো। এই নিয়ে ওরা বিস্তৃত আন্দোলন করেছে। সেই আন্দলনের ব্যাপারটাকে স্বাধীনতা আন্দোলন বলে চালানো হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা ভুল। এর ফলে গরীব হিন্দুরা বাধ্য হয়ে মুসলমান হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, মুসলমান যারা হয়েছে তাদের দুটো অংশ। একদল লোক হচ্ছে কামুক। চারটে বিয়ে করার সুবিধা আছে ওই ধর্মে, অতএব তারা ধর্মান্তরিত হয়েছে। আর একদল হচ্ছে লোভী। যারা মুসলমান হলে সুবিধা পাবো, টাকাপয়সা পাবো – এইজন্যে মুসলমান হয়েছে। সবাই মিলে মুসলমান হয়ে গেলে এরকম হয় না।

কিন্তু হিন্দু সমাজের কিছুই দোষ ছিল না একথা বলব না। হিন্দু সমাজ ছিল স্মৃতিশাসিত এবং ব্রাহ্মণ্য সমাজ দ্বারা যথাসম্ভব নিপীড়িত। এর ফলে হয়েছে কী একঘরে করে দেবো ইত্যাদি ব্যাপার ছিল। কখনো কখনো মুসলমানরা প্রচার করেছে যে, তোমার যে আত্মীয়রা থাকে ওই গ্রামে তারা কিন্তু মুসলমান হয়েছে। এর ফলে এই প্রান্তে যারা যারা আছে তাদেরকে কিন্তু অনেক সময় বলা হয়েছে যে তোমার আর কোনো উপায় নেই। সুতরাং তোমাকে মুসলমান হতে হবে। এইভাবে কিছু লোক মুসলমান হয়েছে।

বাংলায় সুফি সাধকেরা মুসলমান ধর্মের প্রতি সবাইকে আকর্ষণ করেছে এটা কোথাও লেখা নেই। প্রায় সর্বত্রই যেটা জানা যাচ্ছে, তারা আসলে ছদ্মবেশে সৈনিক বেশ ধরে এসেছে। কী করে প্রমাণিত হবে? প্রমাণিত হবে শুধু বাংলায় নয়। প্রথম আমাদের দেশে যিনি এলেন তিনি খাজা মইনুদ্দিন চিস্তি। তিনি আসার ১০ বছর পরে মহম্মদ ঘোরী দিল্লী আক্রমণ করল। কী দাঁড়ালো? আগে সুফিরা এসেছে, পরে দিল্লী দখল হয়েছে। আরও পরে বাংলায়

গৌড়ে বখতিয়ারের আক্রমণ হয়েছে। কী বলবে? ফলে সুফিরা ভালোবেসে লোককে এরকম করছে এটা ঠিক না।

তবে হিন্দু সমাজের সামাজিক অসুবিধাগুলি কিছু ছিল। আর সেটাই একমাত্র কারণ নয়। হিন্দু সমাজের নিম্নবর্গের মানুষ তাদের পেশাটাকে ঈশ্বরের দান বলে মনে করত। তারা মনে করত আমরা যদি এই কাজটা ঠিকমতো করি তাহলে ঈশ্বরের কাছাকাছি যেতে পারবো। রবিদাস যেতে পেরেছিল। তিনি বলেছেন তুমি নারায়ণ শিলায় আমায় হাত দিতে দেবে না, আমার চামড়ার কাজ করি যেটায় সেটাই আমার নারায়ণ শিলা। আর গঙ্গায় যেতে দেবে না, এইখানেই গঙ্গা আসবে। গল্প আছে। সেগুলো সত্যিও হতে পারে, নাও হতে পারে। কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে ভারতীয় জাতিগত ব্যবস্থার ভিতরে প্রত্যেকটা মানুষ নিজেকে ফিট করছে এবং ভাবছে যে কর্মেই আমার অধিকার, ফলের দিকে তাকানো দরকার নেই। নিষ্ফল কর্ম আমাকে মুক্তি দেবে। তুমি বলতে পার এগুলো সব ফালতু, এগুলো বাজে জিনিস। এগুলো ব্রাহ্মণদের চালাকি। কিন্তু যে লোকটা মেনে নিচ্ছে তার কাছে তো সেটা চালাকি নয়। তার কাছে তো এটা ভালোবাসা, ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা। হ্যাঁ, আমাকে তুমি একটা কিছু দিয়েছ। কী দিয়েছ? আমাকে এই পরিবর্তমান সমাজ ব্যবস্থার মাঝখানে পেশা দিয়েছ। উত্তরাধিকার সূত্রে আমি এই পেশাটা জেনেছি, অন্য কোথাও গিয়ে শিখতে হয়নি। এটারও কিন্তু কম মূল্য নেই। বিবেকানন্দ পড়ে দেখো। স্বামীজী স্পষ্টই বলেছেন এখানেই হিন্দু সোস্যালিজম আছে। সুতরাং জাতিবিদ্বেষ ব্যাপারটার Concept-টাই শ্রেণী, জাতীয় ভাবনা যখন এসেছে তখনকার। এই ভাবনাটা এসে তাকে অন্যরকম একটা মাত্রা দেওয়ার চেষ্টা। সেটা নতুন তাত্ত্বিকতা। এই তাত্ত্বিকতার সঙ্গে ভারতীয় জীবনবোধের কোনো মিল নেই। সুতরাং জাতিভেদের কারণেই তারা যে মুসলমান হয়েছে তা নয়। হয়েছে যেটা সেটা হচ্ছে, জিজিয়া কর চালু ছিল, শরিয়ত-ই-বিধি চালু। তার ফলে জামির কর ছিল অসম্ভব। অ-মুসলমান বলে তাকে অত্যন্ত বেশি কর দিতে হত। কত কর? 1/6th of the accumulated wealth। অর্থাৎ তোমার যে সম্পদ হবে তার ১/৬ ভাগ। এটা রাষ্ট্রকে দিতে হবে। এটা মুসলমানদেরকে দিতে হবে না। তাদেরকে অন্য ধরনের কর দিতে হত। সেটার পরিমাণ কম। ফলে হিন্দুরা দেখল আমার তো খুব মুশকিল। আর এইটা প্রতিবছর চক্রবৃদ্ধি সুদ হবে এবং সেটা যোগ হবে। বাবা দিতে পারেনি, ছেলের উপর বর্তাবে। এই করতে করতে বিপুল পরিমাণে কর চেপে যেত। তার ফলে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে কৃষিজীবী মানুষদের মনে হয়েছে মুসলমান হয়ে যাওয়া ভালো।

প্রশ্ন : অনুবাদ কর্মের ধারায় কৃত্তিবাস একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করলেন, শক্রভাবে ভজনা বা সাধনা। এর কারণ কী বা এর পিছনে কোনো উদ্দেশ্য কী কাজ করেছে?

উত্তর : শত্রুভাবে ভাবনা বা সাধনা অনুবাদ কাব্যগুলিতে আছে, নেই এমনটা নয়। কিন্তু সেইটা পুরোনো ভারতীয় দর্শনে সম্ভবত Accumulated হয়নি। প্রাচীন ধর্মদর্শনে নেই। এটা নতুন করে এল কেন? কৃত্তিবাসের পারিবারিক ব্যবসাই ছিল রামায়ণ গান শোনানো। এইটাকে তিনি প্রাধান্য দিলেন তার কারণ – যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার। খুব ভালো কথা। কিন্তু ধরেই নিচ্ছি সুখময় মুখোপাধ্যায়ের কথা যে তিনি রুকবুদ্দিন বরবক শাহ-এর সভায় গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কী সংস্কৃত শ্লোকগুলি বুঝেছিলেন। বোঝেননি। কারণ উনি তো ফরাসী ছাড়া কিছু বুঝতেন না। উনি কাব্যামুদি লোক ছিলেন। সেজন্য উনি যমপুরের হোসেন শাহ সুরকি-র সভাকবি কুতুবনকে নিয়ে এসেছেন। কারণ উনি গৌড়ে বসে 'মৃগাবতী' বলে একটা কাব্য লিখেছিলেন। এইগুলো হয়েছে। তবে সেটা ফরাসী। লক্ষণ সেনের সভায় লক্ষণ সেন কবিতা লিখেছেন, কেশব সেন কবিতা লিখেছেন, জয়দেব কবিতা লিখেছেন, ধোয়ী লিখেছেন কিংবা শরণ লিখেছেন কিংবা উমাপতি ধর লিখেছেন কবিতা লিখেছেন, গোবর্ধনাচার্য লিখেছেন – এরকম সভা মুসলমানদের সময়ে ছিল না। কৃত্তিবাস বাংলার পটভূমিতে যখন আসছেন তখন তিনি বুঝতে পারছেন পৃষ্ঠপোষক হিসাবে জমিদার নেই, জমিদারদের ওপরে কোনো রাজা নেই। যদি রাজসভা না থাকে তবে কবি কোথায় যাবেন? আসরের দিকে। আসরের দিকে যারা তারা তো সংস্কৃত জানেন না। ফলে তিনি সেটাকে বাংলায় অনুবাদ করতে বাধ্য। বাংলায় অনুবাদ করলেন। সবাই রামের গল্প শুনল। কিন্তু যেমন সংস্কৃত মূল কাব্যগুলির মধ্যে ছিল, অন্যান্য পুরাণে যেরকম ছিল, চরিত্রগুলোর নাম আমরা আমাদের মতো করে বদলে নিলাম। লক্ষ্মণকে আমরা লাখান করিনি। কিন্তু বিহারে যাও রাম-লাখান সিং। ওরা লাখান করে নিয়েছে। আমরা শত্রুঘ্নকে শত্রুঘ্নই রেখেছি, ওরা শত্রুঘন্ করে নিয়েছে। তার মানে আমাদের কাছে শব্দগুলো পরিচিত ছিল। সুতরাং তাদেরকে বোঝাতে হবে। বোঝাতে গেলে কবিদের বলতে হবে এই দেখো কীরকম বিশাল লোক ছিল, দশটা মাথা ছিল, এইরকম ধরনের বীর রাবণ। রাবণ বীর তো বুঝলাম, কিন্তু তাঁকে রামচন্দ্র মারতে গেলেন কেন? রামচন্দ্র মারলেন কারণ রামচন্দ্র দেবতা। তখন গায়েনরা নিজেদের মতো করে এর ব্যাখ্যা দিল শত্রুভাবে সাধনার বাংলার (অন্-আর্য শব্দটা না বলে) দেশীয় মানুষদের উপর।

উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির বিনিময় যখন হচ্ছিল যেটাকে আমরা বলতে পারি 'Acculturation' বা সাংস্কৃতিক বিনিময়, সেই বিনিময়ের সময়ে একধরণের সমন্বয় ঘটানোর কথা ভেবে যে তুমি এতদিন ব্রাহ্মণকে সমর্থন করোনি, তুমি এতদিন ছোটোখাটো লৌকিক দেবতাকে নিয়েছিলে – কখনো শীতলাকে, কখনো ঘেঁটুকে। তুমি কি জানো আসলে শীতলা মহামায়ারই রূপ, ঘেঁটু আসলে কৃষ্ণরই আর এক রূপ। অবতারত্ব তো এভাবেই নানা জায়গায় ছড়িয়ে গেছে। ফলে মানুষকে Accommodate করা হয়েছে। অনেক মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আসা হয়েছে। অন্য দেশ হলে কী করতো? আফ্রিকা হলে হটেনাট, বুশল্যাণ্ডদের মেরে কেটে শেষ করে দিত। নিউজিল্যাণ্ডে হলে সেখানকার আদিম জনজাতিকে শেষ করে দিত। সামোয়া বলে একটা জনজাতি এখন ছোট্ট হয়ে গেছে। মাউরিদের শক্তি ছিল, লড়ে গেছে। যাই হোক অস্ট্রেলিয়া, সেখানকার আদিম জনজাতি কোথায়? হারিয়ে গেছে। এখন মিউজিয়ামে রাখতে হয় তাদের। আমাদের দেশে আদিম জনজাতি ছিল না এমনটা নয়। ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে একটা ভক্তিভাব জেগে উঠল।

ভক্তিভাবের কারণ শুধু ওপর থেকে প্রেসার নয়, ভক্তিভাবের কারণ ভারতীয় দর্শন। যে দর্শন শেখায়, ব্রহ্ম যেখানে যেমন আছেন তোমার শরীরেও সেরকম একটি ব্রহ্ম আছে। এইটা যখন শেখায় তখন সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে একটা পরিবর্তন আসে যে, হ্যাঁ এতদিন আমি আপত্তি করেছি, কিন্তু এখন আমার আসক্তি আসছে। এই আপত্তি ও আসক্তির মাঝখানে রাবণ, তরণী সেন এরা এসে হাজির। যারা শত্রুভাবে ভজনা করছে। ধরো, সুবাহু রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। কিন্তু তুমি কি এটাকে যুদ্ধ বলবে? এটা তো ভক্তির সংগ্রাম। তরণী সেন ভক্তির সংগ্রাম করছে। ফলে এ এক অন্য ধরনের বাংলা। এই বাংলাটা ছিল বলেই চৈতন্যদেব বলেছিলেন – 'চন্ডালপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণ'। অর্থাৎ এই বাংলার ভেতরে Acculturation-র আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল বলেই এটা হয়েছে। যবন হরিদাসের কীর্তিও তাই। জগাই-মাধাই শেষ পর্যন্ত স্মরণ নিচ্ছেন চৈতন্য-নিত্যানন্দের কাছে। এর বাইরে বেরিয়ে যদি অন্য ব্যাখ্যা করবে তাহলে সেটা Contradiction-র ব্যাখ্যা। এই Contradiction-এর ব্যাখ্যাটা ভারতীয় সমাজে কখনও Accepted হয়নি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নাগরিক লোক ধর্ম মানি না, প্রান্তিক, মানবতাবাদী এইসব বলেছে। কিন্তু তাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনো স্থায়ী ফলাফল দেখিনি।

প্রশ্ন : হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের পথে উচ্চবর্গের সঙ্গে নিম্নবর্গের সহাবস্থান লক্ষ করা গেল। সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণের প্রচেষ্টা দেখা গেল। কিন্তু বর্তমান যুগে দাঁড়িয়ে বলা যায় এই বৈষম্য দূরীকরণের প্রচেষ্টা ব্যর্থ। বরং সে বৈষম্য আরো প্রকট হয়েছে। ধর্মীয় রাজনীতির সংকীর্ণতাই কী এর জন্য দায়ী? আসলে হয়তো বৈষম্য দূরীকরণের মানবিক মনোভাব সেখানে ছিল না। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

উত্তর : না। প্রকট হয়েছে, না আগে বেশি ছিল, এখন কম হয়েছে; আগে আপত্তি ছিল না, এখন আপত্তি হয়েছে এগুলো তো জটিল প্রশ্ন। কিন্তু মধ্যযুগের বাংলায় অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং অন্যান্য অধিকারের প্রশ্নে সাধারণ মানুষের অধিকার ছিল। হ্যাঁ, উচ্চবর্গের মানুষেরা আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আসলে দেবভাবনার মধ্যে রয়েছে Production-এর সম্পর্ক। দুটো ক্ষেত্রেই – চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল। আরণ্যক জীবন থেকে কৃষিজীবনে উত্তরণ। এটাই গল্পের প্রধান ছবি। আর একটা জিনিস আছে – বাণিজ্য ব্যবস্থার সঙ্গে একধরনের সম্পর্ক। এই যে বাণিজ্য ব্যবস্থা, মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্যগুলি যখন লেখা তখন তো ছিল না কারণ রঘুনন্দন তো বলে দিয়েছেন যাত্রা নিষেধ। কারণ আরব বণিকেরা ও অন্যান্য ওলন্দাজরা এসে সমুদ্র দখল করেছিল। এবার যেটা বলার, আখেটিক খন্ডে দেবী কার কাছে পুজো পাচ্ছে? কালকেতুর কাছে। যে সমাজের বাইরের লোক। সেই লোকটিই তো বলছে – 'কেহ না পরশ করে লোকে বলে লাজ'। তাহলে সে তো অস্পৃশ্য সমাজের লোক। তাকে রাজা করে দিলেন চণ্ডী। কার স্বপ্নপূরণের গল্প? দরিদ্র, আজকের ভাষায় দলিত, প্রান্তিক, আদিবাসী এইসব

মানুষদের। এদের কাছে দেবী চণ্ডী দেখা দিচ্ছে। এটাকে তুমি যেভাবে বললে, সেইভাবে সামাজিক দ্বন্দের ছবি কী এর মধ্যে আছে? নাকি প্রান্তিক মানুষকে সমাজে অন্তর্ভুক্ত করার আকাঙ্ক্ষা আছে। দ্বিতীয়টাই তো বেশি। যারা সাপের ওঝা তারা মনসাকে পুজো করে ধীরে ধীরে সমাজের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। জেলে - জালুয়া, মালুয়া মনসাকে পুজো করে সমাজে ঢুকছে। বচাই, চাষী সমাজে ঢুকছে মনসাকে কেন্দ্র করে। মনসা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। কাকে সরিয়ে? বলা যায় শিবকে অনেকটা নির্জীত করে। এর মধ্যে দিয়ে নিম্নবর্গীয়মানুষের ক্রমোচ্চশীলতাই তো প্রকাশ পাচ্ছে। ফলে এ দ্বন্দ্বটা প্রধান নয়, সমন্বয়টা প্রধান। এখানে প্রান্তিকতা প্রধান নয়, sublimation বা ঊর্ধ্বায়নটাই প্রধান। এই ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। মার্কেন্ডেয় চন্ডী তো খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর। মার্কেন্ডেয় চণ্ডীতে স্পষ্ট বলা হচ্ছে যে, পশুকে রক্ষা করেন যিনি তিনি হচ্ছেন চণ্ডী। ওঁরাওদের দেবতা চণ্ডী - তাকে পুজো করে শিকারে যেতে হবে। তাহলে কী প্রমাণ হচ্ছে? প্রান্তিক মানুষের জীবনবিন্যাস উচ্চতর সমাজের মানুষ গ্রহণ করছে। কেন গ্রহণ করছে? ফরাসি কথা হলে বলতাম- ভোকস্ পপুলি অর্থাৎ মানুষ জনগণের কণ্ঠস্বর। সাধারণ মানুষ যা বোঝে, যা ভাবে, যা করে সেটাকে Accommodate করতে বাধ্য হচ্ছে উচ্চবর্গের মানুষ। এটাকে বলা যায় সাংস্কৃতিক বিনিময় বা একধরনের মিশ্রণ। মিশ্রণের দিক থেকে না দেখে আমরা যদি একতরফা উচ্চবর্গের সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়া বলি তা হলে এই ধরনের প্রশ্নগুলো উঠে আসবে। আজকের ভারতে ইংরেজ আমলের পরে অর্থনীতির সচলতা বেড়েছে। এই আর্থিক সচলতা বাড়ায় আমদের প্রাচীন এশিয়াটিক mode of production Hampered হয়েছে। ফলে যারা ছিল গ্রামীণ ক্ষেতমজুর চাষী, তারা কর্মচ্যুত হয়ে ধীরে ধীরে শহরের দিকে আসতে বাধ্য হয়েছে। ফলে তারা ধীরে ধীরে শ্রেণীতে বিকশিত হয়েছে। তবে মূল ভারতে এ ঘটনা তেমন ঘটেনি। ঘটেছে কোথায়? উপকূলবর্তী ভারতে। ইংরেজরা শাসন করবার জন্য কলকাতাকে রাজধানী করেছে। এগুলো সব হচ্ছে সমুদ্রের দিকে। কেন? জাহাজে করে মাল নিয়ে যাবে। আর কারখানা হতে পারে, কাঠ চেরাই হতে পারে তাহলে রেললাইন তৈরি কর। এইভাবে দেশটাকে দখল করছে। এর ফলে উপকূলবর্তী এলাকায় সামাজিক সচলতা বা Social mobility বৃদ্ধি পেয়েছে। Social mobility বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে শ্রেণীবিন্যাস তীক্ষ্ণ হয়েছে এবং শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন এই জায়গাগুলিতে বেশি হয়েছে। ফলে এখনো যেটুকু লাল ঝান্ডা আছে সেগুলো উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে। অর্থাৎ কলকাতাকে কেন্দ্র করে, তামিলনাড়ুকে কেন্দ্র করে, তেজওয়াড়াকে কেন্দ্র করে পুরো উপকূলবর্তী শহরগুলিতে, মালাবার উপকূল, কেরলে এখন রাজত্ব করছে। এই থাকার কারণে এখানে ইংরেজরা এসেছিল, সামাজিক সচলতা বৃদ্ধি পেয়েছিল, শ্রেণীসংঘাত বৃদ্ধি পেয়েছিল, গ্রামছাড়া মানুষরা এখানে পেশার জন্য এসেছে এবং তাদের মধ্যে সংঘাত তৈরি হয়েছে। ফলে দারিদ্র্য ইত্যাদি অর্থনৈতিক সচলতা এবং সাম্রাজ্যবাদী কাঠামো সেগুলো দায়ী। আগেও ছিল, এখনও আছে। কিন্তু শ্রেণীশোষণের মাত্রা পরে বেড়েছে। এর কারণ আগে Accumulated

হয়েছে যে মানুষরা তারা আগে নির্ভর করেছে ভারতীয় সংস্কৃতির উপর। এখন যারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে তারা নির্ভর করেছে পাশ্চাত্যের উপর। এই দুটোকে এক খাপে বন্দি করে প্রশ্ন করলে ঠিকঠাক উত্তর পাওয়া যাবে না।

প্রশ্ন : 'ইউসুফ জোলেখা', 'লোরচন্দ্রাণী', 'পদ্মাবতী' প্রভৃতি মানবিক প্রেমের কাহিনিগুলোকে কী আমরা আধুনিকতার উৎসমুখ হিসাবে বিচার করতে পারি?

উত্তর : এটা একেবারেই ভুল। কেন ? এগুলোর কোনোটাই ধর্মনিরপেক্ষ নয়। আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসকারেরা বারবার এটাকে রোমান্টিক প্রণয়গীতিকা বলেছে। রোমান্টিক প্রণয়গীতিকা শব্দটির যে তাৎপর্য সেই তাৎপর্য ময়মনসিংহ গীতিকার কয়েকটি গীতিকা ছাড়া কোথাও এটা Applicable হয়নি। কেন ? 'ইউসুফ জোলেখা', 'সির-হি-ফরহাদ' কিংবা 'লায়লা মজনু' প্রেমের কাহিনি। কিন্তু এই কাহিনিগুলির তাৎপর্য আলাদা। প্রথম এই ধরনের লেখা ভারতবর্ষে লিখেছেন যিনি তিনি আহুদী ভাষায় মানিক মহম্মদ চারিত। তিনি এটাকে সুফি সাধনার ইশারা হিসাবে দেখেছেন। সুফি সাধনা কী? সবাই জানে। সুফি সাধনা তত্ত্ব কী ? আমরা সবাই জানি। জালালুদ্দিন রুসি তাঁর মসনভির মধ্যে বলছে কোরানের নির্যাস এনে তোমাদের দিলাম আসার এই মসনভি বইটা পড়ো। আর হাড়গোড়গুলো ছুড়ে দিলাম মোল্লাদের জন্য। তাহলে কী দাঁড়ালো? ওরা হচ্ছে কুকুরের দল। মূল কথাটা তো তাই। ভারতবর্ষে সুফিরা যখন ঢুকেছে তখন তাদের মধ্যে একটা দ্বিধা ছিল, তারা রাজশক্তির অনুগত ছিল এবং তারা নিজেদেরকে ইসলাম মনে করেছে। এবার স্থানীয়ভাবে প্রতিপত্তি অর্জন করার জন্য কখনো ফুরফুরা-শরিফ, কখনো ভাটিয়ালি-শরিফ তৈরি করেছে। এটা প্রায় রাজশক্তির সমান্তরাল ছিল। এটা একটা দিক। আর যে সাহিত্যিক অভিব্যক্তি সেখানে তারা স্পষ্ট বলছেন ঈশ্বর হচ্ছেন পরমপুরুষ, তাই তিনি আসিক। আমরা হচ্ছি প্রকৃতি। ফলে আমরা সবাই মাসুক। এই মাসুক আসিকের দিকে যাচ্ছে এবং ৬০,০০০ পর্দাকে ভেদ করে তাঁর দেখা পাচ্ছে। 'লোরচন্দ্রানী'র গল্প তো তাই-ই – রূপানুরাগের গল্প। এই রূপানুরাগ আসলে আধ্যাত্মিক রূপানুরাগ। এই রূপানুরাগ আসলে সুফি সাধনার নূর-এর সাধনা। ফলে একে রূপক কল্প হিসেবেই ধরা উচিত এবং এটা ধর্মীয় রূপক।

ধর্মীয় রূপককে যারা রোমান্টিক প্রণয় আখ্যানরূপে ব্যাখ্যা করেছেন, তাদের ব্যাখ্যা ভুল। সাহিত্যের ইতিহাসে এই জায়গাটা ঠিক বলা হয়নি। তবে এর লৌকিক একটা উৎস রয়েছে। সির-ই-ফরহাদ কিংবা ধরো হির-রাঞ্ঝা। হির-রাঞ্ঝার গল্পটা হচ্ছে পঞ্জাবি থেকে নেওয়া। লোরচন্দ্রাণীর গল্পটাও হচ্ছে পূর্ব ভারতের। আর পদ্মাবতী-এর গল্পটা হচ্ছে পশ্চিম ভারতের, রাজস্থানের। আর যে গল্পগুলো আছে সেগুলো সবই ভারতের বাইরের। ইরাক, ইরান, বড় জোর হলে পশ্চিম পারস্যের। সবই এগুলো ধর্মীয় সাধনার রূপক। ব্যাখ্যা নিয়ে লেখা। অর্থাৎ পদাবলী সাহিত্য, জয়দেবের গীতগোবিন্দ একধরনের ধর্মীয় আবরণে আমরা ব্যাখ্যা করি। এ লেখাগুলিকেও এভাবেই দেখা উচিত। এ লেখাগুলো মোটেই ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য নয়। আধুনিকতার ইঙ্গিত যদি পাওয়া যায় তাহলে তা লেখকের নিজস্ব স্টাইলের মধ্যে

আছে। যেমন লোরচন্দ্রাণীতে ময়নামতীর যে সতীত্বের কথা বলা হচ্ছে, ময়নামতীর যে বারোমাস্যার কথা বলা হচ্ছে এটা কী ? এটা নিয়ে আমি বিস্তৃত আলোচনা করেছি দৌলত কাজীর 'লৌকিক ও মৌলিক জগত' বইয়ের মধ্যে। এখন এই যে দৌলত কাজীর কাব্যে বিরহের, বারোমাস্যার কথা আছে। কিন্তু সতী ময়নার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। অর্থাৎ বারোমাস্যার কথা ফুল্লরা বা সনকা যখন বলে তখন তারা দুঃখের কথা বলে। এখানেও দুঃখের কথা আছে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা গল্পের ছায়া আছে। গল্পটা কী? সতী ময়নার স্বামী যখন চন্দাইনের প্রতি আকৃষ্ট, তাকে বিয়ে করেছে। ময়না এটা শুনেছে। ফলে বিরহ শুধু এক্ষেত্রে বিরহ নয়, একধরনের ক্ষোভ। অনেকগুলো মাত্রা এর মধ্যে রয়েছে। এসে কেউ কেউ বলেছে যে নায়ক তোকে উপহার পাঠিয়েছে। সতীময়না প্রত্যাখ্যান করেছে। পরবর্তী শান্তিলতার যে বারোমাস্যার কথা পাওয়া গেছে তার সঙ্গে এগুলোর একটু মিল আছে। অর্থাৎ কখনো কখনো চরিত্রগুলি আধুনিকতার লক্ষণাক্রান্ত হয়ে ওঠেনি একথা বলছি না। কিন্তু মূলে এই লেখাগুলো ধর্মীয় তত্ত্বের আবরণে উপস্থাপিত।

প্রশ্ন : প্রেম ও বীর্যত্বের মহিমায় ধর্মমঙ্গল ও ময়মনসিংহ গীতিকার নারীদেরকে বিচার করা যায় কী?

উত্তর : ময়মনসিংহ গীতিকার সবাই যে খুব বীর্যবতী এমনটা নয়। তাদের চরিত্রের মধ্যে নারীর মহিমা সবসময় তো বাইরের দিক থেকে থাকে না, ধরে নাও মহুয়া বিষলখ্যার ছুরি নিয়ে, গুয়ার মধ্যে বিষ মিশিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা দেখায় – এ খুব বীরত্বের কাহিনি কিংবা নৌকার সবাইকে মেরে ফেলে অট্টহাসি হাসছে। এমন জায়গাগুলো মহুয়ার মধ্যে খুব সুন্দরভাবে আছে। কিন্তু চন্দ্রাবতীর মধ্যে তা তো নেই। চন্দ্রাবতী নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে। এই গুটিয়ে নেওয়ার মধ্যেও একটা চরিত্রের বল আছে। নারীত্বের এই দুটি প্রান্ত ময়মনসিংহ গীতিকায় চমৎকারভাবে উপস্থাপিত করা হয়ছে। এটিকে আমরা নিশ্চিতভাবে নারীর স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের জায়গা বলে ধরতে পারি।

ধর্মমঙ্গল কাব্যে রঞ্জাবতীর মধ্যে খুব প্রকাশিত হয়েছে একথা বলব না। কিন্তু বিশেষ করে লখাই ডোমনী, ধুমসী বা কানড়া সুন্দরী – এদের চরিত্রে বীরত্বের মহিমা প্রকাশিত হয়েছে। ময়মনসিংহ গীতিকার কবিরা জনপ্রিয়। তারা আসর যেরকম চাইছে সেরকম লিখছে। ধর্মমঙ্গলের কবিরাও স্থানীয়ভাবে জনপ্রিয়। কিন্তু তাদের মধ্যে ঘনরাম, মানিকরাম ছাড়া আর যে কবিরা আছে তারা খুব উঁচু মাপের কবি নয়। ফলে হয়েছে কী এটা একেবারে মহাকাব্যের উপাদান সমৃদ্ধ একটি কাব্য। সেটাকে ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। এই লেখাগুলির মহিলা চরিত্রগুলি (লখাই ডোমনী, ধুমসী কানড়ার সঙ্গে যোগ দিয়ে দুর্গ রক্ষা করেছে, মহামদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে) –র এরকম বীরত্ব বাংলা সাহিত্যে আর দেখা যায় না। ফলে ঠিকমতো ব্যবহার হলে লেখাগুলি চিরস্থায়ী সত্যে প্রতিষ্ঠিত হত। তা সত্ত্বেও এ গৌরব আমাদের খেয়াল করা দরকার।

প্রশ্ন : আপনি বিপ্রদাস পিপলাই-এর মনসামঙ্গল, জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল সম্পাদনা করেছেন। এগুলি কোনোটা উত্তরবঙ্গের, কোনোটা পূর্ববঙ্গের। ফলে এক্ষেত্রে মৌলিক কিছু তফাৎ লক্ষ করা যায় কী?

উত্তর : আসলে মনসামঙ্গল কেবলমাত্র বাংলার কাহিনি নয়। এর একটা অংশ তৈরি হয়েছে বিহার থেকে। যেখানে বিষহরি ব্রত নামে একটি ব্রত আছে। আমি পেয়েছি তোমার আরশিলা বলে একটি গ্রামে, সাহেবগঞ্জে। সেখানে একজন বিহারী কবি বাংলায় মনসামঙ্গলের ধুয়া লিখেছেন। বড় কবি। সেটা সম্পর্কে আমরা জানি না। এটা নিয়ে আমি প্রথম আলোচনা করেছি। একটা বই উড়িষ্যায় জনপ্রিয় ছিল যে Text টার উপর বিষ্ণুপদ পান্ডা Edit করেছেন। ফলে বাংলার ভূগোলে এটা সীমাবদ্ধ ছিল না। বোডো সমাজে মনসা এত জনপ্রিয় যে সেখানে একটি বাংলা বোডো মেশানো মনসামঙ্গল আছে। কোনো লোক কোনো আলোচনা করেননি। আমি শুধু ওই বই থেকে আলোচনা করেছি। বইটির নাম হচ্ছে 'মায়াবন্তী বিষহরী'। আমি অনেক কষ্টে জোগাড় করেছি। নায়ারণদেবের যে মনসামঙ্গল বাংলায় চালু, আসামেও সেই মনসামঙ্গলটি একটু ভাষার এধার ওধার করে নারায়ণের নামে চলে এবং আসামে ব্যাপক চল। ওরা 'সুকন্নানি' বলে। অনিরুদ্ধ, দুর্গাবর এই ধরনের বিশেষ কয়েকজন কবি আছেন যারা উত্তরবঙ্গে কবিতা লিখেছেন এবং সেই কবিতা আসামেও জনপ্রিয় হয়েছে। শ্রীহট্টে হয়েছে, ত্রিপুরায় হয়েছে। এই করে বাংলার যে রাজনৈতিক ভূগোল তার থেকে বাইরে বেশ কিছু জায়গায় মনসামঙ্গলের প্রতিষ্ঠা লক্ষ করা যায়। দেবী মনসা তো চন্ডীগড়েও আছে, হরিদ্বারেও আছে। আর দেবী মনসার একদল ভক্ত হচ্ছেন 'রোমাণী'। (ইউরোপের জীবশিব)। বছরে একবার করে এসে চন্ডী মন্দিরে পূজা দিয়ে যায় এবং এরা নিজেদেরকে মনে করেন তারা ভারতবর্ষেরই লোক এবং তাদের ভঙ্গতত্ত্বে মিল আছে। তাদের কার্যকলাপেও দেখা যায় তারা একটু snake charmer গোছের। সারা ভারতে যারা সাপের খেলা দেখায় বিশেষ করে উত্তর ভারতের নিম্নবর্গ তারা নিজেদেরকে বলে আমরা বাঙালি। তাদের জাতিনামও হয়ে গেছে বাঙালি। অথচ বাংলার কিছুমাত্র জানে না কিন্তু তারা হচ্ছে বাঙালি। তারা যখন মন্ত্র দেয় একজন শিষ্যকে বা একজন গুরুকে ধরে, ধরে তার কাছে মন্ত্র শেখে, সেটা তারা শিখতে যায় অম্বুবাচীর মেলায় কামাক্ষ্যা মন্দিরে। তাহলে এই যে চলন, এই চলনগুলো থেকে বোঝা যায় মনসামঙ্গল শুধু কিন্তু একজায়গাকার নয় এবং ফলে এই যাতায়াতগুলোর মধ্যে থেকে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে মনসাপুজোতে নানা রকমের ছোটো ছোটো কাহিনি তৈরি হয়েছে। যেমন ধরো নারায়ণদেবের লেখায়, বিজয়গুপ্তের লেখায়, বিপ্রদাস পিপিলাই-এর লেখায় হাসান-হোসেনের পালা যতখানি বিস্তৃত হয়েছে; জগজ্জীবন ঘোষালের লেখায়, কেতকাদাসের লেখায় ততখানি বিস্তৃত হয়নি। জগজ্জীবন ঘোষাল এক অর্থে কিন্তু বাংলার লোক যদি তুমি Geographyটা দেখ। কারণ জগজ্জীবন ঘোষাল বাৎসই-এর কাছাকাছি একটা গ্রামে (সম্ভবতঃ

কুচুটা বা কুচুটি) জন্মেছেন। ফলে ওনাকে তো বাঙালি কবি বলা যায় হিসেব করে। আবার অন্যদিক থেকে দেখলে ওটা রাজশাহীর জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। ফলে সেক্ষেত্রে তখন ভূগোলটা বাংলারই ভূগোল ছিল। ফলে একেবারে Stereo type আলোচনা করলে এটা নিয়ে অসুবিধা আছে। জগজ্জীবন ঘোষাল ব্যাপারটাকে নিয়ে মজা করেছেন। কিন্তু উনি যেখানটায় থাকতেন, ঐ সময়টায় যখন থাকতেন তখন মুসলমানের সংখ্যা কিন্তু বেশি ছিল। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দও মুসলিম প্রধান এলাকার কবি নন বলেই মনে হয়। কারণ উনি পশ্চিমবঙ্গের লোক। উত্তরবঙ্গের কবিরাও কিন্তু বিশেষ করে অনিরুদ্ধ, দুর্গাবর; এরা কিন্তু হাসান-হোসেন পালাকে গুরুত্ব দেননি। দ্বিজ বংশীদাস দিয়েছেন, নারায়ণদেব দিয়েছেন এবং বিজয় গুপ্ত; এরা হাসান-হোসেন পালাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ মুসলমান হয়ে যাওয়া হিন্দুদের একটা অংশ তারা যদি ফিরে আসে খুব ভালো হয়। আমিও লিখেছি এটা আমার বড় প্রবন্ধে। 'মন্ত্রে মন্দ্রিত বাংলার কথাচিত্র' এরকম একটি নাম হবে। সেটাতে দেখিয়েছি যে হিন্দু সাপুড়ে যারা মুসলমান, যারা বিশেষ করে সাপের মন্ত্র পড়ে। তাদের মন্ত্রের গঠন এক। শেষকালে গিয়ে কোথাও কোথাও, মুসলমানরা লেখে কার আজ্ঞে, আল্লার আজ্ঞে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নেই, মনসার আজ্ঞে ইত্যাদি থাকে। তাহলে বোঝা যায় তারা একই Cultural mentality-র মধ্যে থেকে মানুষ হয়েছে। এক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈচিত্র্য যেমন আছে, তেমনি আবার ভাবগত ঐক্যও আছে। মূলত মনসামঙ্গলের কাহিনি বাংলার কৃষিজীবী সমাজের। আসলে ধান রোয়া হচ্ছে, ধানের মৃত্যু হচ্ছে। তারপরে আস্তে আস্তে অঙ্কুরিত হচ্ছে, ছ'মাস গিয়ে তাকে নিয়ে আসা হচ্ছে। ছিল একটা, হল সাতটা। মানে ছিল একা লখিন্দর, কিন্তু ফিরে এল সবাইকে নিয়ে। ধান চাষও আসলে তো তাই। একটা-দুটো করে ফেললাম, প্রচুর ফিরে এল। এই রূপকটাই কাহিনির মধ্যে রয়েছে। তাই এটা কৃষিজীবী সভ্যতার কাহিনি। সাপ এখানে অন্য আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ে আসে। এটা জন্ম এবং মৃত্যুর রহস্য।

প্রশ্ন : পুথি সম্পাদনার ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ বিষয় সম্পর্কে লক্ষ রাখা দরকার ?

উত্তর : সম্পাদনা দু'রকম হতে পারে। একটা, আধুনিক সাহিত্যের সম্পাদনা। সেটারও লক্ষ্য লেখক যেটা চেয়েছেন তার কাছাকাছি যাওয়া। আর মধ্যযুগের সাহিত্যের সম্পাদনার লক্ষ্যও তাই। কিন্তু মধ্যযুগের সাহিত্য সম্পাদনায় Text-টাকে ভালো করে গুরুত্ব দিতে হবে। এটাকে Textual Criticism বলে। এটা বিস্তৃত বিষয়। আর যে সময়ে লেখা হচ্ছে সেটাকে ভালো করে জানতে হবে। কবিকে জানতে হবে। অর্থাৎ কবির কাছাকাছি যেতে হবে। অর্থাৎ কবির কাছাকাছি স্থান ও কালের পুথি জোগাড় করে সেটাকে Exemplar এবং বাকিদের variant reading হিসাবে স্থির করতে হবে।

প্রশ্ন : আধুনিক যুগ পেরিয়ে আমার উত্তর আধুনিক যুগে উপনীত হয়েছি। এই সময়ে দাঁড়িয়ে মধ্যযুগ চর্চা প্রাসঙ্গিক কিনা সে সম্পর্কে আপনি কিছু বলুন।

উত্তর : শোনো, আমার বয়স হচ্ছে এখন ৬২ বছর, তোমাদের বয়স ২২ বা ২৪ বছর হবে। এবার তোমরা যখন ছোটো ছিলে তখন অন্যরকম ছিলে। একটা সময় খেলাধূলা করতে, এখন লেখাপড়া করছ। আমি একটা সময় এসে লেখাপড়া করে একটা সীমায় এসে অধ্যাপনা করছি। তাহলে এই গোটা বিকাশটা মিলিয়েই তো জীবন। আমাদের সমাজকে, ইতিহাসকে বাদ দিয়ে সাহিত্য নয়। সাহিত্য দু'রকম হতে পারে। একটা তাৎক্ষণিক আনন্দের জন্য লিখলাম। এমনকি Android Phone আছে, Post করে দিলাম। এই Instant যে সাহিত্য তার একটা Temporal জগত আছে। কিন্তু আমরা যারা সাহিত্যের Faculty-র সঙ্গে যুক্ত, আমরা Temporal-কে কী শুধু Temporal-ই রাখব। নাকি External বলে একটা কিছু আছে তার সঙ্গে। Eternal এবং Temporal – এই দুটোকে যদি বিন্যস্ত করি, তাহলে আজকের যুগের সাহিত্যের যে গুরুত্ব, মধ্যযুগের সাহিত্যকেও তেমনি গুরুত্ব দিতে হবে। তুমি যখন মন্থন করবে তখন দু'হাত দিয়েই দড়ি টানতে হবে। তা না হলে মন্থন হবে না। তাই বাংলা সাহিত্য যারা পড়ছে তাদেরকেও মন্থন করে দেখতে হবে কী ছিলাম, কী হয়েছি। এই কী ছিলাম তা না বুঝলে তো কী হয়েছি – এটার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবো না। তাই মধ্যযুগের সাহিত্য অনিবার্য। আমি খটমট ভাষা পড়তে পারি না, পুথি পড়তে পারি না। সুতরাং আধুনিক, এইটা বললে আমি আসলে একপায়ে হাঁটতে চাইছি। এক পায়ে হাঁটা যায় না।

মুখোমুখি বিভাস চক্রবর্তী : একটি সাক্ষাৎকার

অনুদাত্ত মল্লিক

অনুদাত্ত : আপনার নাট্যজগতে আসার প্রেরণাটা কী?

বিভাস : ও তুমি সেই প্রথাগতভাবেই শুরু করলে। ঠিক আছে আমিও বলছি প্রথাগতভাবে। আমার প্রেরণা...(স্বল্পক্ষণ থেমে) প্রেরণা কিনা জানি না তবে আকর্ষণটা জন্মে ছিল ছোট থেকেই। আমি যে পরিবেশে বড় হয়েছি সেখানে আমার বাবা[১] ছিলেন একজন 'রাজনীতিক', পেশাগতভাবে একজন 'সাংবাদিক'। একজন কী বলব (ভেবে) 'সংস্কৃতিকর্মী'। তো আমি দেখেছিলাম আমাদের বাড়িটাকে কেন্দ্র করে এক সংস্কৃতি চর্চা শুরু হয়েছিল। বাবা ছিলেন 'প্রগতি লেখক-শিল্পী সঙ্ঘে'র সভাপতি। 'কংগ্রেসি' নেতা হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন সিলেট *ডিস্ট্রিক্টের* এক 'ডাকসাইটের' নেতা। তখন তিনি একটা পত্রিকার[২] সম্পাদকও ছিলেন এবং ওখানকার ওই লেখালিখি নিয়ে সাহিত্য সভা হতো। সেখানে নাটক হতো। প্রায়ই সাহিত্যের সাপ্তাহিক বৈঠক হতো। এইসব কর্মকাণ্ড কাছ থেকে দেখেছি প্লাস আমার শহরে কিছু সাংস্কৃতিক নাটকের কাজ দেখেছি। একদিকে যেমন গণনাট্য সঙ্ঘের মানে ওই প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের নাটক দেখেছি, সেখানে বাবা নাটক লিখেছেন... (ভাবতে ভাবতে) *আই.পি.টি.এ*-এর লোকেরা কাজ করেছেন সেখানে, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, নাটকে লেখা বাবার গানে সুর দিচ্ছেন, এই দিকটা যেমন লক্ষ করেছি তেমনি অন্যদিকে শহরের বাবুরা, বাবুসম্প্রদায় বছরে একবার করে *'অ্যামেচার থিয়েটার'* করেছেন, খুব আড়ম্বরসহ জমকালো থিয়েটার করেছেন - এইগুলো ভীষণভাবে আমায় *টাচ্* করত আরকি এবং থিয়েটারে গান হতো, অমুক হতো কিন্তু কেন জানি থিয়েটারটা আমায় আকর্ষণ করত। কোলকাতা থেকে ভাড়া করে সেট যেত, কোলকাতা থেকে ভাড়া করে 'মহিলা' শিল্পী যেত, মানে পুরুষ শিল্পী যারা মহিলা শিল্পীর অভিনয় করতেন, ভাড়া করে সখীর দল যেত, কোলকাতা থেকে ভাড়া করে *মিউজিশিয়ান* যেত। কোলকাতার মঞ্চ সফল নাটকগুলো সেখানে হতো। 'কর্ণার্জুন'[৩], 'উত্তরা' এই সব নাটক-টাটক হত। সেইগুলো আকর্ষণ করত। *ওয়ান গ্রানজার অফ পাবলিক থিয়েটার*। আবার অন্যদিকে *'পলিট্যক্যাল প্লে'* ওই ধর ১৯৪৫-এর রসিদ আলি দিবস নিয়ে কোলকাতায় বাবার লেখা নাটক দেখেছি বা হেমাঙ্গ বিশ্বাস-এর নৌ-বিদ্রোহ নিয়ে, 'নীল সমুদ্র লাল হয়ে গেল নাবিকের রক্তধারা' - এই বলে ছায়ানৃত্য, গান - এই সমস্ত দেখেছি। সব নিয়ে তৈরি হয়েছে আকর্ষণটা। সেটাকে তো চিহ্নিত করা যাবে না, যে এটার থেকে ওটা হল, ওটার থেকে ওটা হল - এইগুলো অঙ্কে আসে না। ওগুলো ভিতরে সঞ্চিত হয়। এক একটা লোকের এক এক দিকে আকর্ষণ যায়। এটাই।

অনুদাত্ত : 'প্রস্তাব'এর বিভাস চক্রবর্তী থেকে আজকের বিভাস চক্রবর্তী, এই যে ধারাটা অব্যাহত রয়েছে তার ইতিহাসটা যদি বলেন।

বিভাস : 'প্রস্তাব' মানে?

অনুদাত্ত : প্রথম আপনার পরিচালিত নাটক।

বিভাস : প্রথম পরিচালিত কী 'প্রস্তাব'[৪]? হয়তো 'নান্দীকারে' আছে। নান্দীকারে প্রথম 'প্রস্তাব'টা করেছিলাম। কিন্তু তার আগে আমাদের প্রেসিডেন্সি কলেজে করেছি[৫]। তারপরে (অল্প ভেবে) পাড়াতে আমার বাবার অনুপ্রেরণাতে তৈরি করেছি একটা দল[৬]। সেখানে কিছু কিছু ছোট ছোট নাটক করেছি। এই রকম এক কমপিটিশানে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে দেখা। তিনি *জাজ্* ছিলেন। ওখানে আমার অভিনয় দেখে[৭] ভালো লাগে ওঁর। তিনি যখন 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র'[৮] নিয়মিত ভাবে করবেন বলে ঠিক করন তখন খোঁজ করেন এবং তাঁর মনে পড়ে দমদমে বিভাস চক্রবর্তী বলে একজনকে দেখেছিলাম। চিন্ময়দা[৯] তখন একটু অসুবিধার মধ্যে পড়েছিলেন, নাট্যকারের সন্ধানে করতে পারছিলেন না। তখন আমাকে ডেকে নিয়ে আসেন। সেখান থেকেই আমার সর্বনাশের শুরু।

অনুদাত্ত : আজকেও যে ধারাটা অব্যাহত রয়েছে সেটা যদি একটু বলেন।

বিভাস : এটা একটা বিরাট ব্যাপার। যখন আমাদের এই কাজগুলো হয় তখন আমাদের কতগুলো ধারণাতো জন্মায়। ধারণা জন্মায় এই থিয়েটারটা আসলে কী যেটা সামনে দেখছি আমরা। পাবলিক থিয়েটারটা কী? এই থিয়েটারটা কী যেটা শম্ভু মিত্র করছেন? যে থিয়েটার অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় করছেন? এইখানে পুরো তফাৎ তৈরি হয়। যখন তফাৎ তৈরি হয় তখন কিন্তু তার নিজের *অপশানও* তৈরি হতে থাকে ভিতরে ভিতরে। কোনটাতে *অপ্ট* করব? আমার জন্য কোনটা? আমার কোনটা ক্ষেত্র? তার নিজের মন তাই... এটা তো কোনভাবে ব্যাখ্যা করা যাবেনা কীভাবে তৈরি হয়। তখন মনে হয়েছিল যে ফাস্ট *অপশানটা* থিয়েটার। একনম্বর থিয়েটার। তার পর খুঁজেছি কী ধরনের থিয়েটার? কোন থিয়েটার? কোলকাতায়ও থিয়েটার দেখে গেছি[১০] আমি। সিলেট থেকে এসেছি বেড়াতে। মামা নিয়ে গেছেন মিনার্ভা'য় 'গৈরিক পতাকা'[১১] দেখাতে। পাশেই বিডন স্ট্রীটের ওখানে ছিলাম আমরা। পরে এখানে এসে 'শ্যামলী'[১২] দেখেছি। আর শ্যামবাজারের যে এলাকায় ছিলাম সেটা থিয়েটার, সিনেমার *হাব*। প্রচুর সিনেমা হল, প্রচুর থিয়েটার হল শ্যামবাজার পাড়ায় ওই হাতিবাগান এলাকায়। তো এইগুলোর *এক্সপ্লোজার* তো হয়েছেই। কিন্তু ধীরে ধীরে নিজের একটা পছন্দ তৈরি হয়েছে। (থেমে) বিদেশী সিনেমা দেখাতাম, বিদেশী থিয়েটার দেখতাম। আমাদের দূতাভাসগুলো *মেনলি* ব্রিটিশ এবং আমেরিকান ইংরেজি নাটক নিয়ে আসতো। সেগুলো 'নিউ অ্যামপেয়ারে' এক টাকার টিকিট কেটে উপরে চড়ে বসে দেখাতাম। এই থেকেই থিয়েটার জীবনের সার্বিক(থেমে) ধারণা তৈরি হয়েছে এবং আস্তে আস্তে নিজের *অপশানগুলো* ভিতরে নিশ্চই দানা বাঁধতে শুরু করেছে। তখন *'কমারসিয়াল থিয়েটার'* দেখেছি। দেশে থাকতে যে রকম বললাম নাটক দেখেছি তেমনি এখানে এসে প্রথম যখন 'রক্তকরবী' দেখলাম তখন থিয়েটারের অর্থটাই পালটে গেল। থিয়েটার এইভাবে হয়? এটাই আমাকে বেশি টানছে। যখন উৎপল দত্তের নাটক দেখলাম তখনও মনে হল এটাই আমাকে টানছে বেশি এবং তার যে সংগঠনের চেহারা তাও টানে আমায়। সেখানেও দেখতে পাচ্ছি (স্বল্প থেমে) তারা তাদের মতন করে নাটক করছে। আমিও এটাই মনে করতাম যে নিজের ধারণা অনুযায়ী থিয়েটার করতে হবে আমাকে, নিজের ভাবনা অনুযায়ী। কাউকে অনুসরণ করে নয়, অনুকরণ করে নয়। কোন একটা ভেড়াকে অনুসরণ করে নয়। আর নিজের মতন করে থিয়েটার করতে

গেলে নিজের একটা স্বাধীনতা থাকা দরকার। সেই স্বাধীনতা একমাত্র *গ্রুপ* থিয়েটার দেয়। এমন এক ধরনের থিয়েটার (গ্রুপ থিয়েটার) যেখানে পুঁজির জন্য ভাবতে হবে না, কারুর দরজায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে না, সমমনস্ক, সমভাবাপন্ন কিছু মানুষ একজোট হয়ে একটা 'সমবায়' ভিত্তিতে, কাজটা করতে পারবে এবং সেই মতো আমি দেখলাম যে এই থিয়েটারটাই আমায় টানছে আমি এটাই করব। আমি 'সমবায়' মানে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সমবায়ের কথা বলছি না, ভাবনাগত সমবায়ের কথাও বলছি। অন্য জায়গায় (থিয়েটারে) (থেমে) আমাকে কেউ পুঁজি দেবে না। সুতরাং এই ধারাটাই সঠিক ধারা আমাদের মতো মানুষের পক্ষে। বিশেষ করে আমায় (থেমে) প্রেসিডেন্সি থেকে ৫৭ সালে *বি.এ* পাশ করে বেড়িয়েই চাকরিতে[১৩] ঢুকতে হয়েছিল অর্থনৈতিক কারণে। সেখান থেকে বেড়িয়েই আমি ৫৮ সালে *ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি'র মেম্বার* হয়েছি। *ফিল্ম সোসাইটি'র মেম্বার* বোধ হয় ১০০ জন ছিল। আর সারা ভারতবর্ষে দুটো *ফিল্মসোসাইটি* ছিল। একটা ছিল আমাদের ওই *ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি* আর বোম্বেতে ছিল 'আনন্দম্' বলে একটা *ফিল্ম সোসাইটি*। সেখানে আমি *ফিল্ম* করার স্বপ্ন দেখতাম। এটাও আমার স্বপ্নের মধ্যে ছিল কিন্তু *ইন প্রাক্টিস* আমি যেটা করতাম সেটা থিয়েটার। *ফিল্মটা* তো আর *প্রাক্টিস* করার সুযোগ নেই। কিন্তু *ফিল্ম সোসাইটির* জন্য লিখতাম, পত্রিকায় লিখেছি সেগুলো প্রকাশিত হত। আর দাদাদের সঙ্গে থাকতাম *(ফিল্ম সোসাইটির সিনিয়ার* বা *মেন্টার),* তাদের আলোচনা শুনতাম। প্রচুর ছবি দেখেছি ফিল্ম সোসাইটির কল্যাণে। আমায় যখন নান্দীকারে অজিতেশ ডেকে নিলেন[১৪] তখন অজিতেশ আমাকে পেয়ে অনেককে চিঠি লিখে বলতেন প্রাক্তনদের কাছে যে, একজন এসেছে বিভাস চক্রবর্তী, আমাদের থিয়েটারের পক্ষে খুব প্রয়োজনীয় মানুষ। কিন্তু বোধ হয় থাকবে না, থিয়েটার করবে না, সিনেমায় চলে যাবে যা কথাবার্তা শুনি। (অল্প হেসে)এই রকম একটা ধারণা ছিল। কিন্তু আমি সিনেমাতে গেলাম না ওই একটাই কারণে। (ভেবে) কম কাজ করব তবু নিজের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য কারুর কাছে হাত পাতবো না, পায়ে ধরব না, অমুক করবো না, ধর্ণা দেবো না --- এইগুলো আমার চরিত্রে নেই আরকি। তখনও ছিলনা এখনও নেই। *অ্যাস ফর এক্সযাম্পেল* আমি কোন দিন কোন *পলিটিশিয়ানকে* কিংবা কোন নেতাকে সে বামই হোক আর ডানই হোক কোনদিন নাটক দেখতে বলিনি। বুদ্ধদেব ভাট্টাচার্যই হোক, জ্যোতিবাবুই হোক, কিংবা প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সীই হোক, সুব্রত মুখার্জিই হোক বা সৌগত রায়ই হোক তারা এসেছেন নিজের তাগিদে, দেখেছেন। এই সম্মানবোধটা ছিল আমার। যে থিয়েটারটা আমি করছি তুমি যদি মনে করো দেখার যোগ্য, বিভাস চক্রবর্তীর থিয়েটারটা দেখার যোগ্য তাহলে এসো, *ওয়েলকাম*। আমি তোমাকে বলব না দয়া করে যদি আপনি দেখেন। কিন্তু এটা আজকাল আকছার দেখছি তো। শুধু এখন নয় আগে বাম আমলেও দেখেছি। সেই জন্য আমার ওদের উপর একটু রাগও আছে। আমি লোকটা বড্ডবেশি আত্মম্ভরি, কিন্তু আমি আত্মম্ভরি আমার থিয়েটার নিয়ে। আমি শম্ভু মিত্রের পায়ের কাছে বসতে পারি। সত্যজিৎ রায়ের পায়ের তলায় বসে থাকতে পারি। আমি শিল্পীর পায়ের কাছে বসে থাকতে পারি। কিন্তু আমি (স্বল্প থেমে) অন্যদের বিশেষ করে *পলিটিশিয়ানদের... নো, নেভার.* এই সমস্ত কারণেই আমি দেখলাম যে থিয়েটারেই সবচেয়ে সম্মান। নিজের সম্মান বজায় রেখে, নিজের ভাবনা-চিন্তাগুলোকে সঠিক ভাবে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে সবদিক থেকেই এই থিয়েটারটাই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য। সেই জন্যই আমি *অপ্ট* করলাম এবং

তার পরে আজ পর্যন্ত আমি কিছু কিছু ধারা*চেঞ্জ* করার চেষ্টা করেছি কিন্তু সেটা হয়নি। আমি থিয়েটারের *কনস্টিটিউশান* থেকে আরম্ভ করে 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ'[১৫]-এর *কনস্টিটিউশান* তৈরি করেছি। তার পরে 'সময়' বলল যে এই *কনস্টিটিউশানটা* এখন আর চলে না। 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ'-এর *কনস্টিটিউশানটা* কী করে করেছিলাম? নান্দীকারের যে (থেমে) অভিজ্ঞতা, তার যে *লুপ হোলস্‌গুলো* লক্ষ করেছিলাম *কনস্টিটিউশানে* সেইগুলোই *ইমপ্রুভমেন্ট* করতে চেষ্টা করেছি। 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ'-এ প্রথম চেষ্টা করেছিলাম। এই *কনস্টিটিউশান* অনেকে যেমন 'থিয়েটার কমিউন'[১৬] কিংবা 'শূদ্রক'[১৭]-এর দেবাশিষ দে'র দল তারা *মডেল* করে নিয়ে গিয়েছিল (*কনস্টিটিউশান*) আমরা অন্য রকম করেছিলাম বলে। তারপর এটারও প্রয়োজন পড়লো বদলাবার। তখন আমি আবার *সেকেন্ড টাইম* একটা *কনস্টিটিউশান* তৈরি করলাম। তার পর অনেকগুলো *কনস্টিটিউশান* তৈরি করেছি। আবার সি.আর.টি (ক্যালকাটা রেপাটারী থিয়েটার) তে যৌথ কাজ করেছি রুদ্রের[১৮] নেতৃত্বে, আরও অনেকে ছিল - আমি, অরুণ মুখোপাধ্যায় এরা। সেখানেও *কনস্টিটিউশান* আমি করেছি কিংবা পরের 'নাট্য সংহতি'[১৯] তার *কনস্টিটিউশান* আমি করেছি। আমার সংগঠনের একটা ভাবনা-চিন্তা গোড়া থেকেই ছিল। সংগঠনের জিনিসগুলো আসে কোথা থেকে জান তো! তুমি যদি সংগঠনের সাথে জড়াও তাহলে বুঝবে। যেমন ধর বলি পাড়ার সরস্বতী পুজো *কমিটির সেক্রেটারি* যদি হও কিংবা পাড়ার *ক্লাবের* যে *লাইব্রেরী* সেটা যদি তুমি চালাও যদি *লাইব্রেরিয়ান* হও বা *সেক্রেটারি* হও এবং ঠিকঠাক সংগঠন করার মানসিকতা যদি থাকে তাহলে শুধু পুরনো ধারার মতো করে চালানো নয় ,তুমি নতুন কিছু, *অ্যাড*ও করতে পারবে। ভাবনা-চিন্তা তোমার মধ্যে আসবে। সেই জন্য আমার এই সংগঠন সম্পর্কে একটা ধারণা পাশাপাশি *গ্রো* করেছে এবং থিয়েটার দলের সংগঠন কী রকম হওয়া উচিত না উচিত সেই নিয়ে ভেবেছি একটা সময়। একটা সময় বলব। তার পর সব স্রোতের *এগেনস্টে* দাঁড়িয়ে থাকা দীর্ঘদিন ধরে অন্য রকম ভাবনা নিয়ে কঠিন, খুব কঠিন। নিজেই কখন নিজের অজ্ঞাতে এই *সিস্টেমের* একটা *পার্ট* হয়ে যাই আমরা কারণ আমাদের মাথায় চিন্তা আসে যে থিয়েটারটা তো করতে হবে। এই সময়ের একদম বিরুদ্ধে গিয়ে করলে তো থিয়েটারটা করতে পারবো না। *আই হ্যাব টু সারভাইভ*। এই দুটোর কারণে আস্তে আস্তে আমিও নিজেকে দেখেছি *জাজ্* করে, বিচার করে আমিও কিন্তু এই ধারণায় গা মিশিয়েছি। *জাস্ট* এই মুহূর্তে একটু আগে যেটা বললাম (থেমে) *ইট'স নট এ আইডিয়াল সিচুয়েশান, নট অ্যাট অল বাট আই হ্যাব টু সারভাইভ*। আমার একটা গ্রুপ আছে, কিছু ছেলে অন্তত আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি একটা *প্রপার্টি* করেছি, তিনতলা বাড়ি তৈরি করেছি। এটা আমি সঠিক ভাবে চালাতে না পারলে এখানে খেও-খেয়ি শুরু হয়ে যাবে। বাবা-মা'র সম্পত্তি নিয়ে যেমন খেও-খেয়ি হয় তেমনি খেও-খেয়ি শুরু হবে। এই রকম নানা চিন্তাভাবনায় ক্লিষ্ট হয়ে আস্তে আস্তে সরেও যেমন এসেছি হতাশও হয়েছি। মানে থিয়েটার ছেড়ে দেওয়াই উচিৎ আমার। আমার এই অবস্থায় এই থিয়েটারে থাকাই উচিৎ নয়। আমি যদি থিয়েটারকে নতুন রকম করে আমার ভাবনা অনুযায়ী রূপ দিতে না পারি তাহলে সেখানে থাকা উচিৎ নয়। যে *সিস্টেম* চলছে তার সাথে আপোষ করে থাকা উচিৎ নয়। এটা আপোষকামিতা।

অনুদাত্ত : 'অভিনয়' আর 'বাস্তব' এই শব্দদুটিকে কী ভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

বিভাস : ছাগলে আর মানুষে যা তফাৎ। (থেমে, হেসে) এটা ব্যাখ্যা করা যাবে না। স্বাভাবিক অভিনয় নিয়ে খুব কথা হতো। '*ন্যাচারাল* অভিনয়' শব্দটার ব্যবহার করা হয় খুব। বলা হয় এমন *ন্যাচারাল* অভিনয় যে মনেই হলোনা যে সে অভিনয় করছে। মনেই যদি না হয় তাহলে আমি আনন্দটা কীভাবে পাচ্ছি? বাড়িতে এই করছে, ওই করছে, রান্না করছে, বান্না করছে, ছেলে-মেয়ে স্কুলে যাচ্ছে, পড়াশোনা করছে এটাই জীবনের (ভেবে) শিল্প নয়। এটা তো জীবন। এতেই যদি আনন্দ পেয়ে বসে থাকি তাহলে শিল্পটা কী? শিল্পটা কোথায় তৈরি হল? শিল্প যেহেতু এর উর্দ্ধে অন্য একটা কিছু যেখানে জীবনও থাকবে, বাস্তবতাও থাকবে কিন্তু তার থেকে একটা আলাদা মাত্রা, আলাদা রূপ, আলাদা বর্ণ, আলাদা কিছু থাকবে। আমি ছাগলের কথা কেন বললাম? শম্ভু মিত্র বলতেন স্বাভাবিক অভিনয় করার বিষয়ে, স্বাভাবিকতার শেষ কথা যদি হয় জীবনে যা করে তাই করা তাহলে তো একটা ছাগল হচ্ছে সবচেয়ে স্বাভাবিক কারণ সে তো অ-ছাগল সুলভ আচরণ করতেই পারবে না। সে তো ছাগলের মতোই করবে। ছাগলের অধিক কিছু করতেই পারবে না। তার সেই ক্ষমতাই নেই। তাহলে সেই সবচেয়ে স্বাভাবিক অভিনেতা। মানুষ অন্য রকম করতে পারে বলেই মানুষ (থেমে) শিল্পটাকে *ক্রিয়েট* করতে পারে। আমি যদি দেখি যে জানলার মধ্যে দিয়ে রোদ্দুর এসে পড়ছে গাছের উপর – এটা একজন *আর্টিস্ট*, শিল্পী তার মতন করে ভেবে আঁকবে। এটাই যদি স্বাভাবিক একদম হুবহু *ফটোগ্রাফিক রিয়ালিটিতে* আঁকত তাহলে আমার মনে হতো এটা তো দেখতেই পাচ্ছি আমি। শিল্পী যে আর একটা রূপ দিল সেটা স্বাভাবিকতার সাথে মিলবে না। কিন্তু তবুও সেটা শিল্প হয়ে উঠবে এবং সেটা কোথাও যেন ভিতরে আমাকে স্পর্শ করবে। সেটা একটা অন্য জায়গায় নিয়ে গেল। স্বাভাবিকতা বিষয়টা কেমন? (হেসে) খুব *বেসিক* গোদা মোটা দাগের কথা বলি, ধরো আমি একটা লোকের জীবনী নিয়ে একটা নাটক করছি। মাইকেলের জীবনী। মাইকেলের জীবন কত বছর? তার ব্যাপ্তি কী? তার খুঁটিনাটি যত রকম ঘটনা ঘটেছিল এই সব নিয়ে যদি *অ্যাস ইট ইস* তুলে ধরি তাহলে স্বাভাবিক হয়, মাইকেলের কিছু বাদ পরল না। কিন্তু আমি যখন প্রথমেই মাইকেলের জীবনটাকে এইটুকুতে (হাতে ইঙ্গিত করে) নিয়ে আসছি একটা মাপের মধ্যে মানে আমি সেখানে গ্রহণ বর্জন করছি। আমি কোন দৃশ্য আনবো, কোন এপিসোড আনবো, তার জীবনের অভিমুখ কী হবে – সেইগুলো যখন স্থির করে আমি ধরো ২০০ পাতার একটা বই করলাম সেটাই তো মনে হচ্ছে স্বাভাবিক নয়। স্বাভাবিকতা তো যত বছর মাইকেল বেঁচে ছিলেন। কিন্তু সেটাকে আমি নিয়ে আসছি দুই ঘণ্টার একটা বা ১২০ পাতা বা ২০০ পাতার বইতে। এবার যদি *এনঅ্যাক্ট* করি তাহলে ১২০ মিনিট। তাই তো? বেসিক ওখানেই তাহলে স্বাভবিকতা নেই বোঝা গেল। শিল্প তাহলে ওই তথাকথিত স্বাভাবিকতার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয় না। শিল্পের আলাদা একটা গঠন আছে। ধরো একজন মাইম যখন (হাতের ইঙ্গিতে গ্লাস রাখার ভঙ্গি করে) এখানে একটা গ্লাস রাখল একটা 'টক' করে শব্দ হল, মানে গ্লাসের নিচে একটা শক্ত *সার্ফেস* আছে, সেখানে গ্লাস রাখল। ধরো মাইম আর্টিস্টরা যদি দেখায় যে এই গ্লাস থেকে (জল পানের ভঙ্গি করে গলার সাহায্যে) জল খেয়ে রেখে দিল। তাহলে পুরো পড়ে যাবে গ্লাসটা। তাহলে কী দেখায় সে? সে ভঙ্গি করে দেখায় যে (গলায় জল ঢালার অভিনয় করে) জল খেয়ে গ্লাসটা যেন সে একটা শক্ত

সার্ফেসের ওপর রাখল। আমি একটা ছোট্ট ঘটনার উদাহরণ দিলাম। এই যে জিনিসগুলো মানুষের মাথা থেকে বেড়িয়েছে তা এক একটা শিল্প মাধ্যমের জন্য। আমি যেটা মাইমের কথা বললাম তেমনি যখন আমি থিয়েটারটা করব তখন স্বাভাবিকতাও কিন্তু তার মতো করে কতগুলো *টার্মস* বা শর্ত তৈরি করবে। এই নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মানুষ কাজ করেছেন, গবেষণা করেছেন, যত তত্ত্ব লিখে গেছেন। স্তানিস্লাভস্কি একটা সময় পাহাড়ে গিয়ে, পাহাড়ের নামটা কী ভুলে গেছিলেন শুধু সেখানকার মানুষের ব্যবহার, আচার-আচরণ, ভাবনা-চিন্তা জানার জন্য। তুমি যখন আমাকে প্রশ্ন করছ প্রশ্নটা এসে কানের ভিতর দিয়ে *ব্রেনে* যাচ্ছে তাই তো? এবার আমার *ব্রেন* আমার উত্তর তৈরি করছে। উত্তর তৈরি করে আমার শেখা যে বিন্যাস বা শেখা যে গঠনপ্রণালী সেইটা দিয়ে কথাগুলো সাজাচ্ছে ভিতরে। সাজিয়ে আমার মুখ দিয়ে বের করছে তাই তো? এটা একটা বিজ্ঞানের *প্রসেস্*। এই বিজ্ঞানের *প্রসেস্* শিল্পের ক্ষেত্রেও ঘটছে। শিল্পের ক্ষেত্রে আমি যখন মঞ্চে দাঁড়িয়ে তোমার কথা শুনছি তখন আমায় এমন ভাবে দেখাতে হচ্ছে যে তোমার কথা শুনে উত্তরটা যেন স্বাভাবিক ভাবেই তৈরি করছি। মানুষ দেখে নিজের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সাথে মিলিয়ে কথাটা তৈরি হল কিনা। পরে ও যে সংলাপটা বলল সেটা ওই ভাবে (বিজ্ঞানের *প্রসেস্*) তৈরি হয়ে এলো কিনা? সেই অভিনয়-ই সঠিক যে ওইটা *সিমিউলেট* করতে পারবে। ওই রকমভাবে দেখাতে পারবে যে, আমি শুনলাম তোমার কথা খুব গভীরভাবে, দিয়ে চিন্তা করলাম, দিয়ে উত্তর দিলাম। দেখ আমি যখন কথা বললাম বুঝতে পারছে যে ভিতরে ঠিকঠাক তৈরি হল। তাহলে এই রকম অনেকগুলো ব্যাপার আছে। থিয়েটারের স্বাভাবিকতা হুবহু *স্লাইস অফ লাইফ* তুলে ধরা নয়। এর আর একটা স্তর আছে, *ভয়েস এক্সপ্রেশান*। ধরো আমার স্ত্রী ডাকলেন, (স্ত্রীর কথা বলার ভঙ্গি নকল করে) 'আমি যাচ্ছি গো'। আমি বললাম (গলার সাহায্যে কথোপকথনের অভিনয় করে) 'হ্যাঁ ঠিক আছে। চাবি নিয়ে গেছো তো?' এই *টোনটা* আমার স্ত্রীর জন্য। আবার আমার নাতি যখন বলবে, (নাতির কথা বলার ভঙ্গি নকল করে) 'দাদু আমি আসছি', আমি বললাম (কথোপকথনের অভিনয় করে) 'সাবধানে যেও বাবা। শোন, শোন তোমার কিন্তু এখান থেকে বাসে যাবার দরকার নেই। পাশেই ট্যাক্সিস্ট্যান্ড আছে, ট্যাক্সি ধরে চলে যাও। টাকা পয়সা আছে তো সঙ্গে?' – এই টোনটা আলাদা হল। এই আমি যে উদাহরণগুলো দিচ্ছি এইগুলো কিন্তু আমাদের মধ্যেই রয়েছে। এইগুলো আমাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই আছে। থিয়েটারে এই জিনিসটাই *সিমিউলেট* করা হয়। অর্থাৎ *অ্যাস ইট ইস* নয়। কিন্তু আমার গলাটা ওই রকম করতেই হবে। আমার স্ত্রীর সাথে (মঞ্চে) *কনভারশেসানটা* ওই রকম করতেই হবে। আমি যখন নাতির সাথে কথা বলছি তখন গলাটা ওই রকম করতেই হবে (মঞ্চে)। এটা প্রদর্শনের জন্য। তার মানে *এক্সজিভিশানিজিম্* নয় *রিপ্রেজেন্টেশান*। সুতরাং সেই মাত্রাটা যোগ করতে হবে তার সঙ্গে। দেখে মনে হল যে তিনি অভিনয় করলেনই না এটারও অবশ্য একটা ব্যাখ্যা আছে। আমি এইগুলো লিখেছি, একটা বই বেরবে শিগ্রই। ধরো কিছু মহিলারা সাজগোজ করেন। কিছু মহিলা আছেন সাজগোজ করেছেন আর সেই কারণে তাকে সুন্দর দেখাচ্ছে কিন্তু মনে হচ্ছে না উনি সাজগোজ করেছেন। আর কিছু মহিলা আছেন সাজগোজ করলে বোঝা যায় সেজেছেন। কিংবা কিছু আছেন সাজেননি ফলে তাদের ফ্যাট ফ্যাটে লাগছে, ঠিক আকর্ষণীয় লাগছে না। সাজগোজ করাটা আকর্ষণ করার জন্য দরকার। একদম যদি সাজগোজ না করি তাহলে আকর্ষণটা কমে যেতে পারে। আমার মতো লোকও যে কোনদিন

জীবনে *স্নো-পাউডার* মাখেনি, তেল মাখেনি সেও জানে কী রকম পোশাক পড়লে আমায় ভালো দেখাবে। আমার মতো করে ভালো দেখাবে। একটা ল্যাদাশ মার্কা লোক লাগবে না। কোনটা করলে আমার যারা বন্ধু আছে, আমার যারা (ভেবে) গুণগ্রাহী আছে তাদের সামনে নিজেকে গুছিয়ে প্রেজেন্ট করা যাবে। আমি অনেক সময় জামা-কাপড় পরে আমার স্ত্রীকে বলি 'ঠিক আছে তো?' কারণ একটা আকাঙ্ক্ষা। আমরা এই সাজগোজের মতো মাত্রাগুলো অ্যাড করি সে পোশাকের মাধ্যমেই হোক, বাচনিক হোক, অঙ্গ ভঙ্গিতে হোক, চলা ফেরায় হোক, বা *মেকাপে* হোক। তবে থিয়েটারটা হবে। *অ্যাস ইট ইস* চলে গেলে সেটা অন্য রকম হতে পারে, কিন্তু সেখানে বাচনে বা শারীরিক ভঙ্গিতে অন্য মাত্রা যোগ করতে হয়। সেখানে হয়তো *মেকাপের* ব্যাপারটা অতো থাকে না, সেখানে হয়তো *ইউনিফর্ম* (কালো কাপড়, প্যান্ট) পরে বাদলবাবুদের মতো থিয়েটার হয়। এই ভাবে হাজারো রকমের *পারমোডেশান কম্বিনেশান* হতে পারে।

অনুদাত্ত : আপনি যদি 'নির্দেশক' হন তাহলে অভিনেতাদের 'অভিনয়ে' স্বাধীনতা দেবেন?

বিভাস : কীসের স্বাধীনতা? স্বাধীনতার *ডেফিনেশান* কী? মোটেই দেবো না ওই স্বাধীনতা যদি হয় যা খুশি করা।*নো*। যেহেতু আমি নির্দেশক সেহেতু আমি নাটকটা ভেবেছি এইভাবে *প্রেজেন্ট* করব, এই *স্টাইলটা* হবে।*এ স্টাইল অফ প্রেজেন্টেশান ইস দিস*। আমি যখন আমার প্রথম জীবনের দুটো নাটক 'রাজরক্ত'[২০] আর 'চাকভাঙা মধু'[২১] করি সেখানে 'রাজরক্ত' একটা কাব্যধর্মী, সাংকেতিক, প্রতীকী অনেকটা 'রক্তকরবী'র মতো আধুনিক নাটক। তার চেহারার ছবিগুলো অন্যরকম। সেই ছবি জীবনের সাথে মিলবে না, কিন্তু তার কতগুলো রেখা থাকবে। কতগুলো চরিত্র আঁকা হবে। আঁকাতেই পরিস্ফুট হয়ে যাবে এটা আমার জীবনের কোন লোকটাকে বোঝাচ্ছে। সেইটা হচ্ছে আমাদের 'রাজরক্ত'। তার *মিউজিক* আলাদা হবে। তার পোশাক আলাদা হবে। (ভেবে) তার *কম্পোজিশান* আলাদা হবে। তার *ব্লকিং* আলাদা হবে। সমস্ত কিছু আলাদা হবে। তার স্বরক্ষেপণ অন্য রকম হবে। আবার 'চাকভাঙা মধু' *ইস এ রিয়ালিস্টিক প্লে*। *ইট'স এ ওয়েল মেড কনভেনশানাল প্লে*। জীবনের কতো কাছাকাছি ফুটিয়ে তুলতে পারি সেই চরিত্রগুলোকে আমার দেখা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সেটাই লক্ষ্য। 'রাজরক্ত' অনেক বেশি কল্পনার কিন্তু বাস্তবের উপর দাঁড়িয়ে কল্পনার মূর্তি দিচ্ছে। *বেসিক* কিন্তু বাস্তব। শিক্ষা জগতে শোষণের মানে আধিপত্যবাদের এই সমস্ত নানা রকম ব্যাপারই আনছি আমি। তখন চরিত্রগুলো এক এক রকম চেহারা নিয়ে আসছে। আর এখানে সবার দেখা ওই চরিত্রগুলো, সবাই বুঝতে পারছে এই চরিত্রগুলো কারা? সেই জায়গায় আমাকে এমন একটা মাত্রা যোগ করতে হচ্ছে যেটা স্বাভাবিক হয়েও তার উর্দ্ধে একটা জগত তৈরি করছে। উর্দ্ধে মানে চরিত্রগুলোকে মাত্রা দিচ্ছে। কেন নাটকটা করছি আমি? কী জন্য করছি? সেই সমস্তগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে, স্থূল ভাবেও হতে পারে... স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সুতরাং এইটাই হচ্ছে কোন নাটক কীভাবে করব সেটা পরিচালকের ভাবনা। পরিচালক আমি। তুমি *অ্যাক্টিং* করছ, তুমি তো আর ভাবনি কীভাবে করবে, কীভাবে বাঁধবে। তুমি ভাবনি আমি ভেবেছি, এবার তোমায় ভাবাবো আমি। যে আমি এই ভাবে নাটকটা করতে চাই এই করো, এই চরিত্রটা এই ভাবে ভেবেছি এইভাবে করো। এবার তোমার যে *স্কিল*, নিজস্ব *স্কিল* আছে,

নিজস্ব চিন্তার জগত আছে, ভাবনা আছে সেইগুলো দিয়ে এবারে তুমি কিছু *অ্যাড* করতেও পারো। যদিও তোমার নিজেস্ব *ইনপুট* দেওয়াটাই কাম্য। আমার হাতের পুতুল নও তুমি। (ভেবে) তুমিও একটা সজীব। তুমিও চিন্তা করতে পারো, তোমারও *কন্ট্রিবিউশান* করার ক্ষমতা আছে। তুমি যখন অভিনয় করবে তখন যদি *ডিরেক্টার* দেখে যে তুমি তার মতো করে ভেবেছ এবং অনেকগুলো নতুন ব্যাপার ভেবেছ, *বেটার*-ও ভেবে থাকতে পারো তাহলে সেখানে হস্তক্ষেপের কোন প্রশ্নই নেই। সেটা তো আমার *ক্রিয়েশানটাকেই* শক্তিশালী করছে। কিন্তু দেখা যায় কাঁচা ভাবনা থেকে বেমক্কা কাজ করে বসে। তখন (ভেবে) বলতে হয় পাকামো করো না, যা বলছি সেটা করো। কারণ ওর বোঝার ক্ষমতা নেই। তার জন্যই *ডিরেক্টারকে* আমাদের দেশে আমাদের *সিস্টেমে* আমাদের অভিনয় শিক্ষক হতে হয়। অভিনয় *ক্রিয়েশানের* ক্ষেত্র, অভিনয় আমি শেখাবো কেন? আমি *স্কিল্ড* অভিনেতা পাবো। তাকে বলবো এই নাটক এই ভাবে ভেবেছি, এই ভাবে *প্রেজেন্টেশান* হবে। এবার ও নিজের মতো করবে। সে ক্ষমতা তাদের নেই তো। সেই জন্যই *ডিরেক্টার* দেখিয়ে দেয় এখানে। *আনফরচুনেটলি* আমাদের এখানকার অভিনেতারা ডিরেক্টার এর মতো ভাবতে পারে না। আমাদের দেশে এটা *ব্যাকোয়ার্ডনেসের* পরিচয়। অবশ্য *ডিরেক্টার* হাজার হাজার। এখন বাংলায় *ডিরেক্টারের* কোন অভাব নেই। ঢিল ছুঁড়লেই *ডিরেক্টার*। ডিরেক্টারকে দেখিয়ে দিতে হবে কেন? পরিচালক বসে থাকবে চেয়ারে এবং অনেক কথা বলবে, বোঝাবার জন্য তাকে প্রচুর আয়োজন করতে হবে। আমাদের এখানে একটু বেশি কথা বলতে হয় নইলে ঢ্যাঙস মেরে পরে থাকে সব। ইঙ্গিতে বোঝে না। অল্প কথায় বোঝে না সেই রকম অভিনেতা ছাড়া। সুতরাং স্বাধীনতা বিষয়টা হচ্ছে আপেক্ষিক। কার স্বাধীনতা? কতটুকু স্বাধীনতা? কেন স্বাধীনতা এইগুলো ভাবা দরকার। একটা মূর্খকে স্বাধীনতা দিলে তো খুব মুশকিল হয়। বুদ্ধিমান লোককে স্বাধীনতা দিলে নিজের উপকার হয়, সমাজের উপকার হয়।

অনুদাত্ত : থিয়েটারে আপনি 'ভারতীয় উপাদান'কে বেশি গুরুত্ব দেবেন নাকি 'পাশ্চাত্যের উপাদান'কে?

বিভাস : আমি ওই রকম ভাগ করতে জানি নে। শিখিনি। আমার কাছে যেটা যেমন প্রয়োজন মনে হয় ব্যবহার করি। আমি যখন আমার 'মাধব মালঞ্চী কইন্যা'[২২] করি তখন আমার রক্তের ভিতরে যে পূর্ববঙ্গ রয়েছে তার গান, তার জল-হাওয়া, তার ভাষা এই সমস্ত কিছুই কাজ করে। তখন আমি একবারে দেশজ অনেকগুলো *এলিমেন্টস* ব্যবহার করি, উপাদান ব্যবহার করি। 'মাধব মালঞ্চী কইন্যা'তে একটা অদ্ভুত সাঙ্কেতিকতা আছে। অদ্ভুত মাদকতা আছে আমাদের সংলাপের মধ্যে, অদ্ভুত সারল্য আছে। এইগুলো যখন আনি তখন দেশজ সমস্ত কিছু ব্যবহার করি। আবার যখন আমি 'শোয়াইক গেল যুদ্ধে'[২৩] করি, ব্রেখটের নাটক করি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের *ব্যাকগ্রাউন্ডে* হিটলারের অধিকৃত চেকশ্লোভাকিয়ায় ছোট মাপের মানুষ শোয়াইক কীভাবে *সারভাইভ* করছে সেখানে আবার অন্যরকম *এলিমেন্টস* আসে যেগুলো *ওয়েস্টারন্*. আমার মধ্যে যেগুলো *স্টোর* হয়ে আছে *ওয়েস্টারন্* সিনেমা দেখা থেকে আরাম্ভ করে যা কিছু সেগুলো এসে যায়। মনে হয় এক্ষেত্রে এটাই বেশি মানুষকে প্রভাবিত করবে। আবার অন্ধভাবে কোন তত্ত্বও ফলো করি না। যেমন ব্রেখটের *থিয়োরি* আছে, অমুক আছে জানি, পড়েছি কিছু কিন্তু ব্রেখটের থিয়োরি মেনে করিনি শোয়াইক। ব্রেখট বলতেন *মিউজিকে*

বেহালাকে আমি অত্যন্ত অপছন্দ করি। কিন্তু আমার নাটকে বেহালা একটা অত্যন্ত *ইমপর্টেন্ট রোল প্লে* করে কারণ আমাদের দেশের দর্শক। আমিতো আমার দর্শকের জন্য করছি, আমিতো জার্মান দর্শকের জন্য করছি না। আমি আমার দর্শকের এই সময়ের জন্য করছি। সুতরাং এখানে আমার বেহালা দিলে যে *এফেক্টটা* হবে, ওই গানের সঙ্গে ওই বেহালা বাজালে যে ডেপথ্‌টা তৈরি হবে দর্শকের জন্য সেটা খুব *রাইট* হবে। এই নাটকে গান আছে একটা। গানটাতো গাইতে পারব না আমি, গানটা গাইলে বুঝতে পারবে সেখানে অদ্ভুত এক স্বপ্নের জগৎ তৈরি হয়। বিপ্লবীর স্বপ্ন। বিপ্লবের স্বপ্ন। সেটা বেহালা না হলে আমাদের এখানে ঠিক হয় না। আমার দেশের মানুষের জন্য তো করছি আমি। সুতরাং কোন *সেট থিয়োরি ব্লাইন্টলি* অনুসরণ করা উচিৎ নয় বলে আমার মনে হয়। ওটা একটা ব্যক্তির ভাবনা হতে পারে। কেন এটা *জেনারেল প্রিন্সিপাল ফর অল* হবে! একটা উদাহরণ দি, আমি শঙ্খ ঘোষকে প্রশ্ন করেছিলাম, (ভেবে) 'বৌঠাকুরানীর হাট'এর প্রতাপাদিত্যকে নিয়ে নাটক তো, তাহলে একটা ঐতিহাসিক সময়কাল আছে। এবার রবীন্দ্রনাথের প্রতাপাদিত্যের যে রাজসভা সেখানে নৃত্যগীতরতা মহিলারা রয়েছে কিন্তু তারা গান গাইছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরে। কিন্তু প্রাতাপাদিত্য *ইস এ হিস্টোরিকাল ক্যারেকটার*। আমরা ওর *টাইমটা* জানি। বারোভুঁইয়ার আমলটা জানি। তখন কী রাজদরবারে ওই রকম গান গাওয়া হতো রবীন্দ্রনাথের লেখা? তখন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নাকি রবীন্দ্রনাথ সুর দিয়েছিলেন? তাই মনে হয় সুরে *অ্যানম্যালি* আছে। *অ্যানোমালাস*। আমাকে রবীন্দ্রনাথের সুরটাকেই নিতে হবে এমন কোন মানে নেই। এখানে গানের গঠনটা অন্যরকম হবে। দরবারে এসে নর্তকীরা যে ভাবে গান গাইত সেই গানকে আনতে হবে আমাদের গানের ইতিহাস থেকে। (ভেবে) রবীন্দ্রনাথের মতো কী সংলাপ বলতেন প্রাতাপাদিত্যরা? অবশ্য সেটা আলাদা। সেটা তুমি করতেই পারো। আনতেই পারো। থিয়েটারে *অ্যালাওড* এগুলো। কতগুলো জিনিস কোথায় গিয়ে থামতে হবে সেটা জানতে হবে। (থেমে) ইংরেজ চরিত্র থাকলেই আমারা ভাবি সে কথা বলবে এই ভাবে (বাচনিক অভিনয় করে) 'আমি টোমাকে বন্দি করিতে পারে'। এটা কে বলল? এই ভাবে কথা বলত কেউ জানে নাকি? নিজের বানানো একটা। উৎপলদা বলেছিলেন এটা করার তো দরকার নেই। ঠিকই বলেছিলেন। শাজাহান কী বাংলায় কথা বলতে পারে নাকি? তাহলে ডি. এল. রায়ের বাংলা যদি শাজাহান বলতে পারে তাহলে ক্লাইভই বা কেন বলতে পারবে না? এই রকম অনেকগুলো ব্যাপার আছে জানতো। আসলে আমারা চিন্তা করি না । আমি যখন গিরীশ ঘোষের 'বলিদান'[২৪] করি তখন আমার ভালো ভালো অভিনেতা সব - দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, দুলাল লাহিড়ী, চিত্রা সেন, কাজল চৌধুরী। তার মধ্যে কয়েকজন আমাকে প্রশ্ন করল আমরা কী *ওল্ড স্কুলের অ্যাক্টিং* করবো? আমি বললাম *ওল্ড স্কুলের অ্যাক্টিংটা* একটু করে দেখাও আমি জানি না, আমিতো *ওল্ড স্কুলে* ছিলাম না। *ওল্ড স্কুল* মানেটা কী? গিরিশবাবুদের আমলে ওই সময়ে ওটাই ছিল আধুনিক অভিনয়। সময়ের সাথে সাথে তো সেই অভিনয় পাল্টে গেছে। এখন গিরিশবাবুর সংলাপেও হয়তো শব্দের কিছু প্রয়োগ পাল্টাতে হতে পারে এই সময়ের দর্শকদের জন্যে। কিছু এমন করলে যে *অবস্কিওর* লাগছে এমনটা করে তো লাভ নেই। কিন্তু এই সময়ের তুমি যেটা বাস্তব বলে মনে কর সেই বাস্তবধর্মী অভিনয়টা করো। কে বললে *ওল্ড স্কুলের* অভিনয়টা সঠিক অভিনয়। সেই আমলে সুন্দর ছিল হয়তো। আজ শম্ভু মিত্রের 'রক্তকরবী'র[২৫] গলা শুনলে আমার ছোট মেয়ে বলে (ছোট মেয়ের

বাচনিক অভিনয় করে) 'বাবা কীরকম লাগছে!' মিলছে না তো তার ভাবনা চিন্তা, তার টান, তার *রিদিমের সেন্স*। আমাদের যারা বড়ো ছিলেন তারা প্রমতেশ বড়ুয়ার অভিনয়ের ভক্ত ছিলেন। আমাদের শুনে হয়, 'মাগো কী অভিনয়!' যেমন সেই সময়ে ছিল, (বাচনিক অভিনয়ের মাধ্যমে অনুকরণ করে) 'দেবদা নদীতে কত জল! এই জলেও কী আমার কলঙ্ক ধুয়ে যাবে না দেবদা?' – এইরকম ভাবে বললে আজকে কী হবে? এই সমস্তটাই মানুষের ভাবনা-চিন্তার অগ্রগতী, *প্রাকটিসের* উপর নির্ভর করে। আমি সিলেটের থেকে ৪৮ সালে চলে এসেছিলাম। তারপর আমি বহুদিন পর সিলেটে গেছি। আজ থেকে হয়তো কয়েক বছর আগে গিয়ে দেখেছি আমি আর আমার দাদা যে খাস খাঁটি সিলেটিতে কথাবলি, বা যে ভাষা বজায় রেখেছি আমরা দুজনে তা কিন্তু ওরা বলে না। ওরা কীরকম হয়ে গেছে একটা অদ্ভুত। সিলেট তো পারছেই না! আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম। আসলে আমার ভাষার ঘড়ি ৪৮ এ আটকে আছে। আর ওদের ভাষা নিরন্তর ঘর্ষণ, চর্চা, নানাবিধ *ইনফ্লুয়েন্স*, অন্য ভাষার প্রভাবে এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছে যে আমাদের সঙ্গে বিস্তর তফাৎ হয়ে গেছে। আসলে অনেক কিছু ভাবতে হয়। থিয়েটারের সাথে মানব সভ্যতার অনেক কিছু যুক্ত। সেইগুলোকে উপেক্ষা করে আমি এমন কিছু একটা করবো তা হয় না। আবার সেখানে *অ্যাবস্ট্রাকশানেরও* প্রশ্ন আসে। কোন সময় কালই নির্দিষ্ট নয়, কল্পনার উপরেই অনেকখানি নির্ভরশীল। বিশাল একটা বিষয় এটা বুঝতে পেরেছ? এটা আমরা খুব সহজ করে আনি আমাদের সুবিধা হয় বলে। (হাতে ইঙ্গিত করে) এইটুকু জায়গায় কাজ করতে পারলে সুবিধা হয় আমাদের।

অনুদাত্ত : আপনার কী মনে হয় দর্শকের কাছে কোনটা বেশি অভিপ্রেত–'অভিনেতা', 'পরিচালক' নাকি 'গল্প'?

বিভাস : এটাও আবার কোন একটা কিছু বলা যায় না। এই বিষয়েও নানা লোকের নানা মত আছে। (থেমে) শম্ভুদা বলতেন বাবা শেষ পর্যন্ততো গল্পটা আর তুমি কী অভিনয় করছ সেটাই আসল। দর্শকেরা তো শুধুই ওইটুকু দেখতে চায়। কিন্তু শম্ভুদা বলেছিলেন কী জন্যে, না আশেপাশের *ডিজাইন* সর্বস্বতা দেখে, আশেপাশের নানারকম বাহুল্য দেখে, অপ্রয়োজনীয় উপাদনের সমাহার দেখে বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন। আসল তো অনেকগুলো জিনিসেরই দরকার হয়। এখন যেমন বেশিরভাগ নাটক *ডিজাইন* সর্বস্ব নাটক। একটা খুব সাধারণ, স্বাভাবিক নাটক দেখে লোকে এখন বেশি তৃপ্ত হয়। বলে, (বাচনিক অভিনয় করে) 'বাবা!! এই ডিজাইন এর ধূমধাড়াক্কা, নানা রকমের প্যাঁচ নেই'। (ভেবে) সত্যজিৎ রায়-কে আমি বলতাম, আপনি যে ছবিগুলো তৈরি করেছেন সেগুলো তো শিল্পোৎকর্ষের দিক থেকে উচ্চস্থানের, কিন্তু তাও লোকে উপভোগ করত আপনার ছবিগুলো। এর পরবর্তী কালে এই যে তরুণ প্রজন্ম এলো যেমন বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, গৌতম ঘোষ অমুক-তমুক এদের বেশি দর্শক কেন তৈরি হয়না বলুনতো? ওই নন্দনে দেখাল এক সপ্তাহ, তাড় পর শেষ। *ফ্লিম ফেস্টিভালে* গেল, বাইরে *প্রাইজ* নিয়ে এলো। আমাদের দর্শক কতটা উপভোগ করছে সেটা দেখে না কেন? (সত্যজিতবাবুর মতন গলাটা গম্ভীর করে) 'শোন ওরা গল্প বলতে জানে না'। *দে ডোণ্ড নো হাউ টু টেল এ স্টোরি*। এখানে হয়তো সত্যজিৎ রায়কে অনেকে *ব্যাকডেটেড* বলবেন। আবার ভাবো গল্পটাই কী সব? গল্প না বলেও তো আমি সিনেমা তৈরি করতে পারি। সেগুলো

অবশ্য অন্য কথা, আগে তো গল্পটা বলতে শিখতে হবে তবে তো গল্প বলার বিষয়টা ভাঙবি তুই। আগে শেখ কী করে একটা জিনিস বাঁধতে হয়, গঠন করতে হয়, কী করে তার কথনশৈলী সম্পর্কে তৈরি হতে হয়। কিন্তু সেটার জ্ঞান নেই উপর উপর ফাঁকি দিয়ে ভাঙচুরটাকেই শিল্প বলে ধরল, *বেসিক* বলে ধরল। *বেসিকটা* কিন্তু ভাঙচুর নয়। ভাঙচুর যেখানে বলছি আমরা তার মানে সেখানে একটা *কন্সট্রাকশান* ছিল। সেটা ভাঙতে হয়েছে। তাহলে সেই *কন্সট্রাকশানটা* কী? সেটা জানতে হবে। তবেই ভাঙচুর কথাটা আসে। নির্মাণ ছিল বলেই বিনির্মাণ হয়। এই সব ব্যাপারে আমরা ভাবিনা সবসময়। আমিও ভাবিনা। এই যে তুমি ভাবাচ্ছো বলে ভাবছি।

অনুদাত্ত : তাহলে কী বিশ্বাস করবেন যে 'থিয়েটারের দর্শককে হতে হবে শিক্ষিত'।

বিভাস : তা তো বটেই। আজ গ্রামে যখন যাত্রা হয় তখন তো যাত্রা দেখে অভ্যস্ত তারা। তাদের মনের মধ্যে যাত্রার আইডিয়াল রূপ তৈরি হয়েছে। নানা রকমের যাত্রা হচ্ছে, সামাজিক হচ্ছে, পৌরাণিক হচ্ছে, ধর্মমূলক হচ্ছে, ঐতিহাসিক হচ্ছে - এই সবেরই কম-বেশি ধারণা তাদের মধ্যে জমা রয়েছে। এই সব দেখতে দেখতে সে নিজেকে এমন তৈরি করেছে যে সে কিন্তু সমস্ত যাত্রা-ক্রিয়াটা ঠিকঠাক হলে তবেই সেটা গ্রহণ করতে পারে। আমরা শহুরে লোকেরা বলতে পারি ধূর ওই পৌরাণিক নাটক। ওরা তা বলবে না। এটাই সবচেয়ে মুশকিল আমাদের, আমরা দর্শকদের ভাবিনা দর্শক। কিন্তু দর্শকরা যে কোনো কৃত্রিমতা, যেকোনো বাহুল্য, যেকোন বাড়াবাড়ি তারা ধরতে পারে যদি তারা সেরকম দর্শক হয়... কিন্তু দর্শকদেরও অভ্যস্ত হতে হবে। দর্শকদের কী ভাবে অভ্যস্ত হতে হবে? নাট্যক্রিয়া দেখে দেখে অভ্যস্ততা তৈরি করতে হবে। সেই উপভোগের অভ্যস্ততা তৈরি করতে হবে। আমি আজকে হঠাৎ আর্ট এক্সজিভিশানে গেলাম অ্যাকাডেমিতে এবং জীবনে প্রথম গিয়ে বললাম (বিরক্তি প্রকাশের ভঙ্গিমায়) 'দূর কী কাকের ডিম বকের ডিম এঁকেছে', এই বলে চলে এলাম। তাতে তো হবে না। দীর্ঘকাল ধরে শিল্পের যে একটা ধারাবাহিক চর্চা আছে, ইতিহাস আছে সেগুলো কিছুই জানলাম না, কিছুই বুঝলাম না হঠাৎ একদিন ঢুকে বললাম কিছু হয়নি, তা করলে তো হবে না। তোমার যদি অ-পছন্দ হয় তাহলে সেটা অন্য জিনিস। এই রকম দর্শকরা থিয়েটার না দেখলে থিয়েটার বুঝতে পারবে না। আবার এমনও হয়েছে থিয়েটারের কোন স্বাদই পায়নি কোনদিন এমন কেউ যে সিনেমা-টিনেমা দেখে, সিরিয়াল দেখে হঠাৎ করে একদিন থিয়েটার দেখে অবাক হয়ে যায় যে থিয়েটার এই? তার পর শুধুই থিয়েটার দেখতে শুরু করে এমন দর্শকও আছে। যে দর্শক অভ্যস্ততা বা অভ্যাসের দাসে পরিণত হয়নি তার মধ্যে এখনও সেই মানটা আছে। সে মুগ্ধ হতে জানে, বিস্মিত হতে জানে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমাদের থিয়েটারের লোকই হোক বা দর্শকই হোক মুগ্ধ হতে জানে না, বিস্মৃত হতে জানে না। সেই জন্য ঝুটা জিনিসকে সাচ্চা বলে মনে করে অনেক সময়। প্রচলিত অর্থে যেগুলো স্বীকৃত সে অভিনয়ই হোক, আর যাই হোক অ্যা অ্যা করতে থাকে। কোন বিচারশীল মন নেই। বিচারশীল মন মানে পড়াশোনা করে তৈরি হতে হবে তা নয়। একটা গ্রামের লোকেরও যাত্রা দেখে বিচারশীল মন তৈরি হয়। দেখতে দেখতে ভালো-মন্দের তফাৎগুলো সে বুঝতে পারে।

সে হয়তো কনশাসলি ব্যাখ্যা করতে পারবে না, সে আর্টিকেল লিখতে পারবে না, কেন খারাপ লাগল তা বলতে পারবে না। হয় গ্রহণ করবে না হয় বর্জন করবে।

অনুদাত্ত : 'পরিচালক' বিভাস চক্রবর্তী ও 'অভিনেতা' বিভাস চক্রবর্তীর মধ্যে কোনো দিন মনে অথবা মঞ্চে সংঘর্ষ হয়নি?

বিভাস : (ভেবে) অনেক সময় পরিচালক বিভাস চক্রবর্তীর উপর আর একটা বিভাস চক্রবর্তী *জাস্টিস* করতে পারেনি। অনেক সময়ই হয়েছে। আমি অভিনয় থেকে সরে এসেছি কিন্তু প্রথম দিকে কয়েকটি অত্যন্ত ভালো অভিনয় করেছিলাম। কিন্তু পরে দেখলাম তার জন্য যতটুকু মন দিতে হবে, ধ্যান দিতে হবে পুরো সংগঠন সামলে, পুরো প্রযোজনার কাজ সামলে, পরিচালনার কাজ সামলে অতটুকু বাড়তি ক্ষমতা আমার ছিল না। সেই জন্য আমি নিজের সুনামের প্রতি বিচার করার কারণে সরে এসেছি অভিনয় থেকে। যেগুলোর কথা লোকের মনে আছে তাতেই তারা বলবে *ডেটস্‌অল* কারণ দেখেছি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে কী করে আমাদের এক এক জন একটা দুরন্ত অভিনয় করে তার পর বিলীন হয়ে গেছে। চেষ্টা করেছেন কিন্তু কিছুতেই আর সেই জায়গায় যেতে পারেননি। সমসাময়িকদের নাম করব না আমি, কিন্তু প্রায় কেউই পারেননি। এখন আমি এও দেখছি ভালো অভিনেতা কিন্তু এতো অভিনয় করছে যে এখন অভিনয় বসে দেখা যায় না এমনও হয়েছে। হয়তো মাঝে মাঝে কিছু ঝলক পাওয়া যায়। সুতরাং অভিনয়টা প্রচণ্ড ব্যক্তিগত অনুশীলনের একটা শিল্প। সেই ব্যক্তিগত জায়গাটায় আমি ততো সময় দিতে পারিনি। আর আমি এটাও বিশ্বাস করতে পারিনা যে পরিচালকই প্রধান অভিনেতা হবেন। এটা প্রথম থেকেই বিশ্বাস করি না। আমি মনে করি আমার *বক্স অফিস* হবে আমার প্রযোজনা। আমার *বক্স অফিস* আমি নই। হ্যাঁ তবে যদি শম্ভু মিত্রের মতো প্রতিভা হয় তাহলে নিশ্চয়ই হতে পারে।

অনুদাত্ত : এখনকার দিনের অনেক নাটকের মধ্যে দেখতে পাই পুরো *স্টেজের* মধ্যে লাফিয়ে বা দৌড়ে অভিনয় করা হচ্ছে, আপনি কী এটাকে শারীরিক অভিনয় বলবেন?

বিভাস : (স্মিত হেসে)তোমার প্রশ্নের মধ্যেই তোমার ব্যঙ্গটা ঝরে পড়ছে। আমার উত্তরটা নিষ্প্রয়োজন।

অনুদাত্ত : আপনার মতে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার গুণগুলো কী?

বিভাস : এগুলো খুব মুশকিল বলা। *ডিফায়িন* করা খুব মুশকিল। কিছু *বেসিক* নিয়ম তো থাকবেই। (ভেবে) তারপরে বোঝা যে তাহলে আমাকে কী কী আয়ত্ত করতে হবে। কী কী অস্ত্রে সজ্জিত হতে হবে আমায় যুদ্ধক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হতে গেলে, আর সেটা বিশাল। অনেকখানি। যে মূর্খ জীবন দেখেনি, জীবন দেখতে জানে না, যদিও দেখে সব কিছুই কিন্তু জানা চাই, সে মানুষকে দেখতে জানে না। (ভেবে) এই জীবন, ইতিহাস জানার জন্যে পড়তে হবে নাকি? না তা নয়। পড়তে-টরতে হয় না। এগুলো জীবনে চলতে চলতে হয়। চলতে চলতে শেখার অভ্যাস যার নেই, বিদ্যা যার নেই, চলতে চলতে সঞ্চয় করার ক্ষমতা যার নেই সে শুধুই দেখে, খালি ড্যাব ড্যাব করে চেয়েই থাকে বুঝতে পারে না কিছু। আসলে একটা *সিস্টেম অফ ওয়ার্ক,* একটা *প্রসেস্‌ অফ ওয়ার্ক* যদি না থাকে তাহলে কিছু হবে না। কিন্তু অভিনেতাকে সবকিছু নিয়ে

অভিনয় করতে হয়। যেমন, 'শোয়াইক গেল যুদ্ধে' আর কেউ কেন করল না? কারণ আমি মোটামুটি অভিনয়টা জানি, আর আমার রাজনৈতিক বোধ আছে। 'শোয়াইক' চরিত্র করতে গেলে রাজনৈতিক বোধ দরকার। রাজনৈতিক বোধ থাকে না বেশির ভাগ লোকের দেখেছি। শ্যামল চক্রবর্তী যখন আমার 'শৃম্বন্তু কমরেডস্'-এ লেনিনের পাঠ(চরিত্র) করে, তখন তার রাজনৈতিক-বোধ না থাকলে ওই রকম পাঠ করা সম্ভব নয়। (থেমে) যদি কোন অভিনেতা লোকনাট্যের অভিনয় করে এবং তাকে বলা হয় যে তুমি কিন্তু চরিত্রের সাথে দূরত্ব রেখে তোমার অভিনয় করো, তাহলে বুঝতে পারবে না। তারপর তাকে বলতে হবে কাহিনি যেটা বলছ সেটা ঘটে গেছে অনেক আগে তুমি সেটাই করে দেখাচ্ছ। এই হয়ে যাওয়া আর করে দেখানোর যে তফাৎ সেটা ব্রেখটের *স্টাইলে* দূরত্ব তৈরি করে। মঞ্চে ঘটনাটা ঘটানো হচ্ছে না, হয়ে গেছে আগেই *(অ্যালিনেশান থিয়োরি)*। করুণ দৃশ্য দেখে অতো হাপুস নয়নে কান্নারও দরকার নেই। যুক্তি দিয়ে দেখো, বিচার করো ব্রেখট বলতেন। এই সমস্ত নানা রকম বিচার জানতে হয়। বুদ্ধি দিয়ে, নিজের অধ্যয়ন দিয়ে, নিজের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে। প্রভা দেবীর মতো শিল্পী বা আমাদের পুরনো মঞ্চের নাম করা মহিলাদের নিজস্ব জীবনের বোধ এমন, অভিজ্ঞতার বোধ এমন যে তারা যখন কথা বলতেন তখন মনে হত একেবারে জ্যান্ত মানুষ (নির্দিষ্ট নাটকের নির্দিষ্ট চরিত্র) এই সময়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। তখন কৃত্রিম মনে হতো না। তারা কী স্তানিস্লাভস্কি পড়েছেন? পড়ে অভিনয় করছেন? কোনো গ্রামার পড়েছেন অভিনয় শিক্ষার? তারা কী *ওয়ার্কশপ* করেছেন? না। কিন্তু তাদের জীবন অভিজ্ঞতায় একজন নারী কোন্ অবস্থায় কী রকম কথা বলে, কী করতে পারে, তার বেদনা কোথায়? কোথায় তার আনন্দ, কোথায় তার উচ্ছ্বাস, কিসে তার চোখে জল আসে, কিসে কান্না পায় – সব তারা জীবনদৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন। মানুষকে ভালবাসতে হবে সবচেয়ে আগে। মানুষকে যদি ভালোবাসা যায় তাহলে মানুষকে শেখাও যায়। এটা যাদের নেই তারা বড় অভিনেতা হতে পারে না।

অনুদাত্ত : এখনকার *জেনারেশানের* মধ্যে থিয়েটারের থেকে বেশি সিনেমা দেখার ঝোঁক বেশি কেন?

বিভাস : হতেই পারে। থিয়েটারে তারা তৃপ্তি পায় না। আর কোনো কালেই থিয়েটার *মাস্ এন্টারটেন্টমেন্টের* জন্য গৃহীত হয়নি। আমেরিকাতে বা ব্রিটেনে বা রাশিয়ায় *পাবলিক থিয়েটার* দেখতে লোকে যেভাবে যায়, যে আগ্রহ আপামর জনসাধারণের, আমজনতার, সে আগ্রহে আমাদের এখানে যায় না। তারা 'বুদ্ধিজীবী'ও নয়, তথাকথিত 'বিদগ্ধ' লোকও নয়। কিন্তু তারা ওইগুলো থেকে আনন্দ পায়। সেই জন্যই তারা দেখতে যায়। সুতরাং সোজা কথা থিয়েটার থেকে আনন্দ পাচ্ছে না। মন ভরানোর কোনো উপকরণ পাচ্ছে না। সেইজন্য যায় না। সাধারণ লোক আমাদের থিয়েটারে এসেছিল যা সাধারণ রঙ্গালয়ে পেত না তা আমাদের থিয়েটারে পেত বলে। আমাদের বাংলা ছবি থেকে যা পেত না, সেইগুলো পেত বলে আসত। একটা *ডিফারেন্স* ছিল। একটা *ডিশটিংশান* ছিল ভিতর থেকে। ওই *ডিশটিংশানের* জন্য আসত। আর *ডিশটিংশান* যদি মুছে যায় তাহলে সব একাকার।

অনুদাত্ত : আজকের অনেক পরিচালক, অভিনেতারা 'পেশাদারিত্বে'র ভিত্তিতে অভিনয় বা পরিচালনা করে থাকেন। আপনার কী মনে হয় তাতে কোথাও তাদের থিয়েটারের প্রতি ভালোবাসা কমে যাচ্ছে?

বিভাস : আমি পেশাদার বলে কাউকে মনে করি না। মনেই করি না। টাকা নিলেই পেশাদার হওয়া যায় না। একটা বাড়ির কাজ করেন যারা গৃহকর্মী, পরিচালক-পরিচারিকা তারা টাকা নেন। টাকা নিলেই তারা শিল্পী হন না। তারা নিজের কাজটা ভালো করে করেন। ভালো করতে হয়। আর প্রথমত আমাদের থিয়েটার টাকা দিতে পারে না। যেটা দেওয়া হয় সেটা চুরি-চামারি করে দেওয়া হয়। ওটা *সিস্টেমের* অন্তর্গত নয়। *সিস্টেমের* বাইরে থেকে ইধার কা মাল উধার করে দেওয়া হয়। এর জন্য তারা *প্রফেসানাল* হয়ে গেলেন তা তো হয় না। *প্রফেশানাল* হতে গেলে সেই *সেটআপ* তৈরি করতে হয়। কোনো কেউই *প্রফেসানাল* নয়। কোন নাট্যকার নাটক লিখে তার জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন না। কোনো অভিনেতা মঞ্চাভিনয়ে করে, জীবিকা নির্বাহ করতে পারে না। কোন নাটক-পরিচালক নাটক করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন না। (থেমে) যেটা করা হয় সেটা – 'আমাকে টাকা দিস ভাই' বা 'আমাকে অতো টাকা দিতে হবে', ওইরকম। ওটার মানেই *প্রফেসানাল* নয়। ওগুলো হচ্ছে সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বা অভাবকে কাজে লাগিয়ে অর্থ রোজগার। অর্থ রোজগার মানেই *প্রফেসানাল* নয়। পেশাদার আবার কী? কোন শিল্পী পেশাদার নেই। কোথা থেকে টাকা আসছে সেটা দেখতে হবে। টাকাটা কি ওই শিল্প থেকে উৎপন্ন হচ্ছে? না। টাকাটা আমাকে বাড়ির সংসার চালাবার থেকে বা কোন *অর্গানাইজেশান* চালাবার জন্য কেউ দিয়েছে সেখান থেকে একটা বড় অংশ তাকে দিয়ে দিচ্ছি। (থেমে) সোজা কথা *গ্রান্টসের* টাকা আসছে বলে দিতে পারছি। নইলে ভাঁড়ার শূন্য। কিছুই নেই কারণ সে তো *প্রফেসানাল* বেসিসে থিয়েটার চালায় না, চালাতে পারে না। আর আগে যেটা হতো সেটা হতো কী ওই যে বললাম সমমনস্ক, সমভাবাপন্ন কিছু লোক এক জোট হয়ে নিজেরাই টাকা দিত ধার ধোর করে। সেটা একটা পথ ছিল, সেটা অন্যও।

অনুদাত্ত : আজকের জীবন তো প্রতিযোগিতার, তাহলে কী আপনার মনে হয় এখনকার থিয়েটারও কোন অদৃশ্যমান প্রতিযোগিতায় নেমেছে?

বিভাস : (থেমে) চিরকালই জীবন প্রতিযোগিতার। আজকের জীবন হটাৎ করে প্রতিযোগিতার হয়ে উঠল কী করে? প্রতিযোগিতা আছে, সবসময়ই আছে। আমাদের সময়ও স্কুলে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় হতো, এখনও হয়। বরং এখন গ্রেডেশান হয়। প্রতিযোগিতা এখনও আছে নানা রূপে। কিন্তু প্রতিযোগিতার ভালো দিকও আছে। খারাপ দিকও আছে। সুস্থ প্রতিযোগিতা আছে, অসুস্থ প্রতিযোগিতা আছে। সুতরাং প্রতিযোগিতা জিনিসটা *অ্যাস ইট ইস* খারাপ না। ওটা ওই রকমের *হাউ ইউ ইউস ইট, হাউ ইউ লুক অ্যাট ইট,* সেখানে প্রতিযোগিতা তো থাকবেই। আমরা শুধুই প্রতিযোগিতা শব্দটাকে নিয়েছি। আমাদের বাজারে কিন্তু কোন প্রতিযোগিতা নেই। 'দঙ্গল'(আমির খান) রিলিজ হবে আর শাহরুখ খানেরটা (রেইজ) রিলিজ হবে কিংবা 'সুলতান'(সালমান খান) রিলিজ হবে এই প্রতিযোগিতা আছে। মার্কেটের প্রতিযোগিতা। মার্কেট পাবার প্রতিযোগিতা। কিন্তু মার্কেট আমাদের *ভ্যালু* নির্ধারণ করে না। আমাদের কোন

বাজার নেই। প্রসেনজিৎ কিংবা ঋতুপর্ণার রেটিং ঠিক করে বাজার – কে কত টাকা পাবে, কার নামটা আগে থাকবে এই সব। কিন্তু আমাদের সেইরকম কিছু নেই, যার জন্য আমাদের নিজেদের *রেটিং* নিজেদের ঠিক করতে হয়। আর সেই *রেটিং* এর জন্য আমাদের ঘুরে ঘুরে নানা জায়গায় ধর্ণা দিয়ে দিয়ে *রেটিংটার সাপোর্টে* কিছু কিছু কাজ করতে হয়। *অ্যাওয়ার্ডটা* যদি পাই কোন রকমে। যদি দিল্লিতে 'ভারত রঙ্গাশ্রমে' একটু চান্স পাই, যদি অমুক *কল শো* একটু বেশি পাই তাহলে বাজার আপসে দেবে। প্রসেনজিৎ-কে এইসব করতে হয়না কিছু। (থেমে) ও *কমার্শিয়াল টার্মসের* কাজ করে ও বাজার নির্ধারণ করে। জনগণের মধ্যে যতদিন ও প্রিয় থাকবে ততদিন প্রসেনজিতের *রেটিং হাই*। আমাদের ওসব কোন বালাই নেই। আমরা নিজেরাই নিজেদের মনে করি প্রতিযোগিতা করছি। আর প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে কী হচ্ছে? শুধুই *পোস্টারের সাইজ* বাড়ছে। বিজ্ঞাপনের *সাইজ* বাড়ছে। যে ব্যাটা অভিনয় শেখেনি তাকে টাকা দিতে হচ্ছে, কারণ সে টাকা চাইছে। দল বিপদে পরলে ব্যাঙেও লাথি মারে যেমনি তেমনি ব্যাঙেও টাকা চাইছে। এটা কোন প্রতিযোগিতা নয়, সমস্ত কিছু কদর্থক করা হচ্ছে। প্রতিযোগিতা, পেশাদারিত্ব কিছুই নেই আমাদের। আমাদের কিছুই নেই। আমরা নিজেরাই বলে যাচ্ছি আমরা এই। আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাত ছিলাম। ভিন্ন গোত্র, ভিন্ন চরিত্র, ভিন্ন ভাবনা চিন্তা সেগুলো থেকে সরে এসেছি যত, তত ভাবছি খুব আমরা *মার্কেটের* প্রতিযোগী হচ্ছি। *'পোফেশানাল'* হচ্ছি। বুঝেছ? সবই মিথ। কিছুই না *সেন্ট্রাল গভর্মেন্ট গ্রান্টস্* বন্ধ করে দিক কতো ঝাঁপ বন্ধ হয় দেখবে। প্রতিযোগিতা হয় না। ওই ভাবে প্রতিযোগিতা হয় নাকি কখনো। ক্ষেত্রই নেই প্রতিযোগিতার।

অনুদাত্ত : আজকের থিয়েটার বা নাটক কী নতুন কোনো দর্শন বা তত্ত্বকে তুলে ধরতে পারছে?

বিভাস : (খুব দ্রুত ভঙ্গিতে) না আলাদাভাবে কিছুই করতে পারে না।

অনুদাত্ত : দর্শক কী শুধুই বিনোদনের জন্য থিয়েটার দেখতে আসে নাকি কোনো উদ্দেশ্য থাকে তার থিয়েটার দেখতে আসার মধ্যে?

বিভাস : উদ্দেশ্য-ফুদ্দেশ্য থাকে না। আমি বিনোদন বলব না, উপভোগ বলব। উপভোগ মানে কী? উপভোগ করা মানে কিছু দেখে আমার মাথায়, মনে এমন কিছু ভাবনা, চিন্তা, এমন কিছু *রিলেশান* তৈরি করা অথবা ভাবনার মিল খুঁজে পাওয়া যা আমার মধ্যে একটা *রিলেশান* তৈরি করবে। যেমন ধরো (ভেবে) বামফ্রন্টকে ৬৭ সালে ফেলে দেওয়া হলো বা ৭১ সালে বামেরা জিতে এলেও তাদের সরকার গড়তে দেওয়া হলো না বা ৭২ সালে যখন প্রচণ্ড জালিয়াতির মধ্যে দিয়ে নির্বাচন হলো, তার পর যখন উৎপল দত্ত 'ব্যারিকেড'[২৬] করেন তখন আমি ব্যাপারটা উপভোগ করি। মানে আমার না বলা কথা বলা হচ্ছে এই নাটকের মধ্যে দিয়ে। এই মুহূর্তের কথা বলা হচ্ছে। আমি হৈ হৈ করে সেটাতে *রিঅ্যাক্ট* করি। তুমি প্রশ্নটা আর একবার করো ...

অনুদাত্ত : এখনকার থিয়েটারে লোক কেন আসছে...

বিভাস : হ্যাঁ। উপভোগ, বিনোদন নয়। আবার বিনোদন এক অর্থে হতেই পারে। উপভোগ করার মধ্যে দিয়ে আমার নানা রকম অভিজ্ঞতা হতে পারে, অভিজ্ঞতার দুয়ার খুলে যেতে পারে। অথবা তার উল্টোটাও হতে পারে। আমার অভিজ্ঞতার সাথে অদ্ভুত মিল খুঁজে পেতে পারি এবং সেটাই হচ্ছে যথার্থ উপভোগ করা। আমি একটা অত্যন্ত করুণ নাটক, বিয়োগান্তক নাটক দেখে উপভোগ করতে পারি, আমি একটা মজার নাটক দেখে উপভোগ করতে পারি, আমি একটা স্বাভাবিক, সাধারণ নাটক দেখে উপভোগ করতে পারি, আমি একটা পৌরাণিক নাটক দেখে উপভোগ করতে পারি – নানা রকম হতে পারে। উপভোগটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। উপভোগের *এলিমেন্টসগুলো* কিন্তু আলাদা। শুধুই মজা পেলাম আর হ্যা হ্যা করে চলে গেলাম তা নয়। উপভোগ মানে ভিতরে কোথাও অভিজ্ঞতা বলো, নিজের যে বোধ বলো, নিজের যে সূক্ষ্ম তন্ত্রীগুলো বলো তাতে কোথাও বেজে ওঠে অনেক কিছু। সেটা উপভোগের জন্যই মানুষ আসে।

অনুদাত্ত : যাত্রা জগত আপনাকে বেশি দিন পেলো না কেন?

বিভাস : তিন বছর করার পর বুঝলাম যাত্রা জগত আমার নয়। যে কারণে সিনেমা করিনি সরে এসেছি সে সব কারণে নয় *এক্সজেক্টলি,* কিন্তু আমি বুঝলাম ওটা আমার জন্য নয়, আমি পারব না। পারব না মানে এই নয় যে... আমি তিনবছর ছিলাম তার মধ্যে দুটো হিট নাটক করেছি[২৭]। মালিকে প্রচুর টাকা ফেরত দিয়েছি। সেই কারণে নয়। কিন্তু বুঝলাম, যে প্রসেসের মধ্যে দিয়ে কাজ করতে হয়, যেতে হয় সেটা সম্মানজনক নয়। ওরা অসম্মান করেছে তাও বলছি না। সম্মানজনক নয় মানে একটা বাজে *স্ক্রিপ্টকে...* নিজে যেহেতু লিখতে পারতাম না যাত্রা-নাটক উৎপলদা যেটা পারতেন তার জন্যই বাজেকে ভালো বলতে হয়েছে। উৎপলদার নেওয়া একটা সাক্ষাৎকার আছে আমার, সেটা বললেই বুঝতে পারবে। ('প্রতিভাস' থেকে প্রকাশিত বিভাসবাবু সাক্ষাৎ নিয়েছেন এমন একটি সংকলন গ্রন্থ, নাম 'চারজন পাঁচকথা'। সেখান থেকে বিভাসবাবুর নেওয়া উৎপল দত্তের একটি সাক্ষাৎকার পাঠ করেন-

বিভাসবাবু : উৎপলদা এবারে থিয়েটার থেকে একেবারে যাত্রায় চলে যাচ্ছি। যাত্রায় বোধ হয় আপনি এসেছেন ৬০এর দশকে। ৬০এর দশকে আপনার বিরাট ভূমিকা যাত্রাতে দেখে সত্যি অবাক হতে হয়, তখনই আমরা যাত্রা দেখতে উৎসাহ পেলাম। যে যাত্রা দেখা যায়, যাত্রা থেকে শেখা যায়, নানা রকম প্রযোজনার পরিকল্পনা শেখা যায় এবং উপভোগ করা যায়। যাত্রার ভালো সংলাপ, ভালো বক্তব্য, ভালো বিষয়বস্তু এগুলো আমরা তখন পেয়েছি। একটা বিরাট জোয়ার এসেছিল তখন যাত্রায়। বোধ হয় ২১টা পালা[২৮] আপনি যাত্রায় করেছেন। পরপর অনেকগুলো বড় বড় অভিনেতার সাথে আপনি কাজ করেছেন। যাত্রা জগতে যারা প্রধান অভিনেতা যেমন পঞ্চু সেন, বিজন মুখোপাধ্যায়দের সঙ্গে কাজ করেছেন। আবার আপনার পরিচালনায় কাজ করতে করতে অনেক অভিনেতা তৈরি হলো আমাদের চোখের সামনে যারা আমাদের সমসাময়িক

আমরা জানি শেখর গাঙ্গুলি, অনাদি চক্রবর্তী, বর্ণালী ব্যানার্জী, নিরঞ্জন ঘোষ, ইন্দ্র লাহিড়ী, ছন্দা চ্যাটার্জী এই রকম অনেক যাত্রা-শিল্পী তৈরি হয়েছে যাদের অভিনয়ে এখনও একটা স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়। আপনিই একমাত্র আমাদের থিয়েটারের ব্যক্তিত্ব যিনি যাত্রাতে গিয়ে যাত্রার চেহারার আমূল পরিবর্তন করতে পেরেছেন। আপনি নিজে দাপটের সঙ্গে কাজ করতে পেরেছেন। নিজের বিশ্বাস মতো, নিজের ভাবনা মতো, নিজের চিন্তা মতো কাজ করতে পেরেছেন। আমরাও অনেকে যাত্রায় যোগ দিয়েছিলাম। আমি নিজে ব্যক্তিগত ভাবে তিন বছর যাত্রায় সাথে পরিচালক হিসেবে যুক্ত ছিলাম। কিন্তু আমাদের কাজ করতে হয়েছে যাত্রার লোকেদের *টার্মসে*। আমরা আমাদের *টার্মস্* কাজ করতে পারিনি সেখানে। যার জন্য সেই হিসেবে আমরা ব্যর্থ আমরা যাত্রায় গিয়ে। কিন্তু আপনি একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছিলেন, একটা নতুন ধারার প্রবর্তন করেছিলেন। সেই জায়গা থেকে যাত্রা কেন আবার সরে এলো এবং আপনিও কেন সরে এলেন এর কারণটা কী?

উৎপলবাবু : আপনারা যেমন ব্যর্থ আমিও তেমন ব্যর্থ। হ্যাঁ যাত্রায় একটা চেষ্টা করেছিলাম যে রাজনৈতিক যাত্রা বলে কিছু সৃষ্টি করা যায় কিনা। যাত্রা আন্দোলন হয় কিনা। গণনাট্য হয়েছে তো গণযাত্রা হবে না কেন? অবশ্য আমার আগেও অনেকে কাজ করেছিলেন যারা মানে ভৈরব গাঙ্গুলি কাজ করছিলেন, শম্ভু বাগ কাজ করছিলেন। একটা বিশেষ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত থেকে কাজ করেছিলেন, চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আমি যাবার পর তারা আমাকে বললেন, আমি তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম যে রাজনৈতিক পালা হবে না কেন? পয়সা তো দেবে। পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পালা হবে না তো আর কোথায় হবে এবং পয়সা যতক্ষণ দেবে মালিক ততক্ষণ খুব খুশি থাকবে। মালিক তো শুধু পয়সাই চায়। পালাতে কী দেখানো হচ্ছে সে তো আর সে দেখতে যাচ্ছে না। তো ওনারা বললেন যে ওটা হবে না, শেষ পর্যন্ত মালিক ধরে ফেলবে, শেষ পর্যন্ত বুঝবে এখন পয়সা দিচ্ছে বটে কিন্তু এ পালা শেষ পর্যন্ত আমাদেরই গলা কাটবে। তো আমি বললাম যে মালিকের এতো বুদ্ধি হতে পারে না। মালিকদের আমি দেখেছি। কোনো কোনো মালিককে তো দেখেছি তারা অত্যন্ত নির্বোধ, কিছুই বুঝতে পারবে না। আমি তো খুব সাহসে ভর করে লেগে পরলাম। সত্যি দেখি পালার পর পালা নেমে যাচ্ছে সে বুঝতেই পারছে না কী ঘটছে। সে বুঝতেই পারছে না পালাটা হচ্ছে ওর শ্রেণির বিরুদ্ধে। সে প্রচুর পয়সা দিচ্ছে। অবশ্য একটা জিনিস করতে হবে প্রথমেই মালিককে হুকুম জারি করতে হবে যে *রিহার্সালে* আপনি থাকতে পারবেন না। আপনি *রিহার্সালের* বাইরে একটা টুল নিয়ে বসে থাকুন (দর্শকদের হাসি)। মালিককে হুকুমের ডগায়, লাঠির ডগায় রাখতে হবে। (মঞ্চে উপবিষ্ট প্রশান্তবাবুকে দেখিয়ে) এই যে প্রশান্তবাবু আছেন, বহুদিন থেকে ওখানে সঙ্গীত সৃষ্টি করছেন, অনেক যাত্রা তিনি দেখেছেন। তিনি দেখেছেন যে কীভাবে যাত্রার মালিককে লাঠির ডগায়

রাখতে হয়। একটু ছেড়েছেন কী পেয়ে বসবে। এমনকি আমার অবর্তমানে যাত্রার মালিক অভিনেতাদের গিয়ে ভয় দেখায়, এই সব *ডায়ালগ* বলবে না। তো ওকে বাইরে বার করে দিয়ে *রিহার্সাল* দিয়ে পালার পর পালা নেমে যাচ্ছে। সে কিছুই বলে না, সে শুধুই পয়সা দিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত অভিনেতাদের মাইনে টাইনে সব ঠিক মতো দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অবশেষে সে বুঝল, ঠিক বুঝল। অন্য মালিকরা তাকে গিয়ে বোঝাল এসব করছ কী! এতো লাল ঝাণ্ডা উড়ছে (দর্শকদের হাসি)। মালিক বুঝল এবং বোঝার পরে সে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করল যে আর সেখানে থাকা সম্ভব নয়। তাই সেদিক থেকে আমি ব্যর্থ। যেমন বিভাসবাবু বললেন উনি ব্যর্থ, তেমনি আমিও ব্যর্থ। তবে আমি লড়াইটা একটু বেশি করতে পেরেছি দাপটে কাজ করছিলাম বলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ কেননা এটা ওই সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। এই সমাজ ব্যবস্থা না পালটানো পর্যন্ত যাত্রার মালিকদের থাবা ভাঙা যাবে না।)

এই জন্যই থাকলাম না।

অনুদাত্ত : আপনার নাটকের দর্শন কী?

বিভাস : আমার নাটকের দর্শন তো এক একটা নাটকে এক এক রকমভাবে বলা হয়েছে। আমার নিজের জীবনের দর্শন হচ্ছে (থেমে) থিয়েটারের মাধ্যমে মানুষের কথা বলা। মানুষ মানে সাধারণ মানুষ, এখানে মানুষ মানে উচ্চবর্গের মানুষ বা নিম্নবর্গের মানুষকে বলছি না। যারা মানুষের ভালো চায়, সমাজের ভালো চায় সেই সব সৎ মানুষের হয়ে কথা বলা। সে একজন বড় বিজ্ঞানীও হতে পারে, একজন ছোট মাপের সাধারণ মানুষও হতে পারে। সে একজন শিল্পীর কথাও হতে পারে কিংবা লেনিনের মতো একজন লিডারের কথাও হতে পারে।

অনুদাত্ত : আমার শেষ প্রশ্ন, আপনার কাছে আপনার অভিনীত শ্রেষ্ঠ নাটক কোনটি?

বিভাস : জানি না। (থেমে) আমার দুই ধরনের নাটক আছে। এই ভাগগুলো করতে হয়, *ইন্টারেস্টিং* (স্মিত হেসে) ধরো আমার 'রাজরক্ত' ৭১ সালে, 'চাকভাঙা মধু' ৭২ এর আগে একটা করেছিলাম 'ছায়ায় আলোয়'[২৯]। এই নাটকটার একটা চরিত্র[৩০] *ডেভেলপ* করে নাটকটার মধ্যে দিয়ে, তার একটা *জার্নি* আছে। সে শুরু করে একটা জায়গা থেকে, দিয়ে আস্তে আস্তে পরিণতি পায়। তার একটা *ব্যাকগ্রাউন্ড* ছিল। এই ধরনের নাটক ভালো লাগে, *চ্যালেঞ্জ* আছে। সে নিজেকে সময়ের সাথে সাথে *রিঅ্যাক্ট* করতে করতে যায় এবং পালটাতে পালটাতে যায় সংঘাতের মধ্যে দিয়ে। আবার 'রাজরক্ত' কতোগুলো *স্কেচের* সমাহার। একটা টাইপ ধরে নিয়ে একটা লোক কখনো অভিভাবক কিংবা (থেমে) একজন স্যাঙাতের ভূমিকায় কিংবা সে রক্ষীর ভূমিকায় কিংবা বাবার ভূমিকায় কিংবা বড় একজন ডাক্তারের ভূমিকায় অভিনয় করে, এই ভাবে নানা চরিত্রে অভিনয় করে। এইগুলো স্কিলের উপর নির্ভর করে। আমি কতটা স্কিলের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলছি। স্বল্প পরিসরের মধ্যে এই ধরনের কতগুলো চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটা স্কেচের মতো তৈরি হয়। এটা যখন করি তখন এটা একটা বড় *পারফরমেন্স*। এইটা আর এক ধরনের। আবার 'শোয়াইক গেল যুদ্ধে' যখন করি তখন একটা ছোট মাপের

মানুষ একটা সরাইখানায় *রেগুলার* যাতায়াত করে এবং সে কী করে নানা কৌশলে হিটলারের জমানাতেও *সারভাইভ* করে সেই কথাই বলা হয়েছে। সে যেগুলোর বিরোধী সেগুলো বিশ্বাস করে না। কিন্তু অবিশ্বাসের যা তার সঙ্গেই সে আপোষ করে পাশ কাটিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। চতুর কৌশলী সেই *ক্যারেকটার*ও বেশ *ইন্টারেস্টিং*। সেটা চ্যাপলিনের অনেক চরিত্রের সাথে মেলে। চ্যাপলিন এবং *ট্রাম্প* বা ভবঘুরের সাথে অদ্ভুত মিল আছে। *লিটিল ম্যান* বলে একটা কনসেপ্ট আছে বিদেশে, সেই *লিটিল ম্যান* করতে আমার খুব ভালো লাগে। আমি চাই *আইডিয়াল লিটিল ম্যান*, নিজে ব্যক্তিগত জীবনে আমি একজন *লিটিল ম্যান*, সেই জন্য ওই *ক্যারেকটারগুলো* আমার কাছের মনে হয়। চ্যাপলিনকে বেশ কাছের মনে হয়। কোনটা *বেস্ট* সেটা বলতে পারব না।

অনুদাত্ত : আপনার এই কথার সূত্রধরে আমার একটা জিনিস মনে হচ্ছে যে এই সমস্ত নাটকগুলো তো আমাদের মতো তরুণ প্রজন্ম দেখতে পেলো না। তাহলে কী কোথাও এই নাটকগুলোর একটা *ডকুমেন্টেশান* হওয়া দরকার?

বিভাস : (গম্ভীর ভাবে) হুম। এ বিষয়ে শম্ভুদার একটা কথা বলি। শম্ভুদাকে একজন বলেছিল আপনাদের নাটক পরবর্তী প্রজন্মের তো... (শম্ভু মিত্রের বচনের অভিনয় করে) 'ও আচ্ছা। আমরা প্রথম থিয়েটারটাকে অন্য রকম থিয়েটার করার চেষ্টা করেছি *প্রফেসানাল* থিয়েটার থেকে। তার মধ্যে নানা ঝড়-ঝাপটা পেরিয়ে নিজেরা নিজেদের সংগঠন তৈরি করেছি। একটা *গ্রুপ* তৈরি করেছি। সেখানে নিয়মিত চর্চা করছি। অর্থও কোনদিন আমরা পাইনি, ছিলও না। সেখান থেকে কতগুলো ভালো প্রযোজনা হয়েছে, সেগুলো চালিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছি। এই সব করেছি। তার পর দায়িত্বটা আমাদের উপরেই বর্তায় যে আমরা কতো ভালো কাজ করেছি সেটা আমাদেরই ধরে রাখতে হবে। সমাজের আর কোন দায়িত্ব নেই। ওটা আমাদেরই দায়িত্ব যে দেখ আমরা কতো ভালো কাজ করেছি'। এটা হচ্ছে কথা। কেন করব? শম্ভুদা কিছু ধরে রাখেননি। কেন ধরে রাখবেন! সমাজের দায়িত্ব ছিল এগুলো করা।

অনুদাত্ত : নিশ্চয়।

অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

তথ্যপঞ্জী :

১) বিনোদবিহারী চক্রবর্তী

২) জনশক্তি

৩) অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত।

৪) ১৯৬৫ সালে অভিনীত। বিভাস চক্রবর্তীর পরিচালনা।

৫) 'খড়ম ও ভ্যানিটিব্যাগ' (১৯৫৬)

৬) 'কথা ও কায়া'

৭) নবস্বয়ম্বর (১৯৬৩)

৮) ১৯৬৩

৯) চিন্ময় রায়

১০) ১৯৪৯-৫০

১১) উদ্দেশ্যে উৎসর্গ

১২) নিরূপমা দেবীর কাহিনি অবলম্বনে, দেবনারায়ণ গুপ্ত কৃত নাট্যরূপ, প্রথম অভিনয় ১৯৫৩ সালে, স্টার থিয়েটার

১৩) কলকাতা হাইকোর্টে করণিক পদে যোগদান।

১৪) ১৯৬১র ১২ নভেম্বর, রঙ্গমঞ্চ

১৫) ১৯৬৬র ১১ জুলাই, নামকরণ বিভাস চক্রবর্তী, প্রতীক চিহ্নের রূপদান সুবোধ দাশগুপ্ত

১৬) প্রতিষ্ঠা পয়লা জুলাই ১৯৭২, প্রধান প্রতিষ্ঠাতা নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত

১৭) প্রতিষ্ঠা ৯ অক্টোবর ১৯৭৭, প্রধান প্রতিষ্ঠাতা দেবাশিস মজুমদার, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দন সেনগুপ্ত

১৮) রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

১৯) থিয়েটার ও সামাজিক উন্নয়নের সাথে যুক্ত একটি সংস্থা।

২০) মোহিত চট্টোপাধ্যায় রচিতও, ‘রঙ্গনা মঞ্চে’, 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ' নাট্যগোষ্ঠীর প্রযোজনা, ২৫ জুন ১৯৭১

২১) মনোজ মিত্র রচিত, ‘রঙ্গনা মঞ্চে’, 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ' নাট্যগোষ্ঠীর প্রযোজনা, ১৬ মে ১৯৭২

২২) নাট্যরূপান্তর বিভাস চক্রবর্তী, ‘সূত্রধর’ ও ‘উজির’ চরিত্রে অভিনয়, ‘শিশির মঞ্চে’, 'অন্য থিয়েটার'-এর প্রযোজনা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮

২৩) নাট্যরূপান্তর অশোক মুখোপাধ্যায়, ‘শোয়াইক’-এর চরিত্রে অভিনয়, ‘অ্যাকাডেমি মঞ্চে’, 'অন্য থিয়েটার'-এর প্রযোজনা, ২৮ মে ১৯৯১

২৪) গিরিশচন্দ্র ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, ‘রবীন্দ্র সদন’, ৮ এপ্রিল ১৯৯০

২৫) প্রথম অভিনয় ১০ মে ১৯৫৪

২৬) প্রথম অভিনয় ২৫ ডিসেম্বর ১৯৭২, পিএলটি, মোট লিখিত পত্র সংখ্যা ২০

২৭) ‘ফুলনদেবী’ ১৯৮২, ‘সাধু ও শয়তান’ ১৯৮৩, ‘মেহেরবান’ ১৯৮৪, ‘দ্রৌপদী’ ১৯৮৪

২৮) ৩১ টি এখন অব্দি যা জানা যায়

২৯) অশোক মুখোপাধ্যায়ের রূপান্তর, ‘মুক্তাঙ্গন’, 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ'-এর প্রযোজনা, ৬ অক্টোবর ১৯৬৭

৩০) ‘হারান’ চরিত্র।

তথ্যঋণ :

বিভাস ব্যক্তিগত ও শিল্পগত, রায় বিশ্ব (সম্পাদনা), পুস্তকবিপণি, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৯, আই.এস.বি.এন 81-85471-63-0

কবি মৃদুল দাশগুপ্তের মুখোমুখি

শুভায়ন সাঁতরা

প্রশ্ন : শৈশবে আপনার কী লক্ষ্য ছিল যে আপনি কবি হবেন ?

উত্তর : আসলে যাকে বলে শৈশব, তখন তো লক্ষ্য বলে কিছু থাকে না। তবে যখন আমার বালকবেলা, তখন আমার বাড়িতে যাঁরা বড়োরা ছিলেন, যেমন আমার ঠাকুরমা; তাঁরা সুর করে বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল পাঠ করতেন। সেইখান থেকেই আমার মুখে মুখে ছড়া কাটা শুরু হয়। এরপর ক্লাস ৬-৭ থেকে কবিতা পড়তে শুরু করি। আমাদের বাড়িতে জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা ছিলো; রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি তো ছিলোই। এগুলো আমি উচ্চৈঃস্বরে পড়তাম। এইভাবেই একদিন আমার গলা খাদে নেমে এলো। আমি মনে মনে কবিতা গড়তে ও পড়তে শুরু করলাম। সেই সময় নানা পত্র-পত্রিকাও আমি পড়তাম ও নিজে নিজে কবিতা লেখার চেষ্টা করতাম। এই করতে করতে আমার কবিতা লেখা শুরু।

প্রশ্ন : প্রথমে কার দ্বারা অনুপ্রাণিত হন ?

উত্তর : আমি কারো দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইনি বা কারো মতো লিখতেও চাইনি। আমি নিজের মনের খেয়ালে লিখে গেছি।

প্রশ্ন : আপনার প্রথম মুদ্রিত রচনা কোথায় প্রকাশিত ?

উত্তর : প্রথম হয় স্কুল ম্যাগাজিনে।

প্রশ্ন : কোন কবিতা ?

উত্তর : তা আমার মনে নেই, তবে মনে হয় কবিতাটির নাম 'মোমবাতি' ছিলো।

প্রশ্ন : সময় সচেতন কবি আপনি – কার দ্বারা উৎসাহিত ?

উত্তর : আমার কবিতা শুরুর কাল মোটামুটি ৬৭–৬৮ সাল। এই সময় বাংলার বুকে নানান রাজনৈতিক ঢেউ ওঠে। নানা রকম আশা–আকাঙ্ক্ষা, ঘাত–প্রতিঘাত, ক্ষোভের রাজনৈতিক ঢেউ ওঠে। তা থেকেই লেখার শুরু করি।

প্রশ্ন : হুগলী জেলার ভূমিপুত্র আপনি, এই জেলার কোন ঘটনা আপনার মনে ও লেখায় প্রভাব ফেলেছে?

উত্তর : এই হুগলী জেলা আমার মায়ের মতো। আমার বাবা, মা দেশভাগের সময় পূর্ববঙ্গ থেকে এখানে আসেন। আমাদের মতো আরো অনেকের পরিবার এই শহরে আসে এবং এই ভূমি

বুক পেতে তাদের আশ্রয় দান করে। এখানেই আমার জন্ম। তাই আমার শৈশব থেকে শুরু করে আমার কৈশোর ও আজ পর্যন্তের বেশিরভাগ সময়ই এখানে কাটে। আমার জীবনের যত ঘাত–প্রতিঘাত, যত ঢেউ সবই এখানে, তাই আলাদা করে কিছু বলার নেই।

প্রশ্ন : কলেজ জীবনেই আপনার কবিতা লেখা শুরু। কোন প্রেক্ষিতে কবিতা লেখা শুরু করেন ?

উত্তর : আমি সবসময়ই ছোটো পত্রিকায় লিখেছি। খুব বড়ো পত্রিকা বা ঝলমলে জায়গায় আমি কোনদিনই লিখিনি। এখন কলেজে পড়ার সময়, ওই ৭২–৭৩ সাল নাগাদ কবিতা সিংহ 'সপ্তাদশ অশ্বারোহী' নামক একটি কবিতা সংকলন প্রকাশ করেন। সেখানে আমার কবিতাও ছিলো। সেখান থেকেই শুরু।

প্রশ্ন : পুরস্কার প্রাপ্তির পর আপনার অনুভূতি যদি ব্যক্ত করেন।

উত্তর : পুরস্কার পেতে তো ভালোই লাগে। পুরস্কার পেয়ে আমি খুশীই হয়েছি।

প্রশ্ন : আপনার সমগ্র কাব্য সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে আপনি পাঠক সমাজকে কোন্ বিষয়ে সচেতন বা ভাবিয়ে তুলতে চান ?

উত্তর : আমি কোনো বিষয়ে পাঠক সমাজকে ভাবিয়ে তুলতে চাই না। কোনো বিষয় সম্বন্ধে কাউকে সচেতন করতেও চাই না। আমার সেরকম কোনো উদ্দেশ্য নেই। আমি কবিতা লিখেছি এই উদ্দেশ্যে যে, আমি যাদের চিনি না, জানি না বা আমার মৃত্যুর পর যে সমস্ত পাঠকের সাথে আমার দেখা হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই, তাদের সাথে আমি যেন আমার কবিতার মধ্যে দিয়ে কোনো গাছতলায় বা গঙ্গার তীরে বসে একটু গল্প করতে পারি, কিছু কবিতা শোনাতে পারি।

প্রশ্ন : কবিতা ছাড়া সাহিত্যের অন্যান্য সংরূপ যেমন কথাসিহিত্য বা নাটক লেখার ইচ্ছা কী আপনার আছে ?

উত্তর : হ্যাঁ। আমি ৬–৭টি গল্প লিখেছি। সেগুলো একটি ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো নিয়ে একটি গল্পগ্রন্থ তৈরি হবে আগামী দিনে।

মধ্যযুগের সাহিত্য পাঠক ও সাহিত্যিক
রামকুমার মুখোপাধ্যায় : পুনর্নির্মাণে মধ্যযুগ
বেচুরাম মণ্ডল

পাঠক : বাংলা কথাসাহিত্যে পুনর্নির্মাণ রচনার ধারায় আপনি এক বিশিষ্ট শিল্পী। 'পুনর্নির্মাণ' বলতে আপনি কী মনে করেন?

সাহিত্যিক : আসলে শুধুই মঙ্গলকাব্যের পুনর্নির্মাণ নয়। ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের দেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত যখন হল এবং যখন কোনো জাতি কোনো জাতির উপর এসে পড়ে তখন সে তার জিনিসটাকে তাড়াতাড়ি শিখিয়ে দিতে চায়। সে বোঝাতে চায় যে, শাসিতের যা ছিল সবকিছু ভুল। প্রথমে সে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে। তারপর তাদের মানসিক পরিবর্তন করতে চায়। তাদেরকে বিশ্বাস করায় যে তারা উদ্ধার করতে এসেছে। এ থেকে আমরাও ধীরে ধীরে বিশ্বাস করি আমাদের যা কিছু ছিল তা সবই খারাপ এবং বাতিল করতে হবে। ব্রিটিশ শাসন আমাদের সেটাই ধীরে ধীরে শিখিয়েছে। এর ফলে আমরা আমাদের শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি। আমার মঙ্গলকাব্য পাঠের মধ্য দিয়ে আমি আসলে বাঙালির ইতিহাস সন্ধান করতে ছেয়েছি। আমি বিশ্বাস করি বাঙালি জাতির, বাংলা ভাষার ইতিহাসে হাজার বছরের ঐতিহ্য আছে। দু'শ বছরের সাহেবি ইতিহাস আমাদের পূর্ণ পরিচয় নয়। বলতে পারো আমার বাঙালি জাতির ইতিহাস সন্ধানটাই মূল লক্ষ্য ছিল। মধ্যযুগের যেসব দৃশ্যময়, ধ্বনিময়, বর্ণময় শব্দ ছিল তা কোথায় গেল? আমার প্রশ্ন হচ্ছে আজ কোলকাতার সঙ্গে বাংলার গ্রামের এত দূরত্ব কেন? একটা কথা চালু আছে – পশ্চিমবাংলার গঙ্গার এদিক-ওদিক আসলে দুটো আলাদা দেশ, আলাদা সভ্যতা। আমি এই অখণ্ড বাঙালির সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ধরতে চেয়েছি, খুঁজতে চেয়েছি। চৈতন্যের ইতিহাস ভুলব কি করে, কী করে ভুলে যাবো যে মধ্যযুগে আমাদের একটা স্বর্ণযুগ ছিল! চৈতন্যের প্রতিবাদের ভাষা, চৈতন্যের প্রেমের ভাষা ঐ সময়ে, একই সঙ্গে মঙ্গলকাব্যে নারীচেতনার উন্মেষ ঘটেছে। সেখানে আমাদের লৌকিক দেবীদের উত্থান পাচ্ছি। অন্য দেবতাদেরও লোকজীবনের মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শিবায়ন পড়লেই তা আমরা বুঝতে পারি, বুঝতে পারি শিবকে কোন্ জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছে। মনসা ও চণ্ডী বিপুল ঝগড়া করতে পারে সদাগরদের সঙ্গে। আমি বাঙালির ইতিহাস খুঁজছিলাম এবং একইসঙ্গে বাংলার সেই সভ্যতাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দও তো শাশ্বত ভারতবর্ষের এভাবেই আমাদের জুড়েছিলেন।

পাঠক : এই ভিন্ন ঘরানার লেখালিখির ক্ষেত্রে আপনার প্রেরণা কী বা মনের কোণে জন্ম নেওয়া কোন্ অনুসন্ধান এক্ষেত্রে কাজ করেছে?

সাহিত্যিক : আমার ছোটবেলা কেটেছে বাঁকুড়া জেলার গ্রামে। সেখানে আমি ছোটবেলায় তুসু গান গাইতাম, আমরা তুসুখোলা রাখতাম। আমাদের গ্রামে দু-দুটি বৈষ্ণব পাড়া ছিল, এখনো আছে, যা আমার গল্পে স্থান পেয়েছে। নানা অনুষ্ঠানে কীর্তন হতো। কীর্তন ছাড়া বিভিন্ন উৎসবে আনন্দটাকে ভাগ করে নেওয়া হতো। মহাভারত পাঠ শুনেছি এবং ফেলু চক্রবর্তীর অসাধারণ কণ্ঠে রামায়ণ গানও। তারপর কথকতা শুনেছি, ব্রতকথা শুনেছি। এগুলি শুনতে শুনতে আমার মনে হয়েছে যে এগুলিকে বাদ দিয়ে আমার উপন্যাস লেখা হবে কী করে! কাজেই আমার প্রেরণা আমার চারপাশের গ্রাম, আমার চারপাশের মানুষ। আমি যখন লিখতে এলাম তখন আমার মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিল, কেন আমি কথকতার রীতি ব্যবহার করতে পারব না? ১৯৭৩ সালে আমি যখন বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের হস্টেলের বিবেক ভবনে থাকতাম তখন বেলুড় মঠ আরও ফাঁকা ছিল। তখন মাঠে ধান চাষ হচ্ছে, গঙ্গার চমৎকার হাওয়া আমার গায়ে এসে লাগছে। আর আমার খাট ছিল জানলার দিকে। খাটে শুয়ে শুয়ে বেলুড় মঠ দেখা যেত। ভোরবেলা ব্রহ্মচারী ট্রেনিং সেন্টারের ব্রহ্মচারীরা যখন বেদমন্ত্র পাঠ করতেন, সেগুলি শুনেছি, গঙ্গার হাওয়া পেয়েছি – সবমিলে যেন শ্বাশত ভারতবর্ষে থাকা। আমার গ্রামে একটা লৌকিক ব্যাপার দেখেছি, আর সারদাপীঠে যেন আমি বৈদিক ব্যাপার দেখলাম। এই লৌকিক-বৈদিক ব্যাপার, এ সব ফেলে দিয়ে আমি উপন্যাস লিখব কেন? এ আমার অস্তিত্ব। আমার অস্থিত নিয়ে আমি লেখক। আমি ওটা ছেড়ে ফেলে দিয়ে চলে আসব কী করে?

পাঠক : পুনর্নির্মাণ অনেক রকমের হয়ে থাকে। 'ধনপতির সিংহলযাত্রা' সম্পর্কে সুমিতা চক্রবর্তী বলেছেন – 'প্রচলিত আখ্যানের পুনঃকথন, সংযোজন-বিয়জনের পথে যাননি।'-এই মতটিকে আপনি কতটা সমর্থন করেন? এই বিশিষ্ট ধারাকেই বেছে নেওয়ার কারণটি কী?

সাহিত্যিক : (একটু হেসে) সমালোচক যা বললেন, তিনি তাঁর মতো বললেন। তোমাকে প্রথমে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কতটুকু আমি বলবো। মানে, প্রথমে আমি বিয়োজনটাই করেছি। ব্যাপারটা হচ্ছে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য থেকে আমি যেটা নিয়েছি সেটা হল – রাজার নির্দেশে সমুদ্র পেড়িয়ে সিংহল যাওয়া এবং সেখানে গিয়ে বন্দী হওয়া পর্যন্ত। উপন্যাসে যতটুকু দরকার আমি ততটুকুই গ্রহণ করেছি। আমি প্রচলিত কাহিনিকেই নিয়েছি। ঐতিহাসিক কাহিনি যেমন শেক্সপিয়র ব্যবহার করেছেন, আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রও করেছেন। প্রথমেই প্রশ্ন হচ্ছে তুমি কোন্ জায়গাটা নিচ্ছ। উপন্যাস হিসাবে Priority কী? আমি তুলেছিলাম বাঙালি হিসাবে ধনপতির সমুদ্রযাত্রাকে, চেষ্টা করেছি গঙ্গার দু'পাশটা ধরতে। ৫০০ বছর আগে এই অঞ্চলের যে সভ্যতা সেটা গঙ্গার দু-পাশে গড়ে উঠেছিল। সভ্যতাটাকে সন্ধান করা হচ্ছে, বাঙালির ইতিহাস সন্ধান করা হচ্ছে, তার জীবনটাকে বোঝার চেষ্টা করা হচ্ছে। কবিকঙ্কণের কাব্যে সমুদ্রযাত্রা বোধহয় সাত-আট পৃষ্ঠা আছে, উপন্যাসে বাকিটা নির্মাণ। গোটা সমুদ্রযাত্রা জুড়ে আকাশ, জল, গঙ্গার দুই তীরের মানুষ স্থান পেয়েছে। কাহিনিটা উপন্যাসের সুতো মাত্র। ঠিক যেমন ফুলের

মালায় সুতোটা দরকার। আসলে ফুলটা তো গাঁথতে হয়। মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্যে রামায়ণের আখ্যানভাগ বদলাননি, কিন্তু তিনি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তার পুনর্নির্মাণ করেছেন। আবার সেলিনা হোসেন 'চাঁদবেনে' উপন্যাসে মনসামঙ্গলের চাঁদ চরিত্রের অবলম্বনে কৃষক চাঁদ-এর চরিত্র নির্মাণে নিজের সময় ও সমাজকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাদের Priority আলাদা। আমি তো ৫০০ বছর আগের ইতিহাসটা জানতে চেয়েছি। গঙ্গার দু'পাশ ধরতে চেয়েছি। এক একটা জনপদকে যখন ধরা হচ্ছে তখন সেটাকে আরো বড় করে দেখা হচ্ছে। আমি অতীতটাকে সামনে তুলে আনতে চেয়েছি। আমি অতীতকে অতীত রেখে বর্তমানের সঙ্গে জুড়তে চেয়েছি।

পাঠক : কালের যাত্রায় মধ্যযুগের সাহিত্য ক্রমে নিজের মধ্যে নিজে বিলীন হয়ে গেছে। মধ্যযুগের আখ্যানকে কেন্দ্র করে পুনর্নির্মাণের ধারায় রচনাগুলি হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা অনেকেই মনে করেন, এ সম্পর্কে আপনার কী মনে হয়?

সাহিত্যিক : কালের নিয়মে হারায়নি। ঔপনিবেশিক শাসন এসেছিল, তারপর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এসেছিল, আমরা শিক্ষিত হয়েছিলাম, শিক্ষিত হয়ে বুঝে নিয়েছিলাম শহরে যারা থাকে তারা ভদ্রলোক আর গ্রামে যারা থাকে তারা চাষাভুষো গেঁয়ো লোক। যেমন রবীন্দ্রনাথের ‘পোস্টমাস্টার’ গ্রামে গিয়ে মন বসাতে পারেনি। কাজেই এটা মানসিকতা। তা কোথাও বিলীন হয়নি। তুমি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে মনে করলে এটাই আমার ইতিহাস। ইংরেজি শিখলে, তারপর বাঙালি সাহেব হয়ে গেলে। আমাদের গ্রামের বাড়িতে শিবমন্দির আছে, মনসামন্দির আছে, আছে সীতারামের মন্দিরও। সেখানে নিত্য পুজো হয়। তুমি কী করে বলবে তাহলে শিব নেই, মনসা নাই, সীতারাম নেই? রোজ প্রসাদ দেওয়া হচ্ছে, প্রসাদ খাওয়া হচ্ছে। কলকাতার ড্রয়িংরুমের উপন্যাস ঔষধির মতো বছর না পেরোতে মরে যাচ্ছে। বনস্পতির মতো রামায়ণ ও মহাভারত আজও আছে। তা থেকে পুনর্নির্মাণ হচ্ছে ভারতবর্ষের নানা ভাষায়। চণ্ডীদাস আছেন, বিদ্যাপতি আছেন, মুকুন্দ আছেন, রামপ্রসাদ-ভারতচন্দ্র আছেন। আবার যার আয়ু কম, সে হারিয়ে গেছে। সাহিত্যে কুড়ি বছর আগের উপন্যাস হারিয়ে গেছে, নাটক হারিয়ে গেছে কিন্তু শেক্সপীয়র, কালিদাস তো রয়ে গেছেন। যেটা বলতে চাইছি নাগরিক সাহিত্য সেটা থাকবে, অন্যটা থাকবে না – এটা ভুল ধারণা।

পাঠক : মহাশ্বেতা দেবী ধনপতি-আখ্যানকে কেন্দ্রস্থ করে লিখেছিলেন ‘বেনে বউ’। সেখানে তিনি খুল্লনার নাম পরিবর্তন করেছেন অহনায় এবং নায়কের নাম পরিবর্তন করেছেন গণপতিতে। আপনি ‘ধনপতির সিংহলযাত্রা’ উপন্যাসে চরিত্রগুলির নাম পরিবর্তন করেননি কেন?

সাহিত্যিক : একজন সাহিত্যিক কীভাবে চরিত্রের নামগুলিকে পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করবেন সেটা তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। মহাশ্বেতা দেবী আমার উপন্যাসটি পড়ে খুশিই হয়েছিলেন এবং তা নিয়ে লিখেও ছিলেন একটি ইংরেজি দৈনিকে।

পাঠক : মঙ্গলকাব্যের আখ্যানে আমরা মনসা ও চণ্ডীর মধ্যে বিবাদ দেখতে পাই। কিন্তু 'ধনপতির সিংহলযাত্রা' উপন্যাসে বিবাদ না দেখিয়ে উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের গাঢ়তা দেখালেন কেন?

সাহিত্যিক : এখানেও সেই একই প্রসঙ্গ। দেখবে একই সঙ্গে হর-গৌরীর দ্বন্দ্ব যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনই তাদের মধ্যে মিলনও দেখানো হয়েছে। ব্যাপারটা হচ্ছে মধ্যযুগ বা প্রাচীন দেব-দেবীদের মধ্যে সম্পর্কের রদবদল ঘটেছে। আবার একই চরিত্রের নানাভাবে নাম বদলে গেছে। তৈরি হয়েছে লৌকিক-পৌরাণিক চরিত্রের মধ্যে যোগাযোগ। কাজেই আমার এখানে মনসা-চণ্ডীর মধ্যে দ্বন্দ্ব কিংবা সখ্যতা লক্ষ্য ছিল না, আমি ধনপতির আখ্যানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চরিত্র দুটিকে গড়ে তুলেছি। (একটু হেসে) আর আজকাল বাংলা উপন্যাস ও সিরিয়ালে শাশুড়ি-বউ-এর এত ঝগড়া হয় যে আমি আর ঝগড়া দেখাতে চাইনি। মধ্যযুগে যখন নারীবাদের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তখন আমি দ্বন্দ্ব দেখানোর কথা ভাবিনি। মধ্যযুগে দুজন নারী প্রতিষ্ঠা চাইছে, এটাই বড় কথা আমার কাছে।

পাঠক : 'ধনপতির সিংহলযাত্রা' উপন্যাসে ধনপতি চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে আপনার কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করেছে?

সাহিত্যিক : আমার উপন্যাস ও চণ্ডীমঙ্গল-এর ধনপতির চরিত্রের মধ্যে অনেকখানি তফাৎ রয়েছে। আবার আমার এটাও মনে হয়েছে যে মনসামঙ্গল-এর চাঁদ এবং চণ্ডীমঙ্গল-এর ধনপতি চরিত্রের মধ্যেও অনেক তফাৎ। মনসামঙ্গলের চাঁদ অনেক বেশি উগ্র স্বভাবের, সেই জায়গায় চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি অনেক বেশি প্রেমিক। সওদাগরেরা ঐ সময় নিজেদের আর্থিক অবস্থা অনেকখানি বাড়িয়েছিল তা আমরা বুঝতে পারছি। ঐ সময় বাঙালির হাতে বিপুল অর্থ থাকায় তারা পায়রা উড়িয়েছে। আবার তাদের মধ্যে যেমন যৌন আকাঙ্ক্ষা কাজ করেছিল, তেমনই ছিল একটা রোমান্টিক মন। আবার ধনপতি চরিত্রের মধ্যে কাম-কামনার পাশাপাশি সমুদ্রযাত্রার সাহসও ছিল। আমি সবটা মিলে ধনপতিকে একজন রক্তমাংসের মানুষ হিসাবে গড়তে চেয়েছি। ধনপতি পায়রা ওড়াতে ভালোবাসে, সুন্দরী নারী তাঁর ভালো লাগে। আবার ধনপতি কারাগারে বন্দী থাকার সময় সে সত্যকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছে। তাই বলতে পারি মানবিক চরিত্রের মধ্যে যা যা গুণ থাকা প্রয়োজন তা সবই আছে তার মধ্যে।

পাঠক : 'দুখে কেওড়া' উপন্যাসে বিভিন্ন প্রসঙ্গে আপনি রামায়ণ ও মহাভারতের প্রসঙ্গ এনেছেন কেন?

সাহিত্যিক : একই প্রসঙ্গ যেটা শুরুতে বলেছিলাম। মানুষ খুব বেশি বাস্তবতা নিয়ে বেঁচে নেই, বেঁচে আছে অনেক বেশি মিথ নিয়ে। মানুষের মধ্যে অনেক কল্পনা, অনেক ভাবের বিস্তার। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পড়লে বুঝবে এটাই শাশ্বত ভারতবর্ষ, এটাই শাশ্বত বঙ্গদেশ। তাহলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত উড়ে গেল কোথায়? ঐ অপূর্ব কথন বাংলা উপন্যাসে ব্যবহৃত হল না? ঐ কথনরীতি আমার মতে বাংলা উপন্যাসের Narrative হওয়ার কথা ছিল। এই বিচ্ছিন্নতা কোথা থেকে এল? কাজেই রামায়ণ, মহাভারত থেকেই তো উপমা নেব। Wisdom বলে একটা ব্যাপার আছে সেটা অনেক বেশি আছে রামায়ণে, মহাভারতে, লোককথায়, লোকগীতিতে। এটাই ভারতের আদি জীবনদর্শন। কিন্তু সেই জায়গায় আছে শিক্ষা - জীবিকার জন্য। তাই জীবনের জরুরি সত্যের সন্ধানে বেদ, উপনিষদ, মহাকাব্য, কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ পড়া। এর পাশাপাশি আমাদের লোকসংস্কৃতি আনন্দ ও প্রজ্ঞার উর্বর ক্ষেত্র। গোপাল ভাঁড়ও সেই ঐতিহ্যেরই অংশ।

পাঠক : প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি এটাও আপনার লেখায় তাহলে বিশেষ জরুরি?

সাহিত্যিক : হ্যাঁ, বিশ্বনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে বড়। তিনি চমৎকার নৃত্য করেন, তিনি কল্যাণের প্রতীক, তিনি শিব। তিনি হিমালয় জুড়ে আছেন। আবার সবটা মিলে তিনি আমার গাজন, তিনি আমার সংকটের আশ্রয়। কত মানুষ কত রকমভাবে বিশ্বনাথকে ভেবেছেন। রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, নিবেদিতা প্রমুখেরা নানাভাবে লিখেছেন। তাই আমি বলতে পারি যে প্রথাগত শিক্ষা এগুলির বিকল্প হতে পারে না।

পাঠক : আধুনিক যুগ পেরিয়ে বর্তমানে আমরা উত্তর আধুনিক যুগে এসে পৌঁছেছি। এ সময়ে দাঁড়িয়ে মধ্যযুগ চর্চার প্রাসঙ্গিকতা আছে কী? এ সম্পর্কে আপনার মতামত বলুন।

সাহিত্যিক : আধুনিকতা বলেছিল দরকার নেই কারণ অতীতের সঙ্গে আমাদের কোনো মিল নেই। কিন্তু উত্তর আধুনিকতা তা বলেনি। আধুনিকতা শিখিয়েছে যুক্তির কথা, বিজ্ঞানের কথা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের কথা। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন আধুনিকতার তত্ত্ব বিগত আট-ন' দশকে আর তেমন সর্বজনগ্রাহ্য সত্য নয়। আরো নতুন নতুন তত্ত্ব এসে গেছে।

পাঠক : রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতার কথা বলতে গিয়ে শাশ্বত আধুনিকতার কথা বলেছেন। সেই শাশ্বত আধুনিকতার কথাটিকে গ্রহণ করে উত্তর আধুনিক যুগে পৌঁছেও আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে উত্তর আধুনিক আমাদের শেখাচ্ছে মধ্যযুগের আখ্যান ছাড়াও বর্তমানের যা কিছু মঙ্গলকর সে সমস্ত কিছুকে গ্রহণ করে আমাদের সামনে এগিয়ে চলতে হবে। আপনার কী মনে হয়?

সাহিত্যিক : বর্তমান সমাজে যা কিছু ঘটে চলেছে তা থেকে কিছু জিনিস থেকে যাচ্ছে আর বাকিটা খসে যাচ্ছে বা হারিয়ে যাচ্ছে। লক্ষ করলে দেখা যাবে আজও 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস পড়া হচ্ছে। অথচ গত শারদীয়াতে যে উপন্যাস লেখা হয়েছে সেটা আমরা অনেক ক্ষেত্রে আজ আর পড়ি না। তাই যেটা বলতে চাইছি শাশ্বত আধুনিকতা বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলা'র মধ্যে থেকে গেছে। অর্থাৎ আমার যেখান থেকে যতটা গ্রহণ করা উচিৎ ঠিক ততটাই গ্রহণ করবো। উদাহরণ হিসাবে আমি বলতে পারি বিগত কুড়ি বছরে যা বই প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে কিছু বই আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে। আবার চারশো বছর আগেকার বইও আমার কাছে আছে। কাজেই আমি সবসময় যতটুকু আমার প্রয়োজনে লাগবে ততটুকুই গ্রহণ করছি। আবার তুমি একই থালায় ঘি, দুধ, পায়েস খাচ্ছো। সেটা আসলে বিভিন্ন সময়ে তৈরি। আমি যে হিসেবে খাই সেই হিসাবেই লিখি। তোমরা কোন্ সাহিত্যতত্ত্বকে দিয়ে উপন্যাস বিচার করলে সেটা আমার জানা জরুরি নয়। আমি যেমন বাঁচি তেমনই লিখি। শিবের প্রসাদ খাওয়া যেমন সত্য, শিবের উপর লেখা উপন্যাসও তেমনই সত্য। শিবকে সচক্ষে দেখিনি কিন্তু গাজনের ভক্তদের দেখি। শিব স্বয়ম্ভূ কিনা বলতে পারব না কিন্তু যে শিব মানুষের বিশ্বাস কিংবা কল্পনায় সৃষ্ট তার সঙ্গে আমার প্রাণের যোগ। গঙ্গা নদী কতদিন হয়ে গেল, সেদিক থেকে সেটিও তো পুরানো। সরস্বতী বর্তমানে শুকিয়ে গেছে, তা নিয়েও আজকে উপন্যাস লেখা যাবে। সেটিও একটা উপন্যাস হয়ে উঠবে। অর্থাৎ আমরা নতুনকে পাশে রেখে পুরানোকে গ্রহণ করে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলবো।

কবি অমৃতেন্দু মণ্ডলের মুখোমুখি

অনুপ মণ্ডল

প্রশ্ন : আপনার জীবনে কবিতা লেখার সূচনা প্রথম কীভাবে ঘটে?

উত্তর : সচেতনভাবে কবিতা লেখার বিষয়টা অনেক পরে আসে। কিন্তু কবিতার ভালোবাসা এসেছে শৈশব থেকে। ছড়ার কবিতা বা ছন্দ মিলের কবিতা থেকে ভালো লাগার স্পন্দন তখনই তৈরি হয়েছিল। ৩-৪ এ যখন পড়ি, একবার তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। এই বৃষ্টি আমাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল। অঝোর বৃষ্টিপাতের মধ্যে দেখি খেজুর গাছগুলো ভিজছে। খেজুর গাছের সেই ভেজাটা বেশ রোমাঞ্চকর। খেজুর গাছের ওই খাঁজ কাটা অংশগুলো যেন সুরবাহারের নীড়ের মতো। যেন কোনো সভ্যতার আদি প্রতীক। এখন বুঝি সেটা এক শিহরণ জাগা সৌন্দর্য। এটা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। তখন কতগুলো পংক্তি যেন আমায় দিয়ে লিখিয়ে নিল আমার ভিতরের কোনো অন্তর দেবতা।

প্রশ্ন : আপনার প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কী? সেটি প্রথম কীভাবে প্রকাশ পেল?

উত্তর : ন'য়ের দশকের প্রথম পর্বে আমার প্রথম কবিতার বই প্রকাশ হয়। ১৯৯৪ সাল। 'অধিষ্ঠানভূমি' প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম। কবিতার বইটি প্রকাশ করেছিলেন বিখ্যাত একজন মানুষ। দেবকুমার বসু। আমার সৌভাগ্য বলতে পারো। এই মানুষটি সেই মানুষ যিনি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম কবিতার বইটি ছেপেছিলেন।

প্রশ্ন : আপনার লেখা প্রথম কবিতার নাম কী?

উত্তর : এই দ্যাখো! সেটা তো ঠিক এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না।

প্রশ্ন : কবি হিসাবে একজন পাঠকের কাছে আপনার আবেদন কী হবে?

উত্তর : এটা তো এক কথায় বলা যায় না। বিষয়টা হল যে, প্রথমেই বলতে হবে একজন কবি তো তার সময়কে ধরার চেষ্টা করেন। সময়ে দাঁড়িয়ে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছেন সেই অভিজ্ঞতাগুলোই তিনি প্রকাশ করতে চাইবেন। সেই হিসাবে আমার এই অনুভব, আমার এই সময়, আমার এই যাপন সমস্ত কিছুই আমি গ্রহণ করার চেষ্টা করি এবং সেগুলোকে প্রকাশ করাই আমার কাজ। সেই প্রকাশটা অবশ্যই নান্দনিকতা নিয়ে প্রকাশ হতে হবে। এটা আমি বিশ্বাস করি। শুধু কথা বলে গেলে কবিতা হয় এটা আমি বিশ্বাস করি না।

প্রশ্ন : আপনি কী মনে করেন একজন ভালো কবি হতে গেলে একজন ভালো মানুষ হওয়া আবশ্যিক?

উত্তর : হ্যাঁ। অবশ্যই। দেখো একজন মানুষ এই কথাটি অনেক বড় ব্যাপার। এই একজন সৎ সুন্দর, এই পৃথিবীর মঙ্গলকামী একটা সত্তা, সেইগুলো যদি একজনের মধ্যে থাকে তবেই তো আমরা তাকে মানুষ বলতে পারি। পরিপূর্ণ মানুষ নাও হতে পারে। মানুষতো তবেই তাকে বলা যায়। একজন ভালো মানুষ ছাড়া শুধু কবিতা কেন, কোনো সৃজন কাজই করা যাবে না। কিন্তু ইতিহাসে অন্যরকম ব্যাপার আছে। দেখা গেছে ভীষণ রকম ক্রুর, খুব হিংস্র এমন মানুষও কবিতা লিখেছেন। ভালো কবিতা। সুতরাং এই ব্যাপারটা কিন্তু বেশ বিতর্কিত। কারণ এই ব্যাপারটি তো একটা শিল্প। যার আয়ত্তে আছে এই শিল্পটি, সে মানুষটি যদি জঘন্য অমানুষও হয় তবুও সে একটি ভালো সৃষ্টি করে দিতে পারে। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে দেখতে গেলে সেটা সম্ভব নয়। একেবারেই নয়। তার কারণ সেখানে তার মধ্যে যে নেতিবাচক স্বর, অমানুষিত যে সত্তা সেগুলির তো মিশ্রণ ঘটে যাবে তার রচনায়। আর যখন মিশ্রণ ঘটে যাবে তখন তো তাকে চিনে ফেলা যাবে। এইটা মানুষ বুঝে ফেললে তখন তো মানুষই একদিন বিচার করে নেবে যে, এই মানুষটি কতটা ভালো কবি বা কতটা ভালো কবি নয়।

প্রশ্ন : বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আপনি বাংলা কবিতাকে কীভাবে দেখবেন? সেইসঙ্গে বাংলা কবিতার মান বিশ্ব সাহিত্যের কোন্ পর্যায়ে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : সমগ্র বিশ্বের প্রেক্ষিতে, সমস্ত বিশ্বের মধ্যে যে কবিতা-বিশ্ব; সেই কবিতা-বিশ্বের কথা যদি ভাবি তাহলে আমাদের বাংলা কবিতার মান বিশ্বমানের। এখনও পর্যন্ত যে বাইরের দেশের কবিতা বা অনুবাদ কবিতাগুলো আমরা দেখতে পাই, সেগুলো এখনও পড়লে মনে হয়; এঁরা এত ভালো ভালো কবি যাঁদের নাম সারা বিশ্বেই আছে অথচ তাঁদের এই লেখা পড়ে তো তত ভালো লাগছে না। মনে হচ্ছে না তত উন্নত মানের কোনো লেখা। সব সময় কী তাই? তা নয়। কিছু কিছু লেখা তো অসাধারণ। যাদের থেকে আমাদের শিক্ষণীয় বহু জিনিস আছে। যে একটি ভাবনাকে এভাবেও ভাবা যায় এবং সেটিকে কবিতায় রূপ দেওয়া যায়। এখনও এই মুহূর্তে যারা বাংলা কবিতায় লেখালেখি করছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। কবিতার ক্ষেত্রে আমরা কোনো ভাবেই পিছিয়ে নেই। বরং বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সমালোচনা সাহিত্যে আমরা একটু পিছিয়ে আছি।

প্রশ্ন : আধুনিক কবিতার সূচনা পর্ব থেকে শব্দের ব্যবহার খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কবিতার এই শব্দের ব্যবহারকে আপনি কীভাবে দেখবেন?

উত্তর : অনেক ক্ষেত্রে নিত্য নতুন ও পরিচিত কোনো শব্দ কবিতার মানকে আরো বাড়িয়ে দেয়। তবে শব্দের ব্যবহার করতে গিয়ে কবিকে একটু সচেতন থাকতে হবে। কারণ আমদের লক্ষ্য রাখতে হবে কোনো পংক্তিতে কোনো শব্দ যেন অসংলগ্ন না হয়ে ওঠে। কাব্যে শব্দ সুষমা তাই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

প্রশ্ন : কবিতা কী সময়কে তৈরি করে নাকি সময় কবিতাকে নির্মাণ করে? এ বিষয়ে আপনারঈ মতামত।

উত্তর : দেখো স্বাধীনতা প্রাপ্তির ঠিক আগে কিছু কবিতা মানুষকে আপ্লুত করেছে। এর মধ্যে তোমার 'ভেঙে ফেলো লৌহ কপাট', 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে', 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়'- এগুলোতো সময়কে প্রভাবিত করেছিল। এটাতো স্বীকার করতে হবেই। কিন্তু পরবর্তীকালে তেভাগা আন্দোলনের সময় বেশ কিছু কবিতা দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর নিয়ে, বিশেষ করে সুকান্তের কবিতা, প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ফ্যান', দীনেশ দাশের 'কাস্তে', রাম বসুর 'পরাণ মাঝি ডাক দিয়েছে' ওই সময়ের মানুষ-জনের ভাবনাকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু এখন কবিরা সময়কে ধরার চেষ্টা করেছেন তাঁদের কবিতায়। তাই সময় এবং কবিতা একে অপরের পরিপূরক।

প্রশ্ন : কবিতায় চিত্রকল্পের ব্যবহার জীবনানন্দ দাশ থেকে বর্তমান সময় কাল পর্যন্ত খুব বেশি পরিমাণে দেখা দিচ্ছে। কবিতায় চিত্রকল্পের ব্যবহার নিয়ে আপনার মতামত যদি ব্যক্ত করেন।

উত্তর : কবিতার তো কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। গদ্যের ভিতরেও কবিতা থাকতে পারে। এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা তার দৃষ্টান্ত। আমার মতে কবিতাও একটা গভীর সত্য কথা বলে। সহজ সরল কোনো বিষয়ের মধ্যে সত্যিটা থাকা। এই কথাটিকে কবি অনুভবের রসায়নে এমনভাবে তৈরি করবেন যেটা শুনলে ভালো লাগবে। আমরাও কল্পনায় সেটিকে দেখতে পাবো। কবির শিল্পবোধ, অভিনিবেশ, তাঁর পর্যবেক্ষণ, তাঁর সমস্ত বোধ এবং বোধের নির্যাস এগুলোর সহায়তায় সে চিত্রকল্প নির্মাণ করছে।

প্রশ্ন : এখন কবিতায় গদ্য ছন্দের ব্যবহার খুব বেশি। গদ্যছন্দের এই বহুল প্রয়োগ কবিতার মানকে কী ক্ষুণ্ণ করছে ?

উত্তর : গদ্য ছন্দ শুধু বাংলা সাহিত্যে নয় এখন সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যে দেখো গদ্য ছন্দ ছড়িয়ে আছে। কবিতার যে বৈশিষ্ট্য তা ছন্দের উপর নির্ভর করতে পারে আবার নাও পারে। আমাদের সংস্কৃত কবিতায় আমরা অন্ত্যমিলের ব্যবহার দেখতে পাই। কিন্তু অন্ত্যমিল থাকলেই যে কবিতা হবে, না থাকলে হবে না এমনটা বলা বোধ হয় ভুল হবে।

কবি যখন কিছু বলেন তখন সেই বলার যদি ছন্দ থাকে, তিনি যদি ধ্বনিমাধুর্যপূর্ণ কিছু যোগ করতে পারেন শব্দের মধ্যে, শব্দ ব্যবহারের মধ্যে, শব্দের ব্যঞ্জনার মধ্যে, তাহলে সেখানে তথাকথিত ছন্দের ব্যবহার না থাকলেও অসুবিধা নেই। গদ্যের মধ্যেও কিন্তু ছন্দ লুকিয়ে থাকে, যেমন – 'কবেকার পাড়াগাঁর অরুণিমা সান্যাল'।

প্রশ্ন : কবিতায় তত্ত্বের ব্যবহারকে আপনি কীভাবে দেখবেন ?

উত্তর : কবিতার এই তত্ত্ব ভাবনা কিন্তু এসেছে কবিতা থেকে নয় শিল্প থেকে, Painting থেকে। এই সুররিয়ালিজম, ডাডাইজম এইসব বিভিন্ন তত্ত্ব কবিতার জগতে এসে জুড়ে গেছে। এগুলো সব আমরা পাশ্চাত্য থেকে ধার করেছি। এইসব তত্ত্বের মধ্যেও সমতা নেই, একটা অস্থিরতা রয়েছে। এই বক্তব্যগুলো আমার মনে হয়েছে খুব বিচ্ছিন্ন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আমি বা জীবনদেবতার তত্ত্ব তা তাঁর একান্ত নিজস্ব। উপনিষদীয় ভাবনার সঙ্গে যুক্ত বলতেও তো পারি। আসলে সব কবিরই আলাদা আলাদা একটা জীবনদর্শন থাকে। সেখান থেকেও তারা নতুন কোনো তত্ত্বের সূচনা ঘটাতে পারেন।

প্রশ্ন : সমাজের কাছের প্রত্যেক সাহিত্যিক দায়বদ্ধ। কবি হিসাবে সমাজের কাছে আপনি কোন্ বার্তাটি পৌঁছে দিতে চাইবেন ?

উত্তর : সমাজের কাছে সে যদি স্বীকার করে সে দায়বদ্ধ এটা শুনতে ভালো লাগে। তবে প্রকৃত বাস্তবে সেটা নয়। সেটা হয় না। কারণ সৃষ্টি এমন একটা জিনিস এটা আমাকে সমাজের কল্যাণের জন্য করতে হবে এই ভাবনাটা হয় না। কারণ সেক্ষেত্রে হলে একটি ব্যক্তিমানুষের যে স্বাধীনতার প্রশ্ন, যে sence of liberty সেটা হানিকারক হবে। কোনো বৃদ্ধ যদি তার নাতিটির জন্য লিখতে চান তাহলে সেটা নাতির জন্যই হচ্ছে। এটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক। একজন প্রেমিক প্রেমিকাকে নিয়ে লিখছেন। এখানে কিন্তু সমাজের ব্যাপার থাকছে না। একটি ব্যক্তিমানুষের বোধ, ইচ্ছে, আকাঙ্ক্ষা বা স্বপ্ন সেটাকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করবেন। সেটা যে সবসময় সমাজের মঙ্গলের জন্য তাকে করতে হবে এমনটি কিন্তু নয়।

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি সমাজের কাছে আমার কিছু দায় আছে। এই সমাজ থেকে উৎসারিত আমি। তাই সমাজের উন্নতিকল্পে কল্যাণকামী লেখার চেষ্টা আমি সবসময় করব।

প্রশ্ন : কবিতা পত্রিকার সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু কবিদের খুঁজতেন। তাদের প্রকাশ্যে আনতেন। এখন এমন কোনো পত্রিকা কী দেখতে পান যারা কবিদের লাইম লাইটে আনছেন?

উত্তর : বুদ্ধদেব বসু আসলে প্রতিভাটা বুঝতেন। এইভাবে শঙ্খ ঘোষ প্রকাশিত হয়েছিল, এইভাবে সুনীল হঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এইভাবে বুদ্ধদেব বসু কবিতার গুরুত্বটা বুঝতেন। এখন প্রিন্টিং মিডিয়ার যে রমরমা, এই আমার বন্ধু...এর চারটে কবিতা ছেপে দিস। এখন ব্যাপারটা অনেকটা এরকম হয়ে গেছে।

প্রশ্ন : আপনার নিজের লেখাকে আপনি কীভাবে দেখবেন? সমালোচক হিসাবে নাকি আপনার প্রিয় কোন পাঠক হিসাবে?

উত্তর : আমি যদি নিজেকে আমার প্রিয় কোনো পাঠক ভাবি তাহলে নিজের লেখার আত্মতুষ্টিতে মগ্ন থাকব। এটা বোধ হয় ভালো দিক নয়। অহংকারও বটে। আমি যদি নিজেকে নিজের

সমালোচক হিসাবে দেখি তাহলে ভালো হয়। সেখানে ভুল ত্রুটিগুলো শুধরে নেওয়ার সময় থাকে। তবে এই বিষয়ে আমার একটু অস্বস্তি আছে। যেমন করে লিখব ভেবেছিলাম, কই তেমন করে তো লিখতে পারলাম না। পরেরটা আরো ভালো করে লিখতে হবে।

প্রশ্ন : আপনার লেখা কোন্ কবিতাটিকে পাঠক হিসাবে আপনি বারবার পড়তে চাইবেন?

উত্তর : আমরা যাই করি না কেন, যাই লিখি না কেন সেটা তো মানুষকে গ্রহণ করতে হবে, মানুষের পছন্দ হতে হবে, মানুষের অন্তরকে স্পর্শ করতে হবে। একজন অন্যজনের অন্তরকে স্পর্শ করতে পারা কিন্তু সৃষ্টি। আমি যদি আমার লেখাটা কারো কাছে পাঠালাম, লেখাটা তার অন্তরকে স্পর্শ করতে পারলো না তাহলে তার তো কোনো মানে নেই। সেইজন্য যাই লিখি না কেন তাতে চেষ্টা থাকে সেটা যেন মানুষের অন্তরকে স্পর্শ করতে পারে। যদি পারে ভালো, তা নইলে আর কী করা যাবে। আবার লিখতে হবে।

('মুড়ি', 'পুরষের অসুখের পাশে' আমার পড়তে বেশ ভালো লাগে।)

প্রশ্ন : ধরুন আর এক জন্ম হল (হিন্দুরা তো জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী), আপনি কী কবি হতে চাইবেন?

উত্তর : আমি না থাকলে আমার কবিতা যে থাকবে এতটা প্রত্যয়ী আমি নই। মানুষের জীবন বড্ড বেশি ক্ষণস্থায়ী। ক্ষণস্থায়ী এই জীবনে দাঁড়িয়ে বেশি কিছু আশা করা যায় না। তবে যদি এমন হয়, আমি এখন আছি কিছুদিন বাদে থাকবো না। নিশ্চয়তা নেই ফিরে আসার, কিন্তু ধরো যদি আসি; তাহলে আমি আবার এই কবিতাকে ভালোবেসে কবি হয়েই থাকতে চাই।

প্রশ্ন : এমন কোনো স্মরণীয় ঘটনা কী আছে যা আপনার কবিতা লেখাকে প্রভাবিত করেছে।

উত্তর : মুগ্ধ হয়ে পাঠকরা যখন ফোন করে তখন আমি খুব আপ্লুত বোধ করি। সেই ঘটনা থেকে পাঠকদের কাছে আরো ভালোকিছু তুলে ধরার জন্য নতুন করে লিখতে বসি।

প্রশ্ন : রবীন্দ্র-পরবর্তী এমন দুজন কবির নাম বলুন যাদের কবিতা আপনাকে মুগ্ধ করে।

উত্তর : অবশ্যই শঙ্খ ঘোষ। আর তাঁর আগে জীবনানন্দ দাশ।

প্রশ্ন : আপনার প্রিয় কবি কে?

উত্তর : আমার প্রিয় কবি অবশ্যই জীবনানন্দ দাশ। জীবনানন্দের কাব্যশৈলী, চিত্রনির্মাণ, চিত্রকল্প বলি যাকে, সহজ-সরল শব্দ ও তার ভিতরে থাকা গূঢ় ব্যঞ্জনা আমাকে আকৃষ্ট করে। অত্যন্ত সহজভাবে বলে চলা অথচ কত ভাব ব্যঞ্জনাময়। 'পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পান্ডুলিপি করে আয়োজন'। বাংলা সাহিত্যে এমনটি আর দেখতে পেলাম না।

প্রশ্ন : কবিতার সঙ্গে রাজনীতিকে আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

উত্তর : চিরকালই কবিরা যেহেতু সময় দ্বারা প্রভাবিত। সময় কিন্তু আবার অধিকাংশ সময় নিয়ন্ত্রিত হয় রাজনীতি দিয়ে। তারপরে আসে শিল্প সাহিত্য ইত্যাদি। কিন্তু প্রাথমিকভাবে সময় সবসময় নিয়ন্ত্রিত হয় সেই সময়ের রাজনীতির দ্বারা। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বল বা এই মুহূর্তে বল, সময় রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। ফলে দেশ কালের প্রেক্ষিতে সেই সময়ের রাজনৈতিক প্রেক্ষিতই ওই সময়ের নিয়ন্ত্রক। তার ফলে অধিকাংশ সময় কবিরা রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এসেছেন। প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি আসার আগে কিন্তু আমাদের সভাকবিরা রাজসভারই কবি ছিলেন। ফলে কবি যদি সময়কে ধরতে চান, তাহলে সেই সময়ের যে রাজনৈতিক প্রেক্ষিত তা অবশ্যই তাঁর কবিতায় ধরা পড়বে। আবার রাজনীতিকে অনেকে ধারণ করেন না। সেই সত্যকে ধারণ করেন।

প্রশ্ন : আপনার লেখা শেষ কবিতাটির নাম কী ? কবিতাটির বিষয়বস্তু যদি একটু সংক্ষেপে বলেন।

উত্তর : শেষ কবিতার নাম 'না'। এটা সময়কেন্দ্রিক লেখা। সময়ের যে নেতিবাচকতা, আমাদের এই সময়ের যে নানারকম ক্রাইসিস সেটাকে ধরার চেষ্টা করেছি।

প্রশ্ন : এই কর্মজীবনের মধ্য থেকে থেকে আপনার কবি-জীবনকে কীভাবে উপলব্ধি করেন?

উত্তর : এই একটা বিষয়। আমার এই যে দপ্তর, এই দপ্তরের মানুষজন এত ভালো, আমার সহযোগিতার জন্য এত ভূমিকা রয়েছে তাদের যে আমাকে তা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করতে হবে। এখানকার আমার সহকর্মী যারা, তারা আমাকে সবসময় খুব সহযোগিতা করেছে। 'চেনা মুখ অচেনা আলো নামক' এই পত্রিকাটির সূচনা হয় এইখান থেকে একটা অনুষ্ঠানের মধ্যে। সাহিত্য নির্মাণে অংশগ্রহণকারী বেশ কয়েকজন গুণী মানুষ এই খাদ্য দপ্তরে আছে। এই কর্মক্ষেত্রের মধ্যে একটা ইতিবাচকতা রয়েছে যা আমার কাজের পক্ষে, লেখার পক্ষে খুবই সহায়ক হয়। এই কর্মক্ষেত্রের টেবিলে বসে আমি অনেক লেখা লিখতে পেরেছি, কেউ বিঘ্ন ঘটাতে আসে না। বরং উৎসাহ জোগায়, লিখতে সাহায্য করে।

প্রশ্ন : আপনার কিছু কিছু কবিতায় নিঃসঙ্গতা বা একাকিত্ব বড্ড বেশি জায়গা করে নিয়েছে; এ বিষয়ে আপনি যদি কিছু বলেন।

উত্তর : এই একাকিত্ব এবং তার চারপাশে ঘিরে থাকা বিষাদ... এটা একজন কবির অপ্রতিরোধ্য বিধিলিপি। অন্তরপ্রদেশে তিনি নিঃসীম একা। পৃথিবীতে দ্বিতীয় কোনো সত্তা নেই যে তাঁর সঙ্গী হতে পারে। এই ব্যাখ্যাতীত বিষাদ ও নৈঃশব্দ্যের মধ্যে নিহিত থাকে তাঁর যাপনচিত্র। এই যাপনের মধ্যে কখনো দূর থেকে ভেসে আসা আলোকবিন্দুর মতো অথবা একটা কি দুটো শব্দ বা একটা-দুটো পংক্তি মনের মধ্যে নিঃশব্দে বাজতে থাকে এবং তাকে কেন্দ্রে রেখে

জন্ম নেয় এক ধরনের আবেশ। ঘরে-বাইরে সমস্তটা জুড়ে সেই আবেশের মধ্যে পুষ্ট ও পরিণত হতে থাকে কিছু অনুভব। তার সঙ্গে নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ মিশিয়ে ভ্রূণের মতো একটা কিছুর উদ্ভব হয় এবং ডিমের ভেতরে প্রায় পরিণত পক্ষীশাবক বেরনোর জন্যে ঠোঁট দিয়ে ভেতরের দিক থেকে যেমন ঠোক্কর দিতে থাকে এবং একসময় খোলা ভেদ করে বেরিয়ে আসে বাইরে, তেমনি কিছু একটা যেন বেরিয়ে আসে সাদা কাগজে যাকে আমরা কবিতা বলি।

প্রশ্ন : আপনার 'উড়ান' বা 'দগ্ধ ডানা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ পড়ে মনে হয়েছে আপনি ভাগ্যান্তরে বিশ্বাসী নয়, কর্মে বিশ্বাসী। আপনার এই ইতিবাচকতা ও সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য যে দৃষ্টিভঙ্গি এটি সম্বন্ধে আপনি যদি কিছু বলেন।

উত্তর : আমি বরাবরই কর্মে বিশ্বাসী। গীতার কর্মযোগ এ ক্ষেত্রে প্রেরণার উৎস। আর আমার ক্ষণিকের এই জীবনে, আমি যদি শুধু নিজের কথা ভাবি তাহলে ভগবান আমাকে কোনোদিন ক্ষমা করবেন না। মানুষের পাশে দাঁড়ানোর যে শান্তি, তাদের সামান্য মুখের যে হাসি তা আমাকে অনেক তৃপ্তি দেয়। আর এই তৃপ্তির স্বাদটাই যে স্বর্গীয়। আর এই স্বাদ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে চাই না।

প্রশ্ন : আপনার বেশ কিছু কবিতায় তৃষা নামটি এসেছে। কে এই তৃষা। আপনার কাব্যপ্রেয়সী নাকি নিছক কবিতার জন্য নির্মাণ?

উত্তর : তুমি দুটোই বলতে পারো। কাব্যপ্রেয়সী ধরতে পারো। কারো কারো অন্তরের ভিতর এক জীবনদেবতা থাকে। যে জীবনদেবতাকে সে সারক্ষণ পুজো করে, তার ধ্যান-জ্ঞানে মগ্ন থাকে। আসলে মনের ভিতর থাকা এই প্রেয়সী কাব্যপ্রেয়সীও বটে। এখান থেকেই সমস্ত সৃষ্টির উৎস নির্মিত হয়।

প্রশ্ন : বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে কোন কবিকে আপনার মনে হয় প্রতিষ্ঠান বিশেষ?

উত্তর : শ্রীজাতকে দেখে মনে হয়।

মুখোমুখি সুব্রত পাল
বিশাল কর্মকার

বিশাল : আপনাকে একজন নাট্যসংগঠক বলে জানি। এতদিন নাট্যসংগঠন পরিচালনার প্রেরণা কীভাবে নিজের মধ্যে অনুভব করেছেন?

সুব্রত : প্রেরণার কথা বলতে গেলে আগে কিছু কথা বলে নেওয়া দরকার। আমি থিয়েটারকে ব্যক্তিগতভাবে, সচেতনভাবে অন্যরকম করে চেয়েছিলাম। থিয়েটার দেখে তো সবাই আনন্দ পায়, বিশ্লেষণ করে, তুলনা করে, সমালোচনা করে। আমি উইথ সাম হেল্প থিয়েটারকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম এবং এর জন্য আমি বেছে নিয়েছিলাম ব্যাকস্টেজের লোকেদের যেমন – লাইটম্যান, কাউন্টারম্যান, মেক-আপ ম্যান – এদেরকে। এদের নিয়ে কাজ করতে চেয়েছিলাম বৃহৎক্ষেত্রে। আমরা থিয়েটার কর্মীরা মিলে দশ-পনেরো জন বাচ্ছা যাদের হার্টের ফুটো আছে, তাদের ব্যাঙ্গালোরে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করিয়েছি এবং তারা প্রত্যেকে এখনো সুস্থ এবং জীবিত। থিয়েটারের একটি বাচ্ছার ব্লাড ক্যান্সার সারিয়েছি এইভাবে। এখন তার ১৮ বছর মত বয়স। তার ব্লাড ক্যান্সার এখন আন্ডার কন্ট্রোল। এইভাবে আমি সমাজের আরও কাছে থিয়েটারকে আনতে চেয়েছিলাম। থিয়েটার আমার কাজের জায়গা। সুতরাং থিয়েটারের মাধ্যমেই আমি সমাজের উপকার করতে চেয়েছিলাম। আমার সব সময়ের চেষ্টা ছিল থিয়েটারের ইনকাম করা টাকা থেকে যদি সমাজের কোনো উপকার করা যায়। এইরকম সমাজের উপকার করার মনোভাবটা আমার ছিল। তাছাড়া আমার মনে হয় আমার ভেতরে কোথাও একটা অরগানাইজেশন ক্যাপাসিটি ছিলো যেটা আমি এক্সপ্লয়েট করতে পারিনি। আমি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মেলে ধরেছিলাম নাট্যসংগঠনের কাজে। এর জন্য আমাকে কিছু কিছু মূল্যও দিতে হয়েছে। এই মূল্য তো দিতেই হবে। বিয়ে করিনি, বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি। এখন ভাইপোর ফ্ল্যাটে থাকি। সরকারি চাকরি করতাম। আমি প্রোমোশন নিইনি। তোমাদের মতো বয়সে ফ্রিডম পেয়ে যা ইচ্ছে করেছি। কিন্তু আমার মধ্যে কাজ করার মনোভাবটা সব সময়েই ছিল। এই মনোভাবই আমার কাজে প্রেরণা জুগিয়েছে।

বিশাল : দীর্ঘদিন আপনি নিজেকে নাট্যসংগঠনের কাজে যুক্ত রেখেছেন। সুতরাং থিয়েটার প্রযোজনার সমস্ত বিষয়টিই আপনার জানা। নাট্যসংগঠন ছাড়া থিয়েটারের অন্য বিষয়ের সাথে যেমন নির্দেশনা বা অভিনয়ের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে কখনো আপনার ইচ্ছা হয়নি?

সুব্রত : না, না, আমার অভিনয় করতে ইচ্ছা হয়নি কোনদিনই। আমাকে একবার জোর করে অভিনয় করতে হয়েছিল 'তিন পয়সার পালা'য় মুখোশ পরা সোলজারের ভূমিকায়। এই অভিনয়ের জন্য কেউ ছিলো না। আর এক জায়গায় অজিতদা চেষ্টা করেছিলেন। 'তিন পয়সার পালা'য়

একজন জেলরের চরিত্র ছিল। এই পার্টটা শুভেন্দু চ্যাটার্জীর ভাই দিব্যেন্দু করতো। একটা কাজে তাকে চলে যেতে হয়েছিল। তখন আমাকে জেলর হতে হয়েছিল। আমি অভিনয় ভালো পারি না। ভয় করে। হাত-পা কাঁপে। আমাকে অন্য কাজ দাও, আমি করবো। জ্যোতি, বাদল, আমি সবাই মিলে ফুটবল নাটকের পোষ্টার মেরেছিলাম দেওয়ালে মই নিয়ে। মান্নাদা ছিলেন ইস্ট বেঙ্গলের সাপোর্টার। তিনি দেখে বললেন 'ভাল হয়েছে, কিন্তু একটু বাড়াবাড়ি হয়েছে আর কি'। এই কায়িক পরিশ্রমের জায়গাটা আমার ছিলো।

বিশাল : আপনি যখন প্রথম নাট্য সংগঠনের কাজে নিজেকে যুক্ত করেন, কোন ভাবনা থেকে আপনি উৎসাহিত হয়েছিলেন?

সুব্রত : তখন ১৯৬৬ সাল। ডব্লু বি সি এস পরীক্ষা দিয়ে সি গ্রুপে একটা চাকরি পেয়েছিলাম। ট্যুরিসিং ডিপার্টমেন্ট, ২ নং ব্রেবর্ন রোড। সেখানে দেখা হল নান্দীকারের সেক্রেটারি বরুণ সেনের সঙ্গে। তার সাথে আমার খুব বন্ধুত্ব হল। বরুণের স্ট্রং ডায়াবেটিস ছিল। ড. বিধানচন্দ্র রায় তাকে নিজে নিজে ইনসুলিন নিতে বলেছিলেন। সে নিজে নিজে ইনসুলিন নিয়ে অফিসে আসতো। ১৯৬৯ সালের ১৬ই জুন। রথের দিন। এদিন আমার বরুণের বাড়ি যাওয়ার কথা ছিল। সেদিন ওর বাড়ি আর যাওয়া হয়নি। পরের দিন খবর পেলাম ও সুইসাইড করেছে। পরের দিন সকালে অফিসে নান্দীকারের লোক এসে তার খোঁজ করতে লাগলো – 'বরুণের কোন খবর জানো ?' বললাম – না। লালবাজারে খোঁজ নেওয়া হয়। সেখানে একজন ডেপুটি কমিশনার অজিতদার ক্লাসমেট ছিল। তার তৎপরতায় খোঁজ শুরু হল। শিয়ালদহ ষ্টেশনের মর্গ থেকে বলা হল একটি ডেডবডির সাথে বরুণের জামার বর্ণনা মিলেছে। সেখানে আমি, পবিত্র সরকার (তখন নান্দীকারের মেম্বার ছিলেন), জয় সেনগুপ্ত সেখানে গিয়ে ডালা খুলে দেখে শনাক্ত করলাম। তখন আমি অন্য দলের কাজ করতাম। এরপর অজিতদা আমাকে নান্দীকারে আসতে বলেন। আর তারপর থেকেই আমি নান্দীকারের কাজ করতে লাগলাম। আমি কখনো অভিনয় করবো না – এই শর্তেই কাজে ঢুকেছিলাম। কিন্তু কাজ কোথায়? নান্দীকারে তখন নিয়মিত শো হত না। তারপর ১৯৭০-এ রঙ্গনা নেওয়ার পর নান্দীকারের কাজে দৌড় এলো। বৃহস্পতি, শনি এবং রবিবার দুটি করে অভিনয় হত। নান্দীকারে ৬ মাসের আগে মেম্বারশিপ দেওয়া হত না। আমাকে ৫ মাসের মধ্যে স্পেশালভাবে মেম্বারশিপ ইস্যু করা হয়। প্রথমে আমি ছিলাম অফিস সেক্রেটারি। এই সময় থেকে আমার মনে হতে লাগলো এই জায়গা থেকে আমাকে ফুঁড়ে বেরতে হবে। যে অভিনয় করে সে সেখান থেকে, যে গান গায় সে সেখান থেকে ফুঁড়ে বেরবে। আমি এভাবে বেরবো। সিনিয়ার রুদ্রপ্রসাদের সাথে আমার এখনোও বন্ধুত্ব আছে। এখন মাঝে মধ্যে দুপুরে গিয়ে নান্দীকারে আড্ডা মেরে আসি। আমি খুব ভেতরে ঢুকে যেতে পারতাম। কেয়া চক্রবর্তী ও রুদ্রদার সাথে এমন গভীর সম্পর্ক ছিল যে আমি কতদিন ওদের বাড়িতে থেকেছি, খেয়েছি। আমার আলাদা কোনো

ক্রেডিট নেই। আমি ফাঁকি দিতাম না। কাজ করতে হবে মানে কাজ করতে হবে। শম্ভু মিত্রের সাথে 'মুদ্রারাক্ষস' করতে গিয়ে আলাপ। তাঁকে লক্ষ করেছি, তিনি প্রত্যেক ব্যাপারে তর্ক চান এবং তার অরগানাইজেশন যথেষ্ট ভাল। নান্দীকারে কাজের সাথে সাথে আমি অন্য দলেও থিয়েটারের কাজ করেছি। নিজের দায়িত্ব এবং কাজের প্রতি আমি সবসময়েই কর্নসার্ন থাকতাম। কখনো নিজের কাজে ফাঁকি দিইনি। এই হচ্ছে আমার জীবন।

বিশাল : আপনার অভিজ্ঞতায় নাট্যসংঠন পরিচালনায় প্রতিকূলতাগুলো কী কী?

সুব্রত : যে কোনো কাজের ক্ষেত্রেই কিছু বাধা থাকে, ঝুঁকি থাকে। কোন মহৎ উদ্দেশ্যে পা বাড়াতে হলে এটুকু ঝুঁকি তো নিতেই হবে। তোমাকে একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। গোহাটিতে 'তিন পয়সার পালা' অভিনয় হয়েছিল। সেখানে যে টাকা দেওয়ার কথা হয়েছিল, সে টাকা দেওয়া হয়নি। অজিতদা বললেন "সুব্রত, তুমি থেকে যাও। পরের দিন বিকেলে শিলং-এ এসো।" তখন ১০ টাকা করে গোহাটি থেকে শিলং মানে মোটরে। আমি ঘুরতে ঘুরতে দেখলাম ৮০০ টাকা আর আদায় হবে না। আমি শিলং চলে গেলাম। শিলচরে শো ছিল। কলকাতা থেকে থ্রী টায়ার জার্নি ছিল। কলকাতা থেকে নিউ বনগাঁইগাঁও, নিউ বনগাঁইগাঁও থেকে গোহাটি, গোহাটি থেকে শিলচর। অরগানাইজারের সাথে কথা ছিল বনগাঁইগাঁও পর্যন্ত বুকিং করব। ৫০ জন। বাকিগুলো মানে গোহাটি, শিলচর এবং হাওড়া তারা করবে। আমরা অ্যাডভান্স পার্টি হিসেবে শিলচর গেলাম চারজন। আমি, রুদ্রদা, রাধারমন তপাদার এবং রতন দাস(সেটের লোক)। আমার দায়িত্ব ছিল সবার রিজারভেশন ঠিকঠাক হয়েছে কিনা দেখা। রুদ্রদা, রাধারমন আর রতন গেলেন সেটের ব্যবস্থা দেখতে। আমি গিয়ে দেখলাম রিজারভেশনের কোন ব্যবস্থা তারা করেনি। বুঝে দেখ। এতবড় টিম পরদিন আসবে। আমি সেই রাতেই ট্রেন ধরে গোহাটি চলে এলাম। সেখানে এসে একজনকে ধরে আমার সমস্যা জানালাম। তিনি বললেন গোহাটিতে বাঙালি কলোনিতে গিয়ে বলুন। কে পাত্তা দেবে সেখানে। এতজনের রিজারভেশন। তারা নানারকম কথা বলছে – আমাদের এখানে একটা শো করবেন, তাহলে দেখতে পারি। ঠিক ওই সময় একটা লোক এসে জিজ্ঞেস করলেন আপনার কী সমস্যা? তাকে সমস্যার কথা বললাম। তিনি বললেন আপনি একজন 'CPRO' (chief Public relationship Officer) অফিসারকে ধরতে পারেন। যদি উনি রাজি হন তাহলে হয়ে যাবে। আমি তো হাতে চাবি পেলাম। সেটা খুলবে কিনা তা তো জানি না। আমি সেখানে গিয়ে দেখি একটা হলঘরে গান্ধীটুপি পরা কংগ্রেস লোকেরা রয়েছে। মিটিং চলছে। সেবছর গোহাটিতে কংগ্রেসের অধিবেশন ছিল। তো আমি ভেতরে ঢুকে কথাবার্তা শুনছি। 'CPRO' বলছেন যে এই অধিবেশনের খাওয়া দাওয়ার-ব্যবস্থার জন্য রেলকে দায়িত্ব দিয়েছে। তা এতো লোকের তো প্রচুর আয়োজন লাগবে। বেঙ্গল পটারিজ বন্ধ এখন। আমি ওখানে দাড়িয়ে আছি। যেই বেঙ্গল পটারিজ বলেছে, আমার মাথায় সেটা স্ট্রাইক করলো। বেঙ্গল পটারিজের সেলস ম্যানেজার

ছিল ফুটবলের শান্তনু মিত্রের দাদা। তার সাথে আমার পরিচয় ছিল। তাদের বাড়িতে আমি থেকেছি। আমি দেখলাম আমাকে এই জায়গা থেকে ঢুকতে হবে। তারপর মিটিং-এর পর আমি গেলাম (আগেই নিজের পরিচয় দিয়েছিলাম)। 'CPRO' বললেন আপনার কি প্রব্লেম? আমি বললাম বিফোর কাম টু মাই ওন প্রবলেম (Before I come to my own problem) আমি মিটিং-এ আপনাদের একটা কথা ওভার হিয়ার করেছি। তো সেই ব্যাপারে যদি কিছু বলেন। বললেন কী ব্যাপার ? আমি বললাম আপনি বললেন যে বেঙ্গল পটারিজ বন্ধ। ঠিক কথা। কিন্তু বেঙ্গল পটারিজের সেলস ম্যানেজার আমার বন্ধু। তিনি বললেন তাই নাকি? কী নাম আপনার? আপনার পরিচয়, টেলিফোন নম্বর? আমি আমার অফিসের ঠিকানা, ফোন নম্বর দিলাম। বললেন আপনি পারবেন? বললাম হ্যাঁ স্যার, পারবো। তখন বললেন আপনার প্রবলেম বলুন। তাকে আমার সমস্যার কথা জানালাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন কতজন লোক? বললাম ৫০ জন। ভাবলেন-টাবলেন। তারপর বললেন যদি ৮০ সিটার কম্পার্টমেন্ট আপনাদের দিই? তাহলে হবে? ব্যাস আমার সমস্যা মিটে গেলো। সেই অর্ডার নিয়ে গেলাম নিউ বনগাঁইগাঁও। তারা বগি নম্বর, সিট নম্বর দিল। তারপর কেয়া চক্রবর্তী, অজিতদা, সবাই হৈ হৈ করে এসে হাজির। সবাই হাসি মুখে নামছেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন 'সুব্রত সব ঠিকঠাক আছে তো?' আমি ঘটনাটা বললাম। তারপর আমরা ৮০ সিটার-এ বসে এলাম। তারপর অজিতদা বললেন "গোহাটি এলে কামরার দরজা-জানলা সব বন্ধ করে দিতে হবে। গোহাটির পরের ষ্টেশনগুলোয় যতই ধাক্কা দিক, খুলবে না"। সেখানে ষ্টেশনে মহামারীর মতো লোক। তারপর শিলচর পৌঁছলাম এবং সেখান থেকে একই কম্পার্ট্মেন্ট-এ ব্যাক করেছিলাম। এটা কল্পনা করা যায় না। আমি দেখেছি যখনই আমি কোন ভালো কাজ করতে উদ্যোগ নিই, ঠিক তখনই কোথা থেকে যেন একজন গড সেন্ট ম্যান (God Sent Man) এসে হাজির হয় এবং আমায় সমস্ত বাধা-বিঘ্ন কাটাতে সাহায্য করে। যদি ভেতরে ভেতরে কাজের তাগিদ থাকে, তাহলে ইশ্বর তাকে পাঠিয়ে দেয়। সুতরাং ইফ ইয়ু ফিল কর্নসার্ন ফর ইয়োর অর্গানাইজেশন (If you feel concern for your Organization) তাহলেই হবে। তোমাকে কনসার্ন থাকতেই হবে। এইরকম নানান ধরনের ছোটো-বড় প্রতিকূলতা এসেছে আমার জীবনে। এই বাধাটাকে কাটিয়ে ওঠার একটাই পথ আর সেটা হল দলের প্রতি তোমায় কনসার্ন থাকতে হবে।

বিশাল : আপনি যে লক্ষ্য নিয়ে এই নাট্যসংগঠন পরিচালনার কজে পা বাড়িয়েছিলেন, তা কী পূরণ হয়েছে বলে আপনি মনে করেন ?

সুব্রত : আমার জীবনের একটা বড় অংশ জুড়ে আমি এই নাট্যসংগঠনের কাজ করেছি।আমার লক্ষ্য ছিল থিয়েটারকে মানুষের আরো কাছে নিয়ে আসব। মানুষের সাথে আত্মিক যোগাযোগ না থাকলে তো আর এই কাজ একার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি রিটায়ার করেছি অনেকদিন আগে।

আমার বয়স এখন ৭৬ বছর। আমি চাকরিতে প্রোমোশন নিইনি। আমি চেয়েছিলাম থিয়েটারের মাধ্যমে সমাজের কল্যাণ করতে, থিয়েটারকে মানুষের আরো কাছের করে তুলতে। এর জন্য কিছু ভালো মানুষের সহযোগিতার প্রয়োজন। কাজ করতে গিয়ে আমি এরকম অনেক মানুষেরই সহযোগিতা পেয়েছি। এরকম কাজের লোক যদি তিনজন লোক পাওয়া যায়, তাহলে রাজকার্য করা যাবে । নান্দীকারের ন্যাশনাল ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে। তার প্রবক্তা ছিলাম আমি। তার আগেও আমি ন্যাশনাল ফেস্টিভ্যাল করেছিলাম। সরকারিভাবে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের মাঠের ওপর দিনের বেলা ১২টা থেকে ৪টে এবং সেখানে পশ্চিমবঙ্গের যত ফোক ফর্ম যেমন – ভাওয়াইয়া, আলকাপ, বাউল, অমুক-তমুক সমস্ত। ৬-৩০টা থেকে ন্যাশনাল থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল। তাতে হাবিব তানবির, রতন থিয়াম, প্রমুখরা এসেছে। নিজের কাজের প্রতি এবং অরগানাইজেশনের প্রতি কনসার্ন ছিলাম বলেই আজ আমি এই জায়গায় আসতে পেরেছি। কাজের জন্য লোক কেমন জোগাড় হবে জানো? – হ্যাঁ রে, ওটা হল? তোর বাড়িতে তো মায়ের শরীর খারাপ, তো খাওয়া-দাওয়া করলি কোথায় ? এই কনসার্ন থাকতে হবে। আত্মিক যোগাযোগ না থাকলে হবে না।

বিশাল : একটি সার্থক প্রযোজনার ক্ষেত্রে একজন নাট্যসংগঠকের ভূমিকার গুরুত্ব কতখানি ?

সুব্রত : নাট্যসংগঠন কী জানো? সংগঠন হল যে যার জায়গায় আছ, দায়িত্বে আছ সে সেই কাজটা বা দায়িত্বটা ঠিকভাবে পালন করো। এছাড়া এটাই লক্ষ করবে যে, যে লোকটা হেড সে হবে এমন – হ্যাঁ রে, ওই কাজটা হল? জাস্ট মনে করিয়ে দেওয়া। এটা তো কোনো স্কুলবাড়ি নয় যে বেত ধরে মারতে হবে। কাজটা যত স্বতঃস্ফূর্তভাবে হবে তত ভালো। তোমাকে একটা গল্প বলি – রঙ্গনায় 'তিন পয়সার পালা' নাটক হচ্ছে। ইয়ং জেনারেশন বসে আছে, নিজেদের মধ্যে গল্প করছে। কিন্তু কানটা আছে অভিনয়ের দিকে। যার যখন পালা এলো স্যাট করে গিয়ে অভিনয় করে চলে এলো। মেশিনের মতন। এটা অজিতেশবাবু তৈরি করেছিলেন। এই কনসার্ন বোধটা থাকলেই হবে। তোমার বাড়িতে একজন কেউ অসুস্থ আছে। সেটা তোমার ভেতরে থাকবে। কাজ করতে করতে হঠাৎ মনে হল আচ্ছা ওটা তো করা হয়নি। গিয়ে জিজ্ঞেস করলে – আচ্ছা ওটা করা হল কি ? এইরকম কনসার্ন থাকলেই হবে। প্রত্যেক জায়গায় সব জায়গাতেই তাই। আমি নান্দীকারের কাজ করেছি। যেমন ধরো – গেট সামলাতে হবে, লোক সামলাতে হবে। তানিস্লাভস্কি বলতেন – তুমি থিয়েটার করবে। তার জন্য আগে একটা পরিবেশ গড়ে তোল। তাই তিনি যখন 'মস্কো আর্ট থিয়েটার' (Moscow Art Theatre) নিলেন তখন তার প্রথম কাজ ছিল থিয়েটারের মেকাপ রুমের মধ্যে যথেষ্ট আলো ঢুকছে কিনা তা দেখা। কারণ জায়গাটা খুব ঠান্ডা তো, তাই স্যাঁতসেঁতে। সেই জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ। তারপর যারা অভিনয় করছে তাদের সামনে তো একটা দর্শক চাই এবং সেই দর্শকরা যাতে সাইলেন্স মেনটেন (Silence Maintain) করে তা দেখা। এরকম কাজ

আমি একাডেমির সামনে দাঁড়িয়ে করেছি। এটা ভেরি মাচ থিয়েটার (Very much Theatre)-এর কাজ। কাজ অনেক আছে। কিন্তু মনে রেখে কাজ করা। শিলং-এ অভিনয় হচ্ছে। ভয়ংকর ঠান্ডা। একজন মহিলা সহকর্মী বলল সুব্রতদা আমার কম্বল নেই। আমি দলের সবাইকে বললাম এই যে ভাই, আপনারা কিছু কিছু চাঁদা দিন তো, একটা কম্বল কিনে ওনাকে দিই। আমাদের কলিগ তো। আমরা এটুকু স্যাক্রিফাইস (Sacrifice) করবো না? এই চেতনাবোধটা থাকলে সবই হবে। থিয়েটার প্রযোজনার কাজে এই কনসার্নবোধ এবং এইসব ছোটো-খাটো দায়িত্ব পালন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিশাল : নাট্যসংগঠনের কাজে আপনার স্মরণীয় কোন অভিজ্ঞতার কথা যদি বলেন?

সুব্রত : এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল। ঘটনাটা তোমায় বলি। গোহাটিতে নান্দীকারের শো 'তিন পয়সার পালা'। ষাটের দশকের শেষদিকে। ৫০ জনের টিম। সবার মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করা থাকতো। টোটাল টিমের একজন লিডার থাকতো। আমাকেই লিডার করা হল। কলকাতা থেকে নিউ বনগাঁইগাঁও। সেখান থেকে গোহাটি। ২ টায়ার জার্নি। নিউ বনগাঁইগাঁও-তে সবাই নামলেও সেট নামানো যায়নি। অজিতদা জিজ্ঞেস করলেন 'সেট নামানো যায়নি কেন?' যে দায়িত্বে ছিলো সে বললো আমি বুঝতে পারিনি, ভেবেছিলাম অটোমেটিক (automatic) চলে আসবে। অজিতদা বললেন 'সুব্রত, তুমি দেখ তো ব্যাপারটা। 'ম্যানেজারকে বলে আমাকে কিছু পয়সাও দিয়ে দিলেন। আমি চিন্তায় পড়লাম। কী করে এই মালগুলো যাবে? তখন ছিল জুন মাস। ৫ থেকে ৬ মিনিট অন্তর বৃষ্টি হচ্ছে । বড় বড় ফোঁটা। আর মাঝে মাঝেই লোডশেডিং হচ্ছে। পকেটে চারমিনার সিগারেট রয়েছে। খাচ্ছি আর ভাবছি। সবাই বলছে গাড়ি সাইডিং-এ চলে গেছে। কী করে কী করবে? রাত ১১টা বাজলো। খাওয়া-দাওয়া নেই। হঠাৎ যেন একজন গড সেন্ট ম্যান (God sent Man) চলে এলো সেসময়। আমি পরে এটার ব্যাখ্যা করেছি এইভাবে যে, কাজ করার ইচ্ছা থাকলে এরকম মানুষ জুটে যায়। আমার ক্ষেত্রে এরকম অনেকবার হয়েছে। এরকম একজন মানুষ এসে হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করল কী হয়েছে ? আমি হিন্দি-বাংলা মিশিয়ে তাকে আমার সমস্যা বলতে সে ষ্টেশনে একটা ঘুমন্ত লোককে দেখিয়ে বলল ওকে যদি ডাকতে পারেন তাহলে আপনার কাজ হয়ে যাবে। সে কুলিদের সর্দার। তাকে ঘুম থেকে তুললাম। তাকে তুলে হিন্দি-বাংলা মিশিয়ে আমার সমস্যার কথা জানালাম। সে বলল ৫০ টাকা লাগবে। তাকে ৫০ টাকা দিলাম। সে গিয়ে অন্য কুলিদের লাথি মেরে তুলল। আমাকে জিজ্ঞেস করল তোমাদের মালপত্র চিনতে পারবেন? বললাম হ্যাঁ। তিনি বললেন চলুন। গাড়ি সাইডিং-এ চলে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে সে লক ভাঙল। তারপর একের পর এক মাল বের করছে আর আমরা দেখছি। সে ততক্ষণে আমাদের বিশ্বাস করে নিয়েছে যে এরা সত্যিই খুব বিপদে পড়েছে। আমরা আমাদের মালপত্র চিনতে পারলাম। মাল নামানো হল। লোকটি বলল রাত ২ টো ৫০ মিনিটে ট্রেন আছে। সকালে গোহাটি পৌছবে। পালার

সেটটা ছিল বিশাল বড়। আনরিজার্ভড কমপার্টমেন্ট (Unreserved compartment)-এ শুয়ে পরের দিন গোহাটি পৌঁছলাম। ষ্টেশনে অজিতদা, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত দাঁড়িয়ে আছেন। সেট না পৌছলে তো অভিনয় হবে না। আমার মধ্যে এরকম কাজ করার ইচ্ছাটা ছিল। কাজে কখনো ফাঁকি দিইনি।

বিশাল : ভবিষ্যতের তরুণ প্রজন্মের নাট্যসংগঠকদের কাছে আপনি কী আপনার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত কোন মতামত, দর্শন বা বার্তা দিতে চান?

সুব্রত : আমি দেখেছি যে এখন কাজের ধারাটা পাল্টেছে। যেমন এখন আমার সাথে অনেকের মেলে না। বিশ্বাস করো। এখন আমি বয়সের কারণে আগের মতো দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারি না। কিন্তু আমি গিয়ে বসে থাকতে পারি। এখন আমি কী কাজ করি জান? দুদিন টিকিট কাউন্টারে বসে কিছু টিকিট বিক্রি করে দিলাম। এতে দলের কিছু টাকা বাড়লো। কখনোও ১০টা টিকিট কিনে দলের কর্মচারীদের কাছে গিয়ে তাদের দিয়ে বলি - আপনাদের যদি গেস্ট আসে তাহলে এটাতে বসিয়ে দেবেন। এইভাবে নানারকমভাবে কাজ করা যায়। তুমি কতটা করবে? আমি জানি না এখন মানুষের কাজ করার ইচ্ছা কতটা জেনুইন (genuine) আছে। তুমি বাড়ির জন্য যতটা কর, যতটা ভাব, দলের জন্য তার ৫০ শতাংশ হলেই হবে। বাড়ির জন্য যে কনসার্ন থেকে কাজ কর দলের জন্য যদি সেই কনসার্ন থাকে তাহলেই হবে। এছাড়া আর কিছু দরকার নেই। আর হার্ড ওয়ার্কের কোনো বিকল্প নেই। এখন যুগটা পালটে গেছে। কেউ পরিশ্রম করতে চায় না। কাকে বলব? এর এটা ভালো, ওর ওটা ভালো, অমুখ ভালো, তমুখ ভালো অনেক শুনেছি। কিন্তু মনে ধরার মতো কাউকে পাইনি। হয়তো আছে। তোমাদের জেনারেশন (Generation)-কে আমি একেবারে নেগলেক্ট (Neglect) করব না। কিন্তু সামহাউ (somehow) আমার নজরে পড়েনি।

যারা কাজ করতে চায় তাদের উদ্দেশে একটাই কথা বলবার আছে। প্রত্যেকে নিজের নিজের দায়িত্বটা ঠিকমতো পালন করে যাও। ধরো তোমার সন্তান আছে। সে এধার ওধার করছে। কী হয়েছে? সে এরকম করছে কেন? তুমি তো তার জন্য কনসার্নবোধ করো। সেই কনসার্নটা তোমার কাজের প্রতি থাকলেই হবে।

আমাদের দেশে তো চোর-ছ্যাঁচড়ের অভাব নেই। দেশটা কি করে বেঁচে গেলো বলতো? এই যে রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম - এদের ওপর কেউ হাত দেয় না, কারণ এরা কাজটা করে যায়। 'রামচন্দ্র গুহ'-র একটা বই আছে 'India After Gandhi'। পড়ে দেখো। এদেশকে যখন ব্রিটিশরা ছাড়ে তখন ৫৫৫-টা স্বশাসিত রাজা-টাজা ছিল। তখন পৃথিবীর সমস্ত পন্ডিতরা বলেছিল ব্রিটিশরা চলে যাচ্ছে, দুদিন পরেই তো ইন্ডিয়া শেষ হয়ে যাবে। রাজারা স্বাধীনতা ঘোষণা করবে, নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি করে শেষ হয়ে যাবে। ৬৮ বছর হল। দেশটা তো চলছে। সারা পৃথিবীর লক্ষ্য এখন ইন্ডিয়ান ডেমোক্রেসি ('Indian Democracy)' বেঁচে আছে কী করে? এটা সমাজতাত্ত্বিকদের গবেষণার বিষয়। ৩৯

বছর বয়সের একটা বাচ্ছা ছেলে বিবেকানন্দ এমন একটা মিশন তৈরি করে গেছে যা সারা পৃথিবীতে মান্যতা পায়। আই ফিল প্রাউড দ্যাট আই অ্যাম অ্যান ইন্ডিয়ান (I feel proud that I am an Indian)। কনসার্নবোধ থাকতেই হবে। আমি নান্দীকার বলতে প্রাউড (Proud) বোধ করি। এখনো নান্দীকারে গেলেই মনে হয় এ কাজটুকু করে দিই। রুদ্রদা বলে সুব্রত দেখো তো একটু গেটটা। যেটা আমি পারবো। আমার বাড়ি, আমি করবো না? তোমাকে নিজের কাজটা করে যেতেই হবে। তোমাকে অনেক কিছু করতে হবে না। তোমার ওপর নেই ভুবনের ভার। তুমি একজন অন্ধকে রাস্তা পার করে দাও না। একজন বুড়ো লোককে একদিন বাসের একটা সিট ছেড়ে দাও। এটাই যথেষ্ট। তুমি সারা দেশের পারবে না। এতবড় সংখ্যার জনসাধারণ। তুমি করবে কী? বড় কথা বলে, সমালোচনা করে লাভ নেই। লোকে কী করলো দেখ না। তুমি নিজে যেটুকু পারো করে দিয়ে দাও। তাহলেই হবে। নিজের দায়িত্বটা পালন করতেই হবে।

বিশাল : আপনার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু অভিজ্ঞতা এবং কিছু স্মরণীয় মুহূর্তের কথা আমাকে জানানোর জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ।

মুখোমুখি আলোক পরিকল্পনা শিল্পী : বাদল দাস

সুদীপ্ত বেতাল

সুদীপ্ত : নাটকে অভিনয় করতে লোকজন আসে, সাধারণভাবে নাট্যকার অভিনেতারা প্রচারের আলোয় আসে, তারাই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আলোক পরিকল্পনা শিল্পীরা অনেকটাই নেপথ্যে থেকে যায়। এমন নেপথ্যের শিল্প নির্বাচন করলেন কেন?

বাদল : একটা গল্প বলি, আমি তখন কিছুই করতাম না সেভাবে। এখানে আলোকশিল্পী অমল রায় ছিলেন, উনি আলো করতেন। উনি আমায় একদিন নিয়ে গেলেন ডায়মন্ডহারবারে (একটু স্মরণ করে) "বিদ্যাপতি জয়দেব" হয়েছিল। আমি কিছুই জানি না তখন। ঐ পড়াশোনাতে নেগেটিভ পজিটিভ আলো-তালো কীভাবে জ্বলে এটুকুই জানতাম। তা মাঠের মাঝখানে মঞ্চ করে "বিদ্যাপতি জয়দেব" যাত্রা শুরু হল। আমাকে মঞ্চের এক দিকে দাঁড় করিয়ে বলল; এইভাবে আলো ছোট হবে এইভাবে বড় হবে। এইভাবে রঙটা দে, ওখানে দে - এখানে দে। ডায়মন্ডহারবারে ভারত সেবা সংঘের মাঠে যাদের বাড়ির পেছনে অনুষ্ঠান হয়েছিল সেখানে একটা বেঞ্চে বসে অমলদা আমায় জিজ্ঞেস করল, সব বুঝলে তো? ওখানে বাড়ির মেয়েরা ছিল(অসম্পূর্ণ ও কিছুটা থেমে), ওইভাবেই কীভাবে কী রঙ দেবো সেদিনই মজা লেগে গেল। তখনও পরদিন বাড়ি ফিরে ভাবছি। উনি পরে আবার আমায় বললেন – কীভাবে করলে? কেমন লাগল? বললাম, ভালই তো লাগল। তখন উনি বললেন – এটাই তোমার ভবিষ্যৎ। এইভাবেই ভালো লাগাটা শুরু হল। এইভাবেই অমলদা আমায় ধরে নিয়ে নান্দীকারে নিয়ে চলে গেল। নান্দীকারের তখন রঙ্গালয়ে কাজ হচ্ছে। তখনই হেল্পার হিসেবে যোগ দিলাম নান্দীকারে। রুদ্রদা তখনও ছিলেন এখনও আছেন। আমাকে ওরা বলল, নান্দীকারে কাজ করবে মাস গেলে একটা মাইনে দেবো। ততদিনে একটা আমার ভালোলাগা তৈরি হয়েছে। এত বড় মানুষ, আর বিষয়টা এত ভালো। দীর্ঘদিন আমি নান্দীকারের মেম্বার হয়ে গেলাম। তখন কাজ করার চাহিদা বেড়ে যায়। মনে হল, বাইরেও কিছু কাজ করি। এই করতে করতে আমি একদিন আলোক-শিল্পী হয়ে গেলাম (আবেগের সঙ্গে বলেন)। ঐ অনেকে বলে, অভিনয় করে অনেক কিছু পেয়েছি। আমার তো মনে হয় আমি তার থেকেও অনেক বেশি পেয়েছি (জোর গলায় বলেন)। আমি এতদিন নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে গেছি। কোনারকমভাবে আমি কাজে ফাঁকিবাজি বা গাফিলতি দেইনি। রুদ্রদা অজিতেশদা আমায় বলেন, তুমি এ জায়গায় ভালো করে কাজ করো অনেক কিছু পাবে। অভিনয় করে অনেকে সামনে চলে আসে, কিন্তু আমি ওদের থেকে আরও আরও অনেক বেশি পেয়েছি, আমার এটুকুই বিশ্বাস। '৭৩-র নভেম্বরে শুরু করেছি। আজ চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছর অতিক্রান্ত, আমার একটুকুও আক্ষেপ নেই। আমি এই জায়গাটায় হ্যাপি।

সুদীপ্ত : বাংলা থিয়েটারে যে ধারাবাহিক পরিবর্তন হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে উন্নতি হচ্ছে, আলো ব্যাবহারের ক্ষেত্রে কী বাংলা থিয়েটারে উপযুক্ত ক্ষেত্র আছে?

বাদল : তুমি বলেছ, থিয়েটারের পরিবর্তন হচ্ছে, তাছাড়া থিয়েটার তো থিয়েটারই (জোর দিয়ে)। সেখানে একসময় খুব অল্প আলোতে কাজ হয়েছে। তারকদা পুতুলখেলাতে খুব অল্প আলোতে কাজ করে। তখনতো এতো আলো নেই, প্রযুক্তির বিশাল ব্যাপারটা ছিল না। তখন ওই অল্প আলোতেই অসাধরণ অসাধারণ কাজ হয়েছে। এলা–অতীনের দৃশ্য সেই জায়গাটা ধরো, গোধূলি আলো, তখনতো এতো আলোক প্রযুক্তি ছিল না! একটা সময়তো মোমবাতি জ্বালিয়ে কাজ হয়েছে, হ্যাজাক জ্বালিয়ে কাজ হয়েছে। মশাল জ্বালিয়ে কাজ হয়েছে আমরা জানি। আগে তো দিনের বেলায় কাজ হতো আস্তে আস্তে রাতের বেলায় গেল। আগে তো পাহাড় কেটে নাটক হতো। তারপর স্টেজ ও পরে প্রসেনিয়াম এল। থিয়েটার মঞ্চ তৈরি হল। তারপর গ্যাস আলো চলে এল, এই সময় প্রচুর মঞ্চ পুড়ে গেছে। নাটক শেষ হলে গ্যাসলাইট নিভিয়ে দেওয়া হতো। সত্যিই তো, ওইগুলো ইতিহাসে দাগ কেটেছে, ওগুলো তো আর ফ্যালনা নয়। আজ যতই প্রযুক্তির উন্নতি হোক, আলাদা করে কিছু বলতে পারবো না। হ্যাঁ, এটা ঠিক দেখার ঢঙ পাল্টে গেছে। ঢঙটা পাল্টে দেওয়া হয়েছে, পাল্টে যায়নি। অতীতে দুটো–তিনটে আলো নিয়ে মারাত্মক কাজ হয়েছে। সেখানেও প্রযুক্তির নানা দিক দিয়ে আলো এসে পড়েছে। কিন্তু, প্রেম তো প্রেমই। সেটা দর্শকের মনে খুঁজে দিতে হবে। দর্শক যাতে টানটানভাবে বুঝতে পারে। সেই জায়গাটায় প্রযুক্তি কতটা দিতে পারবে আমি জানি না।

সুদীপ্ত : মঞ্চে আলোক ব্যাবহারের ক্ষেত্রে একজন আলোক পরিকল্পনা শিল্পী তার চিন্তার স্তরগুলো কীভাবে সার্থক উপায়ে প্রয়োগ করতে পারে।

বাদল : তুমি নাটকটা পড়লে, রিয়ার্সাল দেখলে, কাজ করতে শুরু করলে। কিন্তু, তাতে যে নির্দেশক, ডিরেক্টার বা নাট্যকার তাকে ভাবাবে কীভাবে আলোটা পড়বে, সে আমি বাদল হই বা রাম শ্যাম যদু মধু হই। আলোক শিল্পীকে নির্দেশককে ভাবাতেই হবে। তা হলেই তার ভাবনার জায়গাগুলো খুলে যাবে। আলোক শিল্পীর ভাবনা ও নির্দেশকের ভাবনা মিশে গিয়ে তখনই একটা কাজ তৈরি হবে। অনেক লাল নীল হলুদ আলো জ্বালিয়ে দিলাম, তারপর আমি নিজেই প্রশ্ন তুলছি – কেন আমি জ্বালাচ্ছি? এরকম অনেক ঘটনা আছে। তখন অজিতদারা নান্দীকারে "শের আফগান" করত। একটা দৃশ্য ছিল; ক্যান্ডেল স্ট্যান্ড অজিতদার সামনে রাখা থাকবে, তাতে অনেকগুলো ক্যান্ডেল জ্বলবে। আর শেষ লাইটটা ও ফুট লাইটটা অজিতদাকে ফোকাস করত। একদিন আমার ভাবনা থেকেই ফুট লাইটগুলো সামনে এসে রাখলুম এবং রঙ করা শুরু করলাম। ওপরের রঙের সঙ্গে এই রঙ মিশে গেল। আমার ভাবনা থেকেই ওই রঙের সঙ্গে এই রঙ মিশে গিয়ে একটা সৃষ্টি হয়। বেশ কয়েকটা এমন শো করেছি। অজিতেশ

বন্দ্যোপাধ্যায়ের (ভালো রকম হেসে) নর্থবেঙ্গলে একটা জায়গায় ডবল শো ছিল। রাধারমন তপাদার (রাধুদা) আমাকে এসে বলল; দাদা তোমায় ডাকছে, গেলাম, চেয়ারে বসে আমায় বলল – 'তুমি যে আলোটা করছো, বুঝে করছো? 'আমি হতভম্ব হয়ে একটা দৃশ্যে মোমবাতি হেনাতেনা টেনে বলছি। আমাকে উনি বললেন – ওই যে ওরা কতগুলো মোমবাতি রেখে দিয়ে গেল, ওরা পাশে গিয়ে মজা দেখছে, সব আলো নিভিয়ে দিয়েছে; ওই আলোটা তোমায় বুঝতে হবে। কথাটা আমাকে পেরেকের মতো গেঁথে দিল। তাই যা কর তোমায় বুঝে করতে হবে, গভীর মানে থাকবে।

সুদীপ্ত : এই জায়গা থেকে একটা প্রশ্ন করি। আপনাদের আলোক শিল্পীদের স্বাধীনতা থাকে নাকি সবটাই নির্দেশকের নির্দেশ মেনে চলতে হয়?

বাদল : হ্যাঁ, স্বাধীনতা তো থাকেই। আমাকে কেউ কনদিন ডিস্টার্ভ করেনি। আমি এতো বছর কাজ করেছি ফুল স্বাধীনতায়। বিভাসদা খুব বড় মাপের শিল্পী, ওনার মতো থিয়েটারে পুরো মঞ্চ কেউ ব্যাবহার করতে পারেনি। ওনার সঙ্গে যতগুলো কাজ করেছি উনি আমায় বাধা দেয়নি। আমি কাজ করে যাচ্ছি উনি শুধু ডেকে বলতেন – শোন বাদল, এই জায়গাটায় এইভাবে একটু কাজ কর তো। আবার পাশাপাশি মেঘনাদার সঙ্গে কাজ করেছি উনি আমায় কিছুই বলেননি, স্বাধীনতা দিয়েছেন। যার সঙ্গেই কাজ করেছি তিনি কিছু না কিছু আমায় ভাবিয়েছেন। ধরো থিয়েট্রনের সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় বলতো – ওখানে একটা আলো দাও, ওই রঙটা দিয়ে দৃশ্যটা করো। আমার গল্পের সঙ্গে এই জায়গাটায় ভাবো। আমি আবার রঙ পাল্টালাম, অনেক এঙ্গেল ঘোরালাম। সলিল বলল- হ্যাঁ বাদল হ্যাঁ এই তো হয়েছে (উল্লাসে)। এইভাবে দুজনের বোঝাপড়াটা অত্যন্ত জরুরি। টোটাল টিমটার সঙ্গে আলোক শিল্পীর যোগ আছে। যেমন ধরো একজন খুব ফর্সা একজন খুব কালো। যদি একই আলো জ্বালাই একজনের মুখ দেখা যাবে একজনের যাবে না (হেসে)। সেক্ষেত্রে তুমি কি করবে যাকে দেখা যাচ্ছে না, তাকে বেশি আলো দেবে। ওথেলো নাটকে এমন একটা দৃশ্য ছিল, রাত্রিবেলা একজন খুন করতে আসবে মোমবাতি নিয়ে এক ভয়ঙ্কর সুন্দরী মহিলা। সেখানে তুমি একটা নীল লাল সবুজ আলো দিয়ে দাও হবে না। মোমবাতি আছে এই ক্ষীণ জিনিসটা বোঝাতে হবে। এইগুলোতো ভাবনার মধ্যে নেই। যে এই কাজটা করেছে সেই দেখেছে। ক্যামেরা কি? ক্যামেরায় যেটা ধরা হয় সেটা দর্শক দেখতে পায়। এই ক্ষেত্রে আমরা ক্যামেরা হয়ে দেখি এবং আমদের মনকে বলি, এটা কর ওটা কর, ঐ রঙটা দে। এখন পর্যন্ত যাদের সঙ্গে কাজ করেছি কোনদিন বাধার সম্মুখীন হইনি।

সুদীপ্ত : বিভিন্ন পরিচালকের সঙ্গে আপনার কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে তার মধ্যে কোন্ আলোর পরিকল্পনা আপনার কাছে স্মরণীয় কাজ বলে মনে হয়?

বাদল : (অনেকটাই হেসে) এত কাজ করেছি কোন্‌টা বাছবো, কোন্‌টাকে সেরা বলব। 'অসঙ্গতি' বলে একটা নাটক করেছিলাম। হইচই পড়ে গিয়েছিল। এত আলো লোকে একেবারে সাংঘাতিকভাবে নিয়েছিল। তারপরে কত আলো করেছি। চারশোর ওপরে আলো করেছি, কীভাবে বলবো কোনটা সেরা! আমার সবথেকে ভালো লাগে এটাই লোকে বুঝতে পারে এটা বাদলের ঘরানা। আমি জানি এই আলোটার সঙ্গে এই আলোই মিশবে। তাই এটা আমি... (অসম্পূর্ণ)

সুদীপ্ত : থার্ড থিয়েটারে আলোক পরিকল্পনা শিল্পীদের ততটা প্রয়োজন হয় না। আপনি থার্ড থিয়েটারের আলোকে কীভাবে দেখেন বা এর কোনো বিকল্প ব্যবস্থা বা পরিকল্পনা ভাবা যেতে পারে কী?

বাদল : না, এটা তোমার ভুল, সবাই বলে আলোর প্রয়োজন নেই। আরে দিনের আলোটাও তো আলো। সূর্যের আলো একটা আলো। আফটার ডার্কনেস এরপর যে আলোটা সকালে দেখা যায় সেটা লাল। আস্তে আস্তে এই আলোটা তুমি কীভাবে আনবে? এখানেই হল মঞ্চে আলোক শিল্পীদের কাজ। সব জায়গাতেই আলোর প্রয়োজনীয়তা আছে। সেটা দিনের আলো হোক, সার্চ লাইট হোক। আলো না হলে তো সেই ডার্কেই চলে গেল। তুমি অন্ধকারের মধ্যে হালকা নীল আলো দিলে। আলো চাই, না হলে কিছুই হবে না।

সুদীপ্ত : আপনার কী মনে হয় বাংলা থিয়েটারে আলোক পরিকল্পনা শিল্পীরা বা আলোক প্রক্ষেপণ শিল্পীরা উপযুক্ত সম্মান পান?

বাদল : এটা খুবই কঠিন প্রশ্ন এবং বিতর্কিত প্রশ্ন। কেউ কেউ পায়, এটা কী করে বলবো বল তো! যারা অফিস কাছারিতে কাজ করে কেউ চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা মাইনে পায় আবার কেউ দশ হাজার টাকা মাইনে পায়, এই বিভাজন আছে। নাটকেও আছে তেমনি। এটা কোনোদিনই পরিবর্তন করা সম্ভব নয় (জোর দিয়ে)। তাই নিজেকে যে যেমনভাবে তৈরি করবে সে তার সম্মান পাবে। আজ আমি ফাঁকি দিইনি বলে তুমি আজ আমার কাছে এসেছ। সত্যিই আমি যদি সেদিন ফাঁকি দিতাম, তাহলে তোমাদের পেতাম না। যে কোনো কাজই হোক না, তুমি নিষ্ঠার সঙ্গে কর তাহলে তুমি সাফল্য পাবে।

সুদীপ্ত : শিল্পীর একটা সৃষ্টির জগৎ থাকে আর থাকে একটা সাংসারিক জগৎ, একজন আলোক পরিকল্পনার শিল্পী হিসেবে জীবনের এই টানাপোড়েনের অভিজ্ঞতা আপনার কেমন?

বাদল : আমি সকালে যখন ঘুম থেকে উঠি এবং রাত্রে যখন ঘুমোতে যাই, আমি থিয়েটারের বাইরে কিছুই জানি না। একদমই কিছুই জানি না। একসময় হত ঘুম থেকে উঠে নান্দীকারে যেতাম, শুধু তাই নয় নান্দীকারের ঘরেই শুয়ে পড়তাম। এবার বলছি সংসারটা কীভাবে ম্যানেজ করি।

আমার বাবা কোনদিনই নাটক করতে বারণ করেনি, আমাকে উৎসাহ দিয়েছে, বলেছে নাটকে যে টাকা পেতাম সংসারে না দিয়ে ঐ টাকা দিয়ে আলো কিনে থিয়েটার কর। এখনও আমার পরিবার নিয়ে কোন অসুবিধা নেই। আমার ছেলেপুলেও কাজবাজ করে। আমাদের প্রতিদিন ভোরবেলা চারটা সাড়ে চারটাতে ওঠা চাই। সকাল নটায় আবার খেয়ে থিয়েটারে চলে আসি। রাতে কাজকর্ম সেরে ন'টার দিকে বাড়ি ফিরি। যখন রাতে যাই তখন সংসারের জন্য কিছু কিনে নিয়ে যাই, এখন সংসারের কিছু কাজকর্ম করি (হেসে)।

সুদীপ্ত : একজন উপযুক্ত আলোক পরিকল্পনা শিল্পী হয়ে ওঠার জন্য প্রশিক্ষণের প্রক্রিয়াটি কীরকম?

বাদল : প্র্যাক্টিক্যালি ওদের শিখতে হবে, হাতেকলমে ওদের পুরো বিষয়টা বুঝতে হবে। অনেক নাটক আছে যেগুলো ওদের দেখতে হবে। শুধু বই পড়ে এই কাজ হবে না। কাজ করতে করতে এইগুলো শিখতে হবে। বিভাসদা রুদ্রদা আমাকে এইভাবেই শিখিয়েছে। শম্ভু মিত্রের "চার অধ্যায়" নাটকে আমি কাজ করেছি। একাশি সালে আমার ডাক পড়েছিল রামকৃষ্ণ মিশনের হয়ে, ওদেরকেও এক লাখ টাকা দিয়েছিল অনুষ্ঠান করার জন্য। তাপসদার ডিজাইন করা মঞ্চে আমার ডাক পড়েছিল। আমায় নিয়ে গিয়েছিলেন সুব্রত পাল। শম্ভুদা (শম্ভু মিত্র) বললো তাপসদা প্ল্যান করে রেখেছে তুমি শুধু কাজটা করবে। দুটো রিয়ারসেলে তুমি কাজটা শিখে নাও, রমা(রমাপ্রসাদ বণিক) তোমার পাশে থাকবে। একটা কাগজ নিয়ে এসে বসে আঁকলো সেই স্টেজ, দৃশ্য অনুযায়ী কীভাবে স্টেজে আলো লাগাবো সেটা বলতে লাগল। ঐসময় আমার প্রচুর মনে থাকত। যে কোনো নাটক একবার দেখলে মুখস্থ রাখতে পারতাম। "চার অধ্যায়" নাটকে সঙ্গে একজায়গায় এলা-অতীনের দৃশ্যে ডেকের উপর বসে আলোর কাজটা আজও মনে পড়ে। ছোটো বড়ো মিশিয়ে আলোর কাজটা আমি বেশি পছন্দ করি। আমি সবসময় মঞ্চ দেখে কাজ করি। এক জায়গায় একসময় দেখলাম আলোটা ছোট হয়ে আসছে, আস্তে আস্তে দেখলাম কেউ একজন টুলের ওপর দাঁড়িয়ে এলা-অতীনের ওপর আলোটা ছোটো করছে। শম্ভুদা হটাৎ করে বললো এইতো বাদল- এটাই চাই (উৎসাহে)। গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, এইভাবেই আমি লোকগুলোর কাছ থেকে কাজ শিখেছি। আমি কোনদিনই ফাঁকি দিইনি কাজটা সত্যিই সিরিয়াসলি করেছি। হাত ধরে কাজ শিখেছি। ঐ নাটকে কী অ্যাক্টিং (উৎসাহে), নাটকে কিছু সামনের ফুটের আলো ছিল। শম্ভু মিত্রের গ্যালিলিও-গ্যালিলাই একাশি সালে ঐ নাটকেও আলোর কাজটা বেশ মনে পড়ে। তখন নান্দীকার করি। নান্দীকার থেকে আলোগুলো নিয়ে আসতাম। আমার নিজের কোন আলো ছিল না। আমার নিজস্ব আলো অনেক পরে কিছু কিছু শো করি টাকা পাই আর কিনি। একদিন গ্যালিলিওর জীবন আকাদেমিতে ছিল। সেই নাটকে সৌরকলঙ্কের একটা দৃশ্য ছিল। শম্ভুদা আমায় বললেন – দেখো বাদল, অনেক সায়েন্সের ছাত্র আসবে, তাই সৌরকলঙ্ক কী? সেটা সবাইকে বুঝতে হবে। এখনই লাইব্রেরিতে যাও, এ নিয়ে পড়াশোনা কর। সেদিনে শুধু এ নিয়েই আলোচনা

হল। আমি অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করলাম, কীভাবে সৌরকলঙ্কটাকে বোঝানো যায় এবং প্রোজেক্টারে কীভাবে নামানো যায় ভাবছি। পরের দিন সব বই টই নিয়ে গেলাম এবং হাতে নাতে পরীক্ষা করে কীভাবে সৌরকলঙ্কটা নামানো যায় সারাদিন ধরে পায়চারি করতে করতে ঘরে ভাবছি। পরের দিন অনেকে বলল - কিরে কিছু করেছিস, না হলে শম্ভুদা'রা চেঁচামিচি করবে। ওই দৃশ্যটা আসার পরে সেদিনে ঠিক হয়নি। শম্ভুদা সেদিন আমায় বোঝালো, এই জিনিসটা এইভাবে কর। ওই জিনিসটাই আমার চাহিদা। এটা তাপসদার করার কথা, কনিষ্ক সেনের করার কথা। কিন্তু, ভাবিনি কে করবে? এইভাবেই হাতে নাতে পরীক্ষার দ্বারা শিখেছি। আবার ওই নাটকে আছে, জলের মধ্যে বরফ ভেসে ওঠে; ওটাও আমি করেছি। আর রাত্রিবেলায় যখন কেউ না থাকে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। পায়চারি করতে করতে ভাবি আমি এটা করেছি। এখন ৬৭–৬৮ বছর বয়স, এখনও বেশ মনে পরে আমি এ কাজটা করেছি।

সুদীপ্ত : নাট্য সংস্কৃতির পরিবর্তন হচ্ছে। থিয়েটার সবসময়ই পরিবর্তনশীল। আলোক ভাবনাতেও পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সমন্বয় করার জন্য তরুণ প্রজন্মের আলোক পরিকল্পনা শিল্পীদের কীভাবে চিন্তা করা উচিত বলে আপনার মনে হয়।

বাদল : ওরা তো কাজ করছে, অনেক নতুন নতুন ছেলেমেয়ে আসছে। অনেকে অনেক নতুন নতুন আলো নিয়ে কাজ করছে। ওদের বলার কিছু নেই।

সুদীপ্ত : বিদেশে থিয়েটারে আলোকসজ্জা নির্মাণের ক্ষেত্রে যে নানান ধরনের আধুনিক যন্ত্রপাতির সহায়তা গ্রহণ করা হয়, তা আমাদের দেশের থিয়েটারের পক্ষে যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ। এখানে হাতের কারসাজিই কী ভরসা? এক্ষেত্রে আপনার বিশেষ কর্মপদ্ধতিগুলো যদি জানান।

বাদল : কোনো পার্থক্য নেই। ওখানে যেই আলো, এখানেও সেই আলো। ওখানেও কম্পিউটার এখানেও কম্পিউটার। সবই এক। আমি বহুবার বিদেশে গিয়েছি। কিন্তু, সত্যিই আমাদের লজ্জা করে (জোর গলায়), আমরা এখানে একবার দুইবার আলো নামাতে ওঠাতে গিয়ে যেন কত পরিশ্রম করে ফেলি। কিন্তু ওখানে নাটকের শুরু থেকে শেষ তুমি যতবার বলবে ওরা ততবার আলো নিয়ে নাড়াচাড়া করবে। ওদের এ্যানার্জি দেখে আমাদের শেখা উচিত। মূল কথা দর্শককে বোঝাতে হবে। একটা দৃশ্য ধরো, সকাল না বিকেল কী করে বোঝাবে? ওই আলোর দ্বারাই, তারপর সংলাপ। বোঝানটাই আসল।

সুদীপ্ত : আলোকসজ্জা নির্মাণের কাজে একজন শিল্পীর অন্তরায়গুলি কী কী?

বাদল : মঞ্চ, ইকুপমেন্টস যেগুলি আমরা ব্যবহার করি, কেউ যদি তাকে সারাক্ষণ বিরক্ত করে বলে এটা কর ওটা কর, তখন সে কাজটা ভালোভাবে করতে পারে না। এমনকি, এমন একটা নির্দেশকের পাল্লায় পড়ে গেলে, যে নির্দেশ দিয়ে গেলো, কোনো কিছু ভাবালো না, কাজ হবে

না। একজন নির্দেশকেরও সবটা জানা দরকার। আলোক শিল্পীদের ভাবাতে হয়, যদি না নির্দেশক জানে, সে তাহলে ভাবাবে কী করে? তা হলে কাজটা ঠিক হবে না।

সুদীপ্ত : ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আলোকসজ্জা নির্মাণকারী শিল্পীদেরকে আপনি কী আপনার জীবন অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত কোনো নির্দেশ, আদর্শ, মতামত বা দর্শন বা বার্তা দিতে চান?

বাদল : একটা জিনিসই বলতে চাই, চোখ-কান-নাক-মাথা সবই রিলেটেড, চোখের ওপর চাপ পড়লে মাথা যন্ত্রণা করে, তাই বলি, অভিনয়টা দেখো, অভিনয়ের মুখটা দেখার চেষ্টা করো। ওখানে ফোকাস করো নিজেকে। তুমি দর্শককে বিশ্বাস করাও, এটা প্রেমের দৃশ্য চলছে। এটা একটা আলোক পরিকল্পনা শিল্পীর কাজ।

সুদীপ্ত : এত পরিচালকের সঙ্গে কাজ করে আপনার অভিনয় করতে ইচ্ছা হয়নি?

বাদল : না, সেইভাবে আমার ইচ্ছা হয়নি। কিন্তু খেলার ছলে একবার আমি অভিনয় করবো ভাবলাম। সীমাদির দলে একবার নেমেছিলাম এবং দু-একটার দলেও আমি নেমেছিলাম। কিন্তু সেইভাবে আমি অভিনয় করবো কোনোদিনই ইচ্ছা হয়নি।

সুদীপ্ত : একজন আলোক শিল্পী হিসাবে আমি জিজ্ঞেস করছি আপনি যদি বলেন, আপনার শ্রেষ্ঠ রঙ কী?

বাদল : প্রাইমারি কালার তো তিনটে - রেড, ব্লু আর গ্রীন। এই তিনটে রঙের থেকে সাতটা রঙের তৈরি হয়। আর যদি আমার পছন্দের রঙ বলতে বলো, একদম লাল (জোর গলায়)। লালটাই আমি সব জায়গায় পছন্দ করি। লাল, নানা রঙের মানুষ, নানা জায়গায় ব্যবহার করেছে। কেউ লালকে বিপ্লবে, কেউ আগুনে ব্যবহার করে। আসলে লাল হচ্ছে সিম্বল অফ হার্ট।

অধ্যাপক কাননবিহারী গোস্বামীর সাক্ষাৎকার

প্রসেনজিৎ নায়েক

প্রশ্ন : বৈষ্ণব সাধন প্রণালী চর্যাপদের সহজিয়া সাধনতত্ত্ব দ্বারা কতটা প্রভাবিত, নাকি প্রভাবিত নয় - এ সম্পর্কে আপনার মতামত বলুন?

উত্তর : যারা নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব, মহাপ্রভুর আদর্শে যারা অনুসারী এবং বৃন্দাবনের তত্ত্ব যারা জানেন তারা কিন্তু চর্যাপদের যে সাধন প্রণালী তার দ্বারা আদৌ প্রভাবিত নয়। চর্যাপদের গানগুলি লিখেছিলেন সহজিয়া সাধকগণ এবং তারা বলেছিলেন যে — আমাদের চরম লক্ষ্য বা গুন বোধিলাভ, ভগবতজ্ঞান লাভ এবং তারপর আর কিছু থাকে না এবং সেই বোধি বাইরে কোথায় নেই, দেহের মধ্যে আছে। তাদের সাধনা দেহ সাধনা এবং তন্ত্রাচার। আমাদের দেহের বাম, ডান ও মধ্যে তিনটি নাড়ি আছে - ইরা, পিঙ্গলা, সুষুম্না। এখানে আলি, কালি, আবধূতি ইত্যাদি নাম বলা হয়েছে। বৈষ্ণবদের সাধনা দেহ সাধনা নয়। দেহ সাধনাটা এলো বাউল বৈরাগীদের মধ্যে। তারা খাঁচার ভিতর অচিন পাখির সন্ধান করেছেন। অচিন পাখি হচ্ছে শ্বাস-প্রশ্বাস। শ্বাস প্রশ্বাসকে সংযত করা। এরা আত্মায় বিশ্বাস করে না। এরা বলেন, পরম শক্তি একজন আছেন, তিনি আছেন আমাদের মনে এবং শ্বাস-প্রশ্বাস, গান ইত্যদির দ্বারা তাকে পাওয়া যায়। এখান থেকে অনেক কণ্ঠীধারী বাউল-বৈষ্ণবরা এসে গেলেন এবং তারা নাড়ি দিয়ে সাধনা করেন। গৌড়ীয় নৈষ্ঠিক সাধনায় নাড়ি দিয়ে সাধনার কথা কোথাও বলা নেই। সুতরাং সহজিয়া সাধকদের প্রভাব মহাপ্রভুর আদর্শ অনুসারী নৈষ্ঠিক সাধকদের উপর নেই।

প্রশ্ন : আমরা মঙ্গলকাব্যের ধারায় প্রথমে নারী দেবতার কথা পাই, কিন্তু পুরুষ দেবতার কথা পরবর্তী মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেখতে পাই। এর কারণ কী?

উত্তর : মঙ্গলকাব্য-ধারায় প্রাচীনতম মঙ্গলকাব্য। তারপর চণ্ডীমঙ্গল, অভয়ামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল। তো মনসামঙ্গলে চাঁদ সওদাগরের দ্বন্দ্ব প্রধান। সওদাগর শিবের উপাসক ছিলেন এবং মনসা শিবের কন্যা। শিবের আদেশে মনসাকে সপ্তডিঙ্গা উদ্ধার এবং মৃত ছয় পুত্রকে উদ্ধার করে দিতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত শঙ্করের আদেশে মনসাকে পরাজয় স্বীকার করতে হল। এরপর চণ্ডীমঙ্গলে দেখতে পাচ্ছি চণ্ডী, শাপভ্রষ্ট নীলাম্বর যে কালকেতু হয়ে জন্মেছিল তাকে অনুগ্রহ করলেন। তাহলে দেবীর অসীম শক্তি আছে। কিন্তু নায়ক হলেন পুরুষ। তুমি বল ফুল্লরার প্রাধান্য বেশি না কালকেতুর প্রাধান্য বেশি কিংবা দ্বিতীয় আখ্যানে বা বণিক খণ্ডে ধনপতি এবং শ্রীমন্তের প্রাধান্য বেশি। তারাই তো নায়ক। সেখানে লহনা, ফুল্লনার প্রাধান্য বেশি নয়। চণ্ডীর অনুগ্রহে সিংহলে চৌত্রিশা স্তব করে রাজা মুক্তি পেলেন, ফিরে এলেন। চণ্ডী নীলাম্বরকে

আখেটিক খণ্ডে আবার স্বর্গে নিয়ে গেলেন, ফুল্লরা ছিলেন ছায়া, ছায়াকে স্বর্গে নিয়ে গেলেন। শেষে দেখা গেল দুই বণিক আবার সুখে রাজত্ব করতে শুরু করলেন এবং এখানে দেখা যাচ্ছে সেই আবার পুরুষদের প্রাধান্য। এর পর ধর্মমঙ্গল। ধর্ম হলেন বিষ্ণু। যমের আর এক নাম ধর্ম। বিষ্ণু নারায়ণ শিলা যেমন গোলাকার, ধর্ম শিলাও অনেক জায়গায় গোলাকার। আর একটা প্রতীক হচ্ছে কূর্ম বা কচ্ছপ। কূর্ম হল বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার। প্রথম অবতার হচ্ছে মৎস্য। জয়দেবের স্তোত্রে আছে - 'কেশব ধৃত মীন ও শরীরর জয় জয় দৃশ হরে'। কূর্মের পিঠের ওপর পৃথিবী বসে আছে। এছাড়াও নানা রকম লৌকিক দেবতার প্রভাব এখানে পড়েছে। তাহলে পৌরাণিক প্রভাব, লৌকিক প্রভাব যুক্ত হয়ে ধর্ম একজন মিশ্র দেবতারূপে সৃষ্টি হয়েছে। এখানে লাউসেন হয়েছে নায়ক। কিন্তু রঞ্জাবতীর সাধনার ফলে লাউসেনের জন্ম হয়েছিল এবং যুদ্ধে অসীম সাহস দেখিয়েছিলেন লখাই ডোম্বী। কালিদহে পাড়ি দিয়েছে লখাই ডোম্বী এবং মা ছেলেকে বলছে তুই যদি তোর মায়ের দুধ খেয়ে থাকিস তুই রণক্ষেত্র থেকে হঠবি না।

প্রশ্ন : প্রথম মহিলা জীবনীকাব্য হিসেবে লোকনাথ দাসের লেখা 'সিতা চরিত্র' পুথিটির গুরুত্ব কতখানি?

উত্তর : সিতা অদ্বৈতাচার্যের দুই পত্নীর অন্যতমা। আর একজন সংসার করতেন। সিতা কিন্তু এই সমস্ত যে বৈষ্ণব সম্মেলন সেখানে উপস্থিত থাকতেন। জাহ্নবা দেবীর তিনি সখি ছিলেন। জাহ্নবা দেবী নিত্যানন্দ প্রভুর দ্বিতীয়া পত্নী। সিতা দেবীর পুত্র অচ্যুতানন্দ এবং চৈতন্য পরবর্তী যুগে অচ্যুতানন্দ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের একজন প্রধান নেতা। অচ্যুতানন্দের জননীরূপে সিতার একটা প্রাধান্য আছে। আর সিতার কিছু গোপন সাধন পদ্ধতি ছিল। যেমন পুরুষ হয়েও নিজেকে নারী রূপে সাধনা করতে পারতেন। তার দু'জন জাঙ্গলি, নন্দিনী নামে অনুচর ছিল। তার জীবনী অবলম্বন করে দুটি জীবনীকাব্য লেখা হয়েছে- 'সিতা গুন কদম্ব', 'সিতা চরিত্র'। সিতা চরিত্র লোকনাথ দাসের লেখা। এছাড়াও ঈশান নগরে ‘অদ্বৈত প্রকাশ’ নামে একটি বই আছে - সেখানে অদ্বৈতাচার্যের কথা প্রসঙ্গে সিতা দেবীর কথা বার বার এসেছে। সুতরাং ‘অদ্বৈত প্রকাশ’ কিন্তু 'সিতা গুন কদম্ব' বা ‘সিতা চরিত্রে’র আগে লেখা।

প্রশ্ন : বৈষ্ণব লীলাকীর্তনে গৌরচন্দ্রিকার তাৎপর্য কোথায়?

উত্তর : চন্দ্রিকা মানে চাঁদের তিলক। গৌরাঙ্গকে গৌরচন্দ্র বলা হয়ে থাকে। আমরা বলি না এই জিনিসটার উপর আলোকপাত করা হোক; তার মানে পালাবদ্ধ কীর্তন শুরু করার আগে তা যে বিষয়ের উপর হচ্ছে - পূর্ব রাগ হোক কিংবা প্রেম বৈচিত্র্য বা মাথুর হোক না কেন তার আগে তদৌচিত গৌরচন্দ্রিকা গাইতে হবে। মানে শ্রীকৃষ্ণের জীবন-লীলার উপর গৌরচন্দ্রের জীবন-লীলা আলোকপাত করা হচ্ছে। তাহলে কৃষ্ণলীলায় প্রবেশের আগে চৈতন্যলীলার দ্বারা

সেই লীলার রসপর্যায়ের ভূমিকা আলোচনা করা হয় এবং এইটার সূত্রপাত করেছিলেন নরোত্তম দত্ত। ওই ১৫৮৩ খ্রিঃ রাজশাহি খেতরি গ্রামে যে বিখ্যাত উৎসব হয়েছিল সেইখানে নরোত্তম দত্ত প্রথম গৌরচন্দ্রিকা প্রবর্তন করেন এবং জাহ্নবাদেবী সেটা অনুমোদন করেন। ওইখান থেকে গৌরচন্দ্রিকা এসেছে। ফলে ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে যত বৈষ্ণব উৎসব, যত কীর্তন সমারোহ হচ্ছে সর্বত্র আগে গৌরচন্দ্রিকা গাওয়া হচ্ছে। মানে এটা প্রবেশক।

প্রশ্ন : গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে খেতুড়ীর মহোৎসব কতখানি গুরুত্বপূর্ণ? এর কোনো রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে?

উত্তর : তাত্ত্বিক দিক থেকে এইখানে গৌরচন্দ্রিকার দ্বারা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হল যে - মর্ত্যে বা কলিতে আবির্ভূত নবদ্বীপচন্দ্র অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণেরই প্রতিমূর্তি এবং একাধারে রাধা-কৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ। এই তত্ত্বটা ছিল। এই তত্ত্বটা নবদ্বীপের নয়, বৃন্দাবনের। বৃন্দাবনে এই তত্ত্বটা এসেছে পুরী থেকে। স্বরূপ দামোদরের কড়চার মধ্যে দিয়ে। স্বরূপ দামোদর চৈতন্যের অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন। স্বরূপ দামোদরের কাছ থেকে এইগুলো বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীর একমাত্র অ-ব্রাহ্মণ গোস্বামী রঘুনাথ দাস পেয়েছিলেন। রঘুনাথ দাসের কাছ থেকে পেয়েছিলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। কৃষ্ণদাস কবিরাজের পরে যারা চৈতন্যজীবনী গ্রন্থ তার মধ্যে একটা বিখ্যাত বই হচ্ছে 'ভক্তিরত্নাকর' এবং এটি লিখেছিলেন নরহরি চক্রবর্তী। ইনি তার বইয়ের মধ্যে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেলেন খেতুড়ীর মহোৎসবের।

দার্শনিক দিক তাহলে এই হচ্ছে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ। এইটা সংগীতের মধ্যে দিয়েও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। অর্থাৎ রাধা এবং কৃষ্ণ শক্তি এবং অভিন্ন। দাপরে তাঁরা ছিলেন দুই আর কলিতে শ্রীচৈতন্যদেব একীভূত হলেন। এইটার প্রত্যক্ষরূপ গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ হতে লাগল। এইটা দর্শনের দিক থেকে প্রভাব। সাহিত্যে প্রভাব নতুন গৌরচন্দ্রিকা পদাবলীর এবং গৌরচন্দ্রিকা পদাবলীর পাশাপাশি এলো — গৌরাঙ্গের ঐতিহাসিক ভূমিকাকে অবলম্বন করে আমরা দেখি গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদগুলি রচিত হতে লাগল। আর এক একটি পালা বিভিন্ন রস পর্যায় অনুসারে বিভক্ত হয়ে গেল এবং কীর্তন গানের নতুন রীতি স্থাপিত হল। যেটাকে বলা হয় গড়ানহাটির রীতি। কারণ খেতুড়ী হচ্ছে গড়ানহাট পরগণার অন্তর্গত। সমাজের দিক থেকে তখন নরোত্তম দত্ত, শ্রী নিবাস আচার্য, গোপসাবানন্দ, এমনকি নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরচন্দ্র জীবিত থাকতে মহোৎসবে ভূমিকা পালন করেছিলেন। তা ছাড়া নারী হিসেবে বৃহৎ বৈষ্ণব সম্মেলনে জাহ্নবা দেবীর ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। তার নেতৃত্ব দানের মধ্য দিয়ে নারী শক্তির বিকাশ ঘটল। নারীও যে পড়াশুনো করে এগিয়ে আসতে পারে তা বোঝা গেল। যখন নারী শিক্ষার প্রায় কিছুই নেই সেই সময় তিনি সংস্কৃতে সমস্ত শাস্ত্র পড়েছিলেন, পদাবলী পড়েছিলেন।

প্রশ্ন : বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবতে' আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের প্রভাব দেখতে পাই। কিন্তু এই গ্রন্থে বৃন্দাবনের বৈষ্ণব দর্শনের প্রভাব আছে কী?

উত্তর : একেবারেই নেই। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের যে প্রধান রূপ, যেটা বিশেষ করে প্রকাশিত হয়েছে; বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীর অন্যতম রূপ গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র অনুপমের পুত্র শ্রীজীব গোস্বামীর সন্দর্ভের মধ্য দিয়ে। এইখানে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের আচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মানে বৃন্দাবনের গোস্বামীরা মনে করতেন যে - শ্রীকৃষ্ণ পরম শক্তিমান, শ্রীরাধা হচ্ছে পরমা শক্তি বা হ্লাদিনী শক্তি বা আনন্দ শক্তি। তাঁরা মূলত এক। লীলার স্বার্থে দুই হয়েছিলেন। তা হলে দাপরে এক, দুই হল। এইটা হচ্ছে বৃন্দাবনের তত্ত্ব। নবদ্বীপের তত্ত্ব হচ্ছে না। শ্রীচৈতন্য স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। সেই জন্য নবদ্বীপে শক্তি-শক্তিমানের অভেদ তত্ত্ব। তার মানে দুই এক। বৃন্দাবন দাস এটা মানেন না। তার কারণ তিনি চৈতন্যভাগবতের আদিলীলার প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় দেখিয়েছেন শ্রীচৈতন্যের বন্দনা করতে গিয়ে — ভাগবত পুরাণে এর পূর্বরূপ আছে।

যিনি কৃষ্ণের বর্ণনা কারী অর্থাৎ যিনি মুখে কৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করেন, হরিনাম যিনি দিয়েছেন। তিশা মানে কান্তিতে যিনি অ-কৃষ্ণ তিনি গৌর। ব্রজলীলায় ব্রজ সখা-সখীরা কৃষ্ণের সাঙ্গোপাঙ্গ ছিলেন। তিনি অসুর বিনাশ করেছেন। তার একটা শক্তির রূপ আছে, আর একটা মাধুর্য রূপ আছে। তাহলে প্রশ্ন, শ্রীচৈতন্য কাউকে হত্যা করেছেন — কাজীকে তিনি ভয় দেখিয়েছিলেন, হত্যা করতে যাননি। তাহলে তার সাঙ্গোপাঙ্গরা হলেন পঞ্চতত্ত্বের চারজন। তাঁরা হলেন অদ্বৈত, শ্রীবাস, গদাধর, নিত্যানন্দ। এই চারজন প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন। এদেরই যারা অনুচর তারা হলেন উপাঙ্গ। তারা সহপার্ষদ। সেখানে সত্য যুগের মত রাজকীয় যজ্ঞ, দানসাগর, অশ্বমেধের যজ্ঞ করা যায় না। কলির মানুষের অত ক্ষমতা নেই। তাহলে কলির শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ নাম যজ্ঞ। নামই সব। তা হলে বুঝতে পারছ, বৃন্দাবন দাস স্বীকারই করেছিলেন যে — শ্রীচৈতন্য হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্তি। রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি নয়। কেমন।

প্রশ্ন : গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সঙ্গে রায় রামানন্দের সম্পর্ক কেমন ছিল? অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ?

উত্তর : রামানন্দের কথা শ্রীচৈতন্যকে বলেছিলেন পুরীতে রাজা গণপতি রুদ্রের সভাপণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম। এই বাসুদেব সার্বভৌমের পিতা মহেশ্বর বিশারদ। ইনি মহাপ্রভুর দাদামশাই নীলাম্বর চক্রবর্তীর সহপাঠী ছিলেন। তারপর উনি নবদ্বীপ ছেড়ে পুরীতে আসেন এবং তিনি ভারতবর্ষে অদ্বিতীয় বৈদান্তিক পণ্ডিত মানুষ। চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার ৬ঠ পরিচ্ছেদে আমরা দেখি যে - বাসুদেব সার্বভৌমের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য-এর দ্বৈত-অদ্বৈতবাদ নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল এবং বাসুদেব সার্বভৌম পরাস্ত হয়ে দ্বৈতবাদে পরিণত হয়েছিলেন। এই ভক্তি সাধনার অঙ্গ কী হবে বাসুদেব যখন জানতে চাইলেন তখন চৈতন্যদেব বাসুদেবকে বললেন, আমি জানি না। এটা জানেন একমাত্র রায় রামানন্দ। তারপর রামানন্দের সঙ্গে প্রভুর ছয়দিন

ধরে সাধ্য-সাধন তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা হল। সাধ্য মানে ফাইনাল গোল। আমরা শেষ পর্যন্ত কী চাই? ফাইনাল গোলটা হল বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তি। মুক্তি নয়। আর সাধনা হচ্ছে কী পন্থা অবলম্বন করলে এই সাধ্যবস্তু লাভ করা যায়। এখানে প্রেমভক্তিকে সর্বসাধ্যসার বলা হয়েছে। প্রথমে চতুরাশ্রম বা বর্ণাশ্রম, তারপর বর্ণাশ্রম পরিত্যাগ, তারপর কৃষ্ণে কর্মার্পণ, তারপর জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, তারপর জ্ঞানশূন্য ভক্তি, তারপর প্রেমভক্তি। প্রেমভক্তির মধ্যে যেটা গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা করেন না, ঐ সাধু-মুনি ঋষিরা করেন; নিষ্ঠা এবং অন্যকে ত্যাগ যেটা হচ্ছে শান্তরস। শান্তটা বাদ দেওয়া হলে - দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। পর পর এরা স্তর ভেদে ঊর্দ্ধগামী হচ্ছে এবং শেষ হচ্ছে প্রেমভক্তি সর্বসাধনসার দিয়ে।

প্রশ্ন : পুরাণে পঞ্চসতী বলতে - অহল্যা, দ্রৌপদী, তারা, কুন্তি ও মন্দোদরীর কথা বলা হয়েছে। এখানে সীতার নাম নেই কেন? সতীনারী বলতে এখানে কোন্ নারীর কথা বলা হয়েছে?

উত্তর : এখানে হিন্দু ধর্মের উদারতার কথা পাচ্ছি। অহল্যাকে তার স্বামী গৌতমের ছদ্মবেশ ধরে ইন্দ্র এসে ভোগ করেছিলেন। তাহলে তিনি ইচ্ছে করলেও একনিষ্ঠ পতিব্রতা থাকতে পারেননি। তিনি প্রতারিত হয়েছিলেন।

দ্রৌপদীর পঞ্চপতি ছিল। আচ্ছা, মহাপ্রস্থানের পথে কেন পড়ে গেলেন? তার কারণ হচ্ছে, পঞ্চপতির মধ্যে যিনি মৎস্য, চক্র ভেদ করে দ্রৌপদীকে লাভ করেছিলেন তিনি অর্জুন। তাহলে অন্য চার পতির প্রতি তার সমান দৃষ্টি থাকার কথা নয়। এটা একেবারে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। যেহেতু পঞ্চপতির মধ্যে আর চারজনকে দূরে সরিয়ে রেখে, অর্জুনকে তিনি একমাত্র পতি বলে মনে করতেন। তাহলে তিনি অখণ্ড সতী নন। কিন্তু তাকেও এই সতীর মধ্যে গণনা করা হয়েছে। কারণ তিনি পাঁচ স্বামীর জন্য পাঁচ সন্তান জন্ম দিয়েছিলেন; কাউকে তিনি বঞ্চিত করেননি।

তারা হলেন গুরুপত্নী। তার সঙ্গে ছদ্মবেশে চন্দ্র বা সোম মিলিত হয়েছিলেন। তাহলে তারাও তার সতীত্ব রক্ষা করতে পারেন নি। কিন্তু তার সব দোষ নয়। তার পিছনে আছে পুরুষের লোভ। অতএব নারী পরিস্থিতির স্বীকার হয়। তা সত্ত্বেও অন্তরে যদি পতিভক্তি থাকে তাহলে সে সতী হবে।

কুন্তির প্রথম পুত্র কর্ণ। কারণ কুন্তি সূর্যের বলের পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন এবং সূর্যের বরে কর্ণের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ে সে একটা পাত্র করে ছেলেকে ভাসিয়ে দিয়েছিল জলে। তাহলে তিনি কুমারী অবস্থায় মাতা হয়েছিলেন। এটা সাধারণভাবে সতীত্ব হতে পারে না। কিন্তু পরবর্তী কালে দেখা যাচ্ছে তিনি সপত্নী মাতৃসঙ্গে সখ্যে আবদ্ধ ছিলেন। সকলের প্রতি তিনি সমব্যবহার করেছিলেন। তাহলে আমরা কুন্তিকে কেন সতী বলব? কেননা সে স্বামী মরে যাওয়ার পর তিনি আর কোনো পতি গ্রহণ করেননি।

মন্দোদরী, রাবণ ছাড়া আর কাউকে পতিরূপে গ্রহণ করেন নি। একেবারে একনিষ্ঠ সতী। তিনি অন্যায়ভাবে পুত্র এবং স্বামীর মৃত্যুতে সাহায্য করেন নি। সেই জন্য রাবণ বর দিয়েছিলেন, তোমার কোনোদিন বৈধব্য হবে না। মন্দোদরী আজীবন বিধবা হলেন না, সধবা হয়ে রইলেন।

সীতাকে রাবণ হরণ করেছিল। রাবণ কখনো দৈহিক ভাবে নির্যাতন করেননি এবং তিনি একনিষ্ঠ পতিব্রতা। পঞ্চসতীর কারোর না কারোর অন্যভাবে দৈহিক মিলন হয়েছিল— সীতার তা হয়নি। সীতা, সতী শ্রেষ্ঠা। সীতার পতিপ্রেমের পরীক্ষা দেওয়ার দরকার নেই। যখন উত্তরকাণ্ডের অশ্বমেধ যজ্ঞ পূর্ণ করার জন্যে সীতাকে আনতে যাওয়া হবে তখন তাকে ২য় বার অগ্নি পরীক্ষা দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। সীতা বলে আমি আর অগ্নি পরীক্ষা দেব না। সীতা অপমান সহ্য করেনি। সীতার জন্ম মাটি থেকে, জনকের হলকর্ষণে। তাহলে পৃথিবী হচ্ছে তার মাতা। তখন সীতা বললেন — যদি সতী হয়ে থাকি, রাঘব ছাড়া যদি মনে আর কাউকে স্থান না দিয়ে থাকি তবে জননী বসুন্ধরা তোমার কোলে পুনরায় স্থান দাও। তখন জননী বসুন্ধরা বিদীর্ণ হয়ে গেলেন। একটি সোনার রথ উঠল, মেয়েকে কোলে নিয়ে চলে গেল। তাহলে সীতার সতীত্বের সঙ্গে আর কারোর তুলনা হয় না। এই জন্য সীতাকে সতী বলার কোনো প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন : বাংলার বাইরে কয়েকজন বৈষ্ণব পদকর্তার পরিচয় দিন।

উত্তর : প্রথমত মিথিলার কবি বিদ্যাপতি। মৈথিলি কবি যাকে বলা হয়। তিনি অন্যতম প্রধান পদকর্তা। আর যারা পদকর্তা তারা সকলেই প্রায় বাংলার। উড়িষ্যার কিছু কিছু পদকর্তা আছেন। যেমন — সরলা দাস, অতিওরি জগন্নাথ প্রমুখ। অতএব ওড়িয়া ভাষাতেও বৈষ্ণব পদ লেখা হয়েছে। আর অসমিয়া ভাষায় শঙ্করদেব এবং তার অনুচররা বৈষ্ণব পদ রচনা করেছেন। এরা রামায়ণের অনুবাদও করেছেন। গুজরাটিতে নরসিংহ দাস ইত্যাদি অনুচররাও বৈষ্ণব পদ রচনা করেছেন। সুতরাং বাংলার বাইরে বৈষ্ণব পদ লেখা হয়েছে। এ নিয়ে নির্মলনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় একটা গবেষণাপত্র লিখেছিলেন।

প্রশ্ন : বৈষ্ণব লীলাকীর্তনে কতরকম রাগ ও তালের উল্লেখ আছে?

উত্তর : তার আগে জানতে হবে বৈষ্ণব লীলা কীর্তনে প্রধান ধারাগুলি কী কী। প্রথম ধারাটা হচ্ছে আমি আগে বললাম — এটা হচ্ছে গড়ানহাটির ধারা। খেতুরির কাছে উত্তর ভারতীয় রাগগুলি আসছে কীর্তনে। কেননা এটা প্রবর্তন করেন নরোত্তম দত্ত। তানসেনের গুরু ছিলেন দ্বিজহরি দাস। দ্বিজহরি দাসের একজন শিষ্যের কাছ থেকে তিনি ঐ উত্তর ভারতীয় মার্গ সঙ্গীত শিখেছিলেন। তিনি ধ্রুপদ, ধামার, কাজ্রি, হরি প্রভৃতি শিখেছিলেন। তিনি হরিপ্রধান রাগ কাফির এসে প্রবর্তন করেছিলেন এবং তার গানগুলো ধ্রুপদাঙ্গ এবং সেইখানে বড় বড় তালগুলো আছে এবং রাগগুলো আছে। যেমন ধর একটা বিশিষ্ট রাগ হচ্ছে বিভাস। তাছাড়া মাল্লারি, কুচ্চরি, কুহুকুচ্চরি এই রাগগুলি আছে। সুতরাং গড়ানহাটিতে তালের অনেক রকম বৈচিত্র্য আছে। আরও উত্তর ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের রাগগুলোও আছে। তারপর মনোহর সাহিত্য। মনোহর সাহিত্য খেয়াল অঙ্গের। এখানে দেশি, ধানশি, মালসি রাগ চলে এলো। এই স্থানে হিন্দুস্থানি মার্গ সঙ্গীতের রাগকে একটু ভিন্নরূপ দিয়ে প্রবর্তন করা হল।

তারপর রেনেটি কীর্তন এলো। এটি বর্ধমানের রানিহাটিতে অবস্থিত। সেটা আরও একটু তরল হয়ে এলো যেটা আখরে। তোমরা জান কীর্তন গাইতে গাইতে যিনি গাইছেন তার স্বাধীনতা কতটুকু। তিনি মাঝে মাঝে কীর্তনের মূল পংক্তির গভীরত্ব যেটা সেইটাকে সরল করে বলার জন্য আরো কিছু কিছু টুকরো শব্দ ঢুকিয়ে দেয়। এই আখর পদ্ধতিগুলি বিশেষ করে এসে গেল এই রেনেটি কীর্তন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে।

তারপর আরো দুটি পদ্ধতি আছে। একটি মান্দারণ আর একটি গরমান্দারণ। যার কাহিনি নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী লেখা। গরমান্দারণ - এটা উড়িষ্যা এবং বাংলার বর্ডার। ওখানকার কীর্তনে উড়িষ্যার গীতরীতি এর মধ্যে কিছু কিছু ঢুকে গেল।

সব শেষে যাকে আমরা ঝাড়খণ্ড অঞ্চল বলি, সেখান দিয়ে প্রভু বনপথে বৃন্দাবনে যাচ্ছিলেন। ঝাড়খণ্ডের ঝুমুর গানের প্রভাব কীর্তনের উপর পড়ল। সুতরাং খানিকটা লৌকিকতা এসেছে।

এরপর আসি তাল নিয়ে। সাত মাত্রার তিয়োট তাল, ছোট দশকোষী সাত মাত্রার তাল, মধ্যম দশকোষী ১৪ মাত্রার তাল, বড় দশকোষী ২৮ মাত্রার তাল। হিন্দুস্থানি সঙ্গীতে ২৮ মাত্রার তাল বলতে কিছু নেই। কীর্তনে এই ৭-১৪-২৮ মাত্রার তাল ডবল ডবল হয়ে চলে এলো। তাছাড়া কীর্তনে মাদন দোলা তাল আছে। তাছাড়া অনেকে কীর্তনে মাদনদোলা বলে একটা তাল আছে জানে না।

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যচর্চাকারী ড. সত্যবতী গিরির মুখোমুখি

আস্তিক মণ্ডল

আস্তিক : প্রাগাধুনিক সাহিত্যচর্চায় আপনার নিজেকে নিয়োজিত করার কারণ কী?

সত্যবতী : প্রাগাধুনিক সাহিত্যের মধ্যেই আধুনিক সাহিত্যের অঙ্কুরোদ্গমের বীজ প্রোথিত রয়েছে। একজন মানুষ যেমন তার পূর্ব বংশপরিচয়কে অস্বীকার করতে পারে না, একটি দশতলা বাড়ি যেমন নিচতলার ভিত ছাড়া দাঁড়াতে পারে না এবং একটি গাছ যেমন মূল শেকড় ছাড়া বাঁচতে পারে না, তেমনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাগাধুনিক যুগ হল পূর্ব বংশ তালিকার মূল ভিত বা শেকড়। যা পরবর্তী সাহিত্যে বংশমর্যাদা স্থাপন করে ফুল-ফল দান করে চলেছে। তাই আমি সাহিত্যের মূল কেন্দ্রবিন্দুকে পরিচর্যা করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছি।

আস্তিক : ভাগবতে বিষ্ণু মাহাত্ম্য ও বৈষ্ণব মাহাত্ম্যের মধ্যে কোন প্রভেদ আছে কী? যদি থাকে সে সম্পর্কে আপনার অভিমত।

সত্যবতী : প্রভেদ তো একটা আছে, কিন্তু সেই অর্থে নেই। ভাগবতে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য যতখানি, বৈষ্ণব মাহাত্ম্যের গুরুত্বও ততখানি। বিষ্ণু মাহাত্ম্য হল - বিপদাপন্ন ভক্তকে বিপন্মুক্ত করতে বিষ্ণু যখন নিজে অবতীর্ণ হন। আর বৈষ্ণব মাহাত্ম্য হল – বিপদাপন্ন ভক্ত যখন বিষ্ণুর নামমাহাত্ম্য সেতুকে অবলম্বন করে বিপন্মুক্ত অবস্থায় পৌঁছান। এখানে বিষ্ণু স্বয়ং অবতীর্ণ হন না। এই দুটি মাহাত্ম্য গুরুত্বপূর্ণভাবে ভাগবতে তিনটি প্রসঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। সেগুলি হল –

ক) প্রহ্লাদ প্রসঙ্গ : প্রহ্লাদ হরির নাম করায় হিরণ্যকশিপু নিজ পুত্রকে মারতে উদ্যত হন। তখন বিষ্ণু নৃসিংহ অবতার রূপে অবতীর্ণ হয়ে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। ভক্তের উদ্ধারে বিষ্ণু স্বয়ং নিজে অবতীর্ণ হওয়ায় এটা হল বিষ্ণুর মাহাত্ম্য।

খ) অজামিল প্রসঙ্গ : এখানে শুধু বিষ্ণুভক্তি নয়, বিষ্ণুর নাম মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। যা পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম তথা বৈষ্ণবধর্মের অন্যান্য শাখাপ্রশাখায়ও বলা হয়েছে। দুষ্কৃতিকারী ব্যক্তি অজামিল মৃত্যুর সময় নিজের পুত্রকে ‘নারায়ণ’ নাম ধরে ডাকার জন্য নরক থেকে বৈকুণ্ঠধামে তিনি উত্তীর্ণ হলেন। বিষ্ণুর নাম নামক সেতুর মাধ্যমে ভক্ত বিপদাপন্ন অবস্থা থেকে বিপন্মুক্ত অবস্থায় পৌঁছানোয়, এটি হল বৈষ্ণব মাহাত্ম্য।

গ) অম্বরীশ রাজা প্রসঙ্গ : এখানে রাজা অম্বরীশ বিষ্ণু ভক্ত। বিষ্ণু ভক্তির কারণে তিনি নিজে পর্বত ও নারদ মুনির কাছ থেকে শাপমুক্ত হন ও তাঁর কন্যা শ্রীমতী পর্বত ও নারদ মুনিকে বাঁদর হিসেবে

দেখে যে পাপ করেছিলেন বিষ্ণু স্বয়ং নিজে শ্যামদূর্বাদল বেশে অবতীর্ণ হয়ে শ্রীমতীকে রক্ষা করেন। এটি হল বিষ্ণু মাহাত্ম্য।

এছাড়াও ধ্রুব প্রসঙ্গ ও জড় ভরত প্রসঙ্গে ২২ জন অবতারের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং ভাগবতের মূল কথা হল - নাম এবং নামেই অভিন্নতা, তার কোনো ভেদ নেই। আর সেটাতেই আলোকপাত করলাম।

আস্তিক : 'ভ্রমর গীতা' কী?

সত্যবতী : ভাগবতে আর একটি বিষয় চৈতন্য-পরবর্তী পদাবলী সাহিত্যে জ্ঞানদাসের সময় থেকে চলে এসেছে। সেটি হচ্ছে 'ভ্রমর গীতা'। ভাগবতে কৃষ্ণ যখন মথুরায় চলে গেলেন, তখন গোপীরা কৃষ্ণ বিরহে হা-হুতাশ ক্রন্দন করে তাঁকে স্মরণ করছে। সেই সময় একটা ভ্রমর তাদের কাছে উড়ে এল। সেই ভ্রমরকে দেখে তাঁদের প্রেমবিকার জাগ্রত হল এবং পরমুহূর্তে ভ্রমরকে কৃষ্ণ মনে করে তিরস্কার করতে লাগল। আর এটাই হল 'ভ্রমর গীতা'। এই বিষয় নিয়ে জ্ঞানদাস অপূর্ব পদ রচনা করেছেন। ভাগবতে দেখি গোপীদের বিরহের কথা বলা হয়েছে কিন্তু জ্ঞানদাসের পদাবলীতে এই বিরহের কেন্দ্রে আছে রাধা।

আস্তিক : বৃন্দাবন দাস তাঁর চৈতন্য ভাগবতে চৈতন্য মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে একাসনে বসিয়েছেন। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর চৈতন্যচরিতামৃতে শুধুমাত্র চৈতন্য মহাপ্রভুকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। কেন?

সত্যবতী : আমরা নিত্যানন্দের উল্লেখ পাই নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থে, জাহ্নবা দেবীর গ্রন্থসমূহে, নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে। বাংলাদেশে চৈতন্য প্রবর্তিত ধর্ম প্রচারে যে নিত্যানন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, সেই নিত্যানন্দকে বৃন্দাবন দাস ব্যতীত কোন চৈতন্যজীবনীকারই তাঁদের গ্রন্থে উপাদান হিসাবে গ্রহণ করেননি। এছাড়াও বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দের কাছে লালিত-পালিত হওয়ায় তাঁর নিত্যানন্দকে বাদ রাখা সম্ভবপর ছিল না।

অপরদিকে, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত কৃষ্ণদাস কবিরাজ শুধুমাত্র চৈতন্যদেবকে প্রাধান্য দিয়েছেন, কারণ নিখিল বাঙালির সামনে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনকে তুলে ধরার জন্য। সেইজন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিত্যানন্দকে প্রাধান্য দেননি।

আস্তিক : বৈষ্ণব সাহিত্যে খেতুড়ী মহোৎসবের তাৎপর্য কী?

সত্যবতী : শুধু বৈষ্ণব সাহিত্যে নয়, গোটা বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে খেতুড়ীর মহোৎসব গুরুত্বপূর্ণ। ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে সংগঠিত এই বৈষ্ণব ধর্মান্দোলন চৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণব

ধর্মকে ও তার পালাকীর্তনকে একসূত্রে গ্রথিত করেছিল। তা নাহলে বৈষ্ণব ধর্ম ও পালাকীর্তনের ভেদাভেদ লক্ষিত হত। বৈষ্ণব ধর্ম ও পালাকীর্তনের অঞ্চলভেদে অভিন্নতা রক্ষার জন্য খেতুড়ীর মহোৎসব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই মহোৎসবের ব্যয়ভার বহন করেন সন্তোষ দত্ত। মহোৎসবটি পরিচালনা করেন জাহ্নবা দেবী এবং এখানেই নারীশক্তি ও নারীশিক্ষা বিস্তারে প্রসারলাভ ঘটেছিল। এছাড়াও এই মহোৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা নরোত্তম দাস। তিনি এবং তাঁর বন্ধুরা বৃন্দাবনে গিয়ে বৈষ্ণব ধর্মের ভিন্নতা লক্ষ করে খেতুড়ী মহোৎসবের আয়োজন করেছিলেন। এইজন্য খেতুড়ীর মহোৎসব গুরুত্বপূর্ণ।

আস্তিক : বৃন্দাবনের হোলি ও মথুরার হোলির মধ্যে প্রভেদ আছে কী?

সত্যবতী : বৃন্দাবন ও মথুরা দুটোই হল শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র। কৃষ্ণ বাল্যকালে গোপিনিদের নিয়ে মধুর রসের লীলাক্ষেত্র বৃন্দাবনে রচনা করেছিলেন। আর মথুরায় যখন কৃষ্ণ রাজা হয়ে পদার্পণ করলেন তখন সেখানে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাবের প্রকাশ ঘটেছে। সুতরাং সেইক্ষেত্রে দুটো হোলির মধ্যে তফাৎ থাকতে পারে।

আস্তিক : অষ্টকালীয় লীলা বর্ণন কী?

সত্যবতী : তোমাদের পাঠ্য বহির্ভূত অংশ এটি। তোমরা তোমাদের পঠিত বৈষ্ণব সাহিত্যে নায়ক নায়িকার প্রকরণ ও প্রেমের বিভিন্ন অবস্থার পরিচয় জেনেছ। আর অষ্টকালীয় লীলা হল – সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনাধারে পরিবেশিত রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলা। প্রথম অষ্টকালীয় লীলার পরিচয় আমরা পাই 'পদ্মপুরাণ'-এ। আর বাংলা সাহিত্যে প্রথম এই বিষয় নিয়ে পদ রচনা করলেন গোবিন্দদাস কবিরাজ।

আস্তিক : রাধা ও কৃষ্ণ চরিত্র বিভিন্ন পদকারদের চোখে কীভাবে ধরা পড়েছে?

সত্যবতী : ক) চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবি :- জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে কৃষ্ণ হলেন অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত ধীর ললিত নায়ক। আর রাধা হলেন কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ ভক্ত এবং মানবীও বটে। ভক্তির চূড়ান্ত স্তরে রাধাকে নিয়ে গেছেন জয়দেব।

মালাধর বসু তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যে কৃষ্ণকে অঙ্কন করেছেন বীর যোদ্ধা হিসেবে। এখানে রাধা চরিত্রের তেমন উল্লেখ নেই।

বড়ু চণ্ডীদাস 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে কৃষ্ণ চরিত্রটিকে গোঁয়ার, লম্পট হিসেবে এবং রাধা চরিত্রটিকে অনন্য একক হিসেবে এঁকেছেন। রাধার মধ্যে যে সমাজ সংস্কারের মধ্য থেকে কৃষ্ণ বিরাগের তীব্রতা কবি দেখিয়েছেন, যা পরবর্তীকালে অন্য কবিদের রাধা চরিত্রটির মধ্যে দেখতে পাই না।

বিদ্যাপতির পদে কৃষ্ণ যেন একজন অভিজাত সামন্তপ্রভু। আর রাধা এখানে মানবী নায়িকা। বিদ্যাপতিও শেষ পর্যন্ত জয়দেবের রাধার মতই গভীর আধ্যাত্মিক ভক্তির স্ফুরণ ঘটিয়েছেন।

মাধবেন্দ্রপুরী রাধাকে নিয়ে একটিমাত্র অভিসারিকার পদ রচনা করেছেন। সেখানে রাধার অভিসারের মধ্যে যে দূরূহকে, দুর্জয়কে জয় করার প্রেরণা তাঁর পদটিতে আমরা দেখতে পাই না।

চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ দায়িত্বশীল রাধা প্রেমিক। তাই তাঁর পদে দেখি, রাধা কৃষ্ণের জন্য অভিসারে যেতে পারে না, কৃষ্ণ রাধার জন্য অভিসারে আসেন। আর চণ্ডীদাসের রাধা যেন জীবনানন্দ দাশের কবিতার মতো –

'আসিয়াছে শান্ত অনুগত বাংলার নীল সন্ধ্যা
কেশবতী কন্যা যেন এসেছে আকাশে।'

প্রাক্‌চৈতন্যপর্বে বাঙালি মেয়েদের অবরোধ প্রথা প্রচলিত ছিল। সেই অবরোধের মধ্য থেকেও কৃষ্ণপ্রেমের যন্ত্রণা ও আনন্দ দুটোকেই চণ্ডীদাসের রাধা আস্বাদন করেছেন।

খ) চৈতন্য সমসাময়িক কবি :- মুরারি গুপ্ত চৈতন্যদেবের প্রভাবে কৃষ্ণপ্রেমের উন্মাদনায় আচ্ছন্ন হয়ে আশ্চর্য পদ রচনা করেন। তাঁর পদে রাধা চণ্ডীদাসের রাধার মতই 'জাতি-কুল-শীল-মান' বিসর্জন দিয়ে কৃষ্ণপ্রেমে গা ভাসিয়ে দিয়েছে।

বংশীবদনের কৃষ্ণ যমুনার ঘাটে নৌকায় লোক পারাপার করে। সেই যমুনার তীরে ধর্মাপ্লুত ক্ষুধার্ত ধূলিধূসরিত কৃষ্ণকে দেখে রাধা বলেন -

'মোর মনে হেন লয় যদি নহে লোকভয়
আঁচর ঝাঁপিয়া করোঁ ছায়া।'

একদিকে কৃষ্ণের ঘর্মজলসিক্ত কাতর মুখ আর অন্যদিকে লোকনিন্দার ভয়, উভয়ের মাঝখানে দ্বিধান্দোলিত প্রেমিকা রাধার যন্ত্রণাকে কবি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

গ) চৈতন্য পরবর্তী কবি :- জ্ঞানদাসের পদে কৃষ্ণ হল রোমান্টিক নায়ক। সেইজন্য রাধা তাঁর রূপের সীমা পরিসীমা খুঁজে পান না। আর এখানে রাধা হলেন রোমান্টিক নায়িকা।

গোবিন্দদাস তার পদে একদিকে যেমন উজ্জ্বলনীলমণি কৃষ্ণকে দেখিয়েছেন, অন্যদিকে কৃষ্ণপ্রেমিক হয়ে উঠেছেন। আর এখানে রাধা হলেন সম্পূর্ণরূপে তত্ত্বস্বরূপা।

বলরাম দাসের রাধা-কৃষ্ণের প্রেম যেন মধুর রসের চেয়ে বাৎসল্য রসের প্রাধান্য বেশি রয়েছে।

রায়শেখরের পদে রাধা-কৃষ্ণের মধ্যে বিদ্যাপতির প্রভাব কিছু পরিমাণে দেখা যায়। সেই সঙ্গে তার রাধা-কৃষ্ণ দুজনেই রোমান্টিক।

এর পরবর্তী কবিরা যেমন - দিব্য সিংহ, ঘনশ্যাম দাস, রাধামোহন ঠাকুর প্রমুখরা রাধা চরিত্রটিকে অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী এবং বাংলার মুসলমান পদকর্তারা রাধার মানবী সত্তার চিত্র অঙ্কন করেছেন।

এর পরবর্তী আধুনিক সাহিত্যিকদের সাহিত্যেও কৃষ্ণ-রাধা চরিত্রের বিবর্তন ঘটেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে লৌকিক নায়িকা রাধা মধুসূদনের হাতে নবজাগরণের আলোয় নবভাবে পর্যবসিত হয়েছে। 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে রাধা পুরুষ শাসিত সামাজিক বিধানের প্রতিবাদিনীস্বরূপা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভানুসিংহের পদাবলী'-তে বিরহ বেদনায় আচ্ছন্না মানবী রাধার পরিচয় পাই। এছাড়াও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রাধা', পুর্ণেন্দু পত্রীর 'রাধা-কৃষ্ণ কথা, জয় গোস্বামীর 'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়'-এর রাধা আধুনিক কবিদের মানবীয় জারক রসে জারিতা।

আস্তিক : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিদের স্থান কতখানি?

সত্যবতী : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিরা অনেকখানি আসন দখল করে আছে। কারণ, মুসলমান কবিদের মধ্যে থেকেই প্রথম উঠে আসে রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যান। মুসলমান কবিরা তাঁদের ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাব্য ও পদ রচনা করেছেন। মুসলমান কবি ও পদকাররা যেমন – দৌলত কাজী, আলাওল, নাসির মামুদ প্রমুখদের কাব্যসাহিত্যে চরিত্ররা জীবন্ত হয়ে উঠলেও অন্যান্য মুসলমান কবিদের জংনামা, রসুলচরিত চরিত্রগুলিও বাংলা সাহিত্যে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে প্রথম রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যান বর্ণনায় মুসলমান কবিদের অবদান মধ্যযুগে গুরুত্বপূর্ণ।

আস্তিক : অনেক সমালোচকের মতে – 'মনসামঙ্গল কাব্যে বৈষ্ণব প্রভাবের ফল্গুস্রোত প্রবহমান'। আপনার মতে সমালোচকদের মন্তব্য কতখানি সত্য?

সত্যবতী : মনসামঙ্গল কাব্য চৈতন্য পরবর্তীকালে লিখিত হওয়ায় বৈষ্ণব প্রভাব পড়া স্বাভাবিক। সমালোচকবৃন্দের মন্তব্যকে আমি সমর্থন করি।

আস্তিক : প্রাচীনকাল থেকে দেবী সরস্বতীর উদ্ভব কীভাবে পরবর্তী সাহিত্যে প্রসারলাভ করেছে?

সত্যবতী : দেবী সরস্বতীর উদ্ভব হয়েছে বৈদিক যুগ থেকে, বিষ্ণুর শক্তিস্বরূপা হিসেবে। এছাড়াও বহু দেবতা পত্নী হিসেবে সরস্বতী পরিগণিতা, কোথাও আবার ব্রহ্মা কন্যা হিসাবে পরিচিতা।

যে পঞ্চনদের সমাহারে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাংশে পাঞ্জাব সৃষ্ট হয়েছে তার মধ্যেও সরস্বতী অন্যতমা। পরবর্তীকালে দেবজায়া কন্যা সরস্বতী বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসেবে উত্তরিত হয়েছেন। অর্থাৎ সরস্বতীর নারীসত্তা তিন রূপেই বিভিন্ন জায়গায় বর্ণিত হয়েছেন।

পরবর্তী সাহিত্য দয়ারাম দাসের 'সারদামঙ্গল' কাব্যে দেবী সরস্বতীর যে বীজ উপ্ত হয় তা ফুল-ফল সমন্বিত মহীরূহস্বরূপ বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' কাব্যে ধরা দেয় জননী-জায়া-কন্যা হিসেবে।

আস্তিক : বাউলিয়া তত্ত্বের মধ্যে সংহিতার তত্ত্ব কতটা লুকিয়ে আছে?

সত্যবতী : সমালোচকবৃন্দের উদ্ধৃত মন্তব্যালোকে বাউল সাধকরা তাঁদের পদসমূহ রচনা করেননি। তাঁরা তাদের মেধার প্রাখর্যে, ভাষার চাতুর্যে, সরল মনের মাধুর্যে, সুরলহরীর ঝংকারে পদসমূহ রচনা করেন। পরবর্তীকালে বাউল সাধকবৃন্দের রচিত পদগুলির সমালোচনা করতে গিয়ে সমালোচকগণ তাতে চর্যার সাধকদের ও রথপন্থী যোগীদের সাধনার সন্ধান পেয়েছেন। সমালোচকরা দেখেছেন বাউলের কায়া সাধনা ও চর্যার কায়া সাধনা যেন 'একই বৃন্তে দুটি কুসুম'।

আস্তিক : ‘প্রাচীন পুথি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের গ্রন্থসম্পদ’ – এই উক্তিটির সত্যতা সম্পর্কে আপনার অভিমত।

সত্যবতী : আমার মতে, উদ্ধৃত মন্তব্যটি সত্য। তার কারণ পুথি যেন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য নামক মানবী সত্তাটির আঁখিস্বরূপ। অনেক পুথির পাঠোদ্ধার সম্ভবপর না হওয়ায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস তার অসম্পূর্ণতা নিয়ে এখনও বিরাজমান। আমি বলবো, তোমরা অবশ্যই যথাযথ সঠিক পদ্ধতিতে পুথি পড়া শিখে পুথিসমূহের পাঠোদ্ধার করে বাংলা সাহিত্যের অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণতায় মণ্ডিত কোরো।

আস্তিক : আধুনিক চিন্তাজগতে আসীন থেকেও প্রাগাধুনিক সাহিত্যের তাৎপর্য কতখানি?

সত্যবতী : সময়ের ঘূর্ণাবর্তে প্রাগাধুনিক সাহিত্যের তাৎপর্য পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু কোন সময়েই প্রাগাধুনিক সাহিত্যের তাৎপর্যের গুরুত্ব ক্ষুণ্ণ হয়নি। শুধু যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই যুগের উপযোগী কাহিনি ও চরিত্রের নবনির্মাণ ঘটছে। কাহিনির দিক থেকে দেখলে দেখা যায়, বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিতে বলীয়ান অত্যাধুনিক যুগ একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে চর্যাপদকে নিয়ে সেলিনা হোসেন লিখেছেন ‘নীলময়ূরীর যৌবন’, চৈতন্যজীবনকে নিয়ে শৈবাল মিত্র লিখেছেন ‘গোরা’ এবং চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনি অবলম্বনে মহাশ্বেতা লিখেছেন ‘ব্যাধখণ্ড’ ও ‘বেনেবউ’। চরিত্রের দিক থেকে প্রাগাধুনিক সাহিত্যের এক আলোড়িত চরিত্র ‘রাধা’ ঊনবিংশ, বিংশ, একবিংশ শতাব্দীতেও সমানভাবে আলোচিত হচ্ছে। যুগমানসিকতার পরিবর্তনের রঙে রাধা নিজেকে রাঙিয়ে সমস্ত যুগে সেই যুগের প্রধানা নায়িকা হিসাবে নিজেকে প্রকাশ করে চলেছে। আর তা সম্ভব হচ্ছে সাহিত্যিকদের আপন মনের মাধুরী মিশ্রণের ফলে।

সুতরাং প্রাগাধুনিক সাহিত্য যদি হয় চাল, তাহলে অত্যাধুনিক যুগে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিতে সেই চালকেই কখনো পায়েস, কখনো বিরিয়ানির আধারে পরিবেশন করেছেন আধুনিক কবি সাহিত্যিকেরা।

রাধাকৃষ্ণ লীলা পরিবেশক : কীর্তনিয়া জয়নারায়ণ দাস মহাশয়ের সাক্ষাৎকার

প্রদ্যুৎ শীল

প্রদ্যুৎ : আপনি কবে লীলাকীর্তনের সঙ্গে যুক্ত হন?

জয়নারায়ণ : আমি ১৯৭৮ সাল থেকে কীর্তনের সঙ্গে যুক্ত হই। আমি ১৯৭৬ সালে মাধ্যমিক পাশ করি। তারপর পড়াশুনার পাশাপাশি কীর্তনগানের চর্চা শুরু করি। আমার বাবা,কাকা, দাদু সবাই কীর্তনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কীর্তনের ধারা আমাদের বংশানুক্রমে চলে আসছে।

প্রদ্যুৎ : আপনারা কী বৈষ্ণব? কোনোভাবে কি আপনারা চৈতন্য মহাপ্রভু বা নিত্যানন্দ বা চৈতন্যপরিকরদের বংশধর?

জয়নারায়ণ : হ্যাঁ, আমরা বৈষ্ণব। তবে কোনোভাবে চৈতন্যদেবের ও চৈতন্যপরিকরদের বংশধর আমরা নই। আমরা সমাজবাড়ির শিষ্য। দীক্ষিত বৈষ্ণব।

প্রদ্যুৎ : আপনি কার থেকে কীর্তনগান শিখেছেন?

জয়নারায়ণ : আমি আমার বাবা শ্রী দিবাকর দাস এবং কাকা শ্রী দুর্গাচরণ দাসের কাছ থেকে কীর্তন গান শিখেছি। তাছাড়া আমার ছোট কাকা বিষ্ণুপদ দাস এবং গ্রামের এক দাদা সৃষ্টিধর সাহার কাছ থেকেও আমি শিক্ষা নিয়েছি। তাঁদের কাছ থেকে আমি অনেক তত্ত্ব সম্পর্কে জেনেছি।

প্রদ্যুৎ : আপনার কীর্তন দলের নাম কী?

জয়নারায়ণ : রাধিকাপ্রসাদ কীর্তনিয়া সম্প্রদায়। আমার বড়বাবার নাম ছিল রাধিকাপ্রসাদ। তাঁকে স্মরণ রেখেই এই নামকরণ।

প্রদ্যুৎ : আপনি কোন্ কোন্ পর্যায়ের লীলাগান করেন?

জয়নারায়ণ : আমি অলসলীলা, প্রেমবৈচিত্ত্য, স্বপ্নবিলাস, রসোদ্‌গার, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, শ্রীমতী রাধিকার বাল্যলীলা, শ্রীরাধিকার পূর্বরাগ, শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ, রূপ-রূপানুরাগ, মুরলীশিক্ষা, সূর্যপূজা, গোষ্ঠে গমনলীলা, উত্তর গোষ্ঠ, বাসবসজ্জিকা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, সুবল মিলন, রাসলীলা, মাথুর, কুঞ্জভঙ্গ, নৌকাবিলাস, কলঙ্কভঞ্জন, মান, রাই-রাখাল, গোষ্ঠে বিহারলীলা, অন্নভিক্ষা, ঝুলন প্রভৃতি পালাগুলি বিভিন্ন আসরে গাই।

প্রদ্যুৎ : প্রত্যেক লীলাকীর্তনের প্রারম্ভে বা শুরুতে গৌরচন্দ্রিকা করা হয় কেন?

জয়নারায়ণ : গৌরচন্দ্রিকা কথাটির সাধারণ অর্থ হল গৌরাঙ্গ রূপচন্দ্রের স্নিগ্ধ ও পবিত্র প্রেমের কিরণরেখা, তবে এর একটা আভিধানিক অর্থ আছে - ভূমিকা বা মুখবন্ধ। কিন্তু লীলাকীর্তনে গৌরচন্দ্রিকা কথাটি স্বতন্ত্র অর্থবোধক। বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগ, মিলন, মাথুর প্রভৃতি পর্যায়ের পালাগান পরিবেশনের পূর্বে ওই একই বিষয়ে রাধাভাবে ভাবিত গৌরাঙ্গের ভাবকে আশ্রয় করে যে গান গাওয়া হয় তারই নাম গৌরচন্দ্রিকা। আসলে গৌরাঙ্গ হলেন রাধাকৃষ্ণের

মিলিত তনু। তাই রাধাকৃষ্ণের লীলারস আস্বাদন করতে গেলে আমাদের গৌরাঙ্গকে অবলম্বন করতে হয়।

প্রদ্যুৎ : অলসলীলা কী?

জয়নারায়ণ : অলস হল শয়নের এক ভঙ্গি। রাসলীলায় রাধাকৃষ্ণ পরিশ্রান্ত হয়ে কুঞ্জের মধ্যে শয়ন বা নিদ্রা যাপন করবেন। সেই শয়নের ভঙ্গি বা লীলা, তাকে অলসলীলা বলে ভক্তদের কাছে পরিবেশন করা হয়।

প্রদ্যুৎ : আপনি যে স্বপ্নবিলাসলীলার কথা বললেন, এর কী কোনো আধ্যাত্মিক বা তত্ত্বগত তাৎপর্য আছে?

জয়নারায়ণ : এটা তত্ত্বপ্রধান লীলা। দ্বাপর যুগে এই লীলা হয়েছিল। এই লীলাতে আমরা দেখি, শ্রীমতী রাধারানি শয়নে আছেন। হঠাৎ তিনি একটি স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্নে তিনি একটি গৌর রূপ দর্শন করলেন। তখন রাধিকা কৃষ্ণকে তাঁর স্বপ্নদর্শনের কথা বললেন। তখন কৃষ্ণ রাধাকে কলিতে গৌরাঙ্গরূপে জন্মগ্রহণের কথা ব্যাখ্যা করলেন। এই স্বপ্নদর্শন নিয়ে অনেক পদ রচনা হয়েছে। যেমন জগদানন্দ লিখেছেন-

"ওঠ ওঠ প্রাণনাথ একি হেরিলাম অকস্মাৎ
এক যুগা গৌর বরণ।
কিবা তার রূপঠাম জিনি মন্মথ কাম
রসময় রসের সদন।।"

আর তত্ত্বগত দিকটা হল, শ্রীকৃষ্ণ কলিতে অবতারে গৌর হবেন বলে একটা পরিকল্পনা করেছেন (বৈষ্ণব দর্শন মতে)। কারণ ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের তিনটি আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই-

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশোবানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভূত মধুরিমা কীদৃশোবামদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বতিলোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ।।"

এই শ্লোকে বলা হয়েছে - শচী গর্ভে শ্রীহরির জন্মগ্রহণের উদ্দেশ্য তিনটি পূর্ণ করা।

ক) শ্রীরাধিকার প্রেম-মহিমা কেমন।

খ) শ্রীরাধার দ্বারা আস্বাদিত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের প্রেম মাধুর্য কেমন।

গ) শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদনে শ্রীরাধিকার সুখ কেমন।

আসলে বৃন্দাবনলীলায় শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন বিষয়বস্তু আর রাধিকা ছিলেন আশ্রয়বস্তু। তাই তিনি আশ্রয় জাতীয় প্রেমের আস্বাদ করতে পারেননি। নবদ্বীপলীলায় তাই তাঁর রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত গৌরাঙ্গ রূপ ধারণ। অন্তরে কৃষ্ণ বহিরে গৌর, একই দেহে দুই রূপ, দুই শক্তি। এখানে ভক্ত-ভগবানের তত্ত্বও আছে। ভক্তরা ভগবানের পূজা করে, তাঁর কথা চিন্তা বা স্মরণ করে সুখ পায়। সেই সুখ ভগবানকেও অনুভব করতে হয়। তাই ঈশ্বর ভক্তের মধ্য দিয়ে সেই সুখ অনুভব করেন।

প্রদ্যুৎ : বাসবসজ্জিকার কী কোন আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আছে?

জয়নারায়ণ : বাসবসজ্জিকা হল মানগানের একটি পর্যায়। এখানে আমরা দেখি, শ্রীরাধিকা কুঞ্জ সাজিয়ে বসে আছেন গোবিন্দের আসার পথ চেয়ে। কিন্তু গোবিন্দের আসার পথে ঘটল বিপদ। অর্থাৎ তিনি সপদচ্যুত হলেন। তিনি অন্য এক সখির কুঞ্জে গমন করলেন। এই কুঞ্জ সাজিয়ে বসে থাকা রাধিকাকে বাসবসজ্জিকা বলা হয়েছে। এর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য এই - আমরা সকলেই অর্থাৎ ভক্তরা ভগবানের জন্য কুঞ্জ সাজিয়ে বসে আছি এই আশায়, তিনি কখন আসবেন আমাদের হৃদয়কুঞ্জে। সেই দিক থেকে আমরা সকলেই বাসবসজ্জিকা।

প্রদ্যুৎ : বৈষ্ণব দর্শনে ভগবান স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে একমাত্র পুরুষ বলা হয়েছে, বাকি স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত ভক্তদেরকে নারী বলা হয়েছে কেন?

জয়নারায়ণ : যে কোন বীজ স্ত্রীক্ষেত্র ছাড়া অঙ্কুরিত হয় না। মাটিকে তাই মা বা বীজক্ষেত্র বলা হয়। ভজনের ক্ষেত্রেও তাই। আমাকে আমার গুরু আমার বীজক্ষেত্রে কৃষ্ণনামের বীজ রোপণ করেছেন। এই ভাবে গুরু পরম্পরা অনুসারে কৃষ্ণনামের বীজমন্ত্র প্রবাহিত হয়। তাই বলা হয়েছে -

"জীবের নিস্তার লাগি নন্দ সূত হরি।
ভূবনে প্রকাশ হলেন গুরুরূপ ধরি।।
যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানি আমি তাহার প্রকাশ।।"

এই পদের মধ্যে দিয়ে একই ভাব ব্যক্ত হয়েছে। এই জন্য বৈষ্ণব দর্শনে বীজমন্ত্র রোপণকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে একমাত্র পুরুষ এবং সমস্ত ভক্ত সম্প্রদায়কে যারা কৃষ্ণনাম রূপ বীজমন্ত্র ধারণ করে আছেন, তারা সকলেই নারী।

প্রদ্যুৎ : মান কী?

জয়নারায়ণ : মান একটা পালা বা তত্ত্ব। কুঞ্জবনে রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক্ষায় সারা রাত জেগে কাটালেন। অবশেষে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী কৃষ্ণ এলেন প্রভাতে, অন্য নারীর সঙ্গে নিশিযাপনের চিহ্ন নিয়ে। এ অবস্থায় খন্ডিতা রাধা কৃষ্ণকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন এবং মনে মনে সংকল্প করলেন বাইরের কৃষ্ণকে তিনি আর দেখবেন না। অন্তরে কৃষ্ণের এক মূর্তি স্থাপন করে তাঁর ধ্যানে বিভোর হলেন। এদিকে অন্তর্যামী গোবিন্দ বুঝতে পারলেন যে রাধা কেন তাঁকে বারবার অপমান করে তাড়িয়ে দিচ্ছেন, তখন কৃষ্ণ রাধিকার অন্তর্যাত শক্তি হরণ করলেন। তারপর রাধিকার মান ভঙ্গ হল, তিনি আবার কৃষ্ণের মিলন প্রার্থনা করলেন। এছাড়াও সখিদের দ্বারা রাধিকার মান ভঙ্গের পালা আছে।

প্রদ্যুৎ : নৌকাবিলাস পালায় শ্রীমতী রাধারানি শ্রীদামকে কেন অভিশাপ দিয়েছিলেন?

জয়নারায়ণ : নৌকাবিলাস পালাতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামকে দ্বাররক্ষী করে বিরজার কুঞ্জে গমন করলেন এবং বলে গেলেন কেউ যেন ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে। এদিকে সখির মুখে খবর পেয়ে ব্যাকুলা রাধিকা ছুটে আসে বিরজার কুঞ্জে। শ্রীদামকে তিনি দ্বার খুলে দিতে বলেন। কিন্তু

শ্রীদাম কিছুতেই দ্বার খুলে না দিলে, তখন রাধিকা শ্রীদামকে অভিশপ দেন যে শ্রীদাম পরজন্মে শঙ্খচূড় দৈত্য রূপে জন্ম করবে। এর কারণ এই যে, যে জন কৃষ্ণ দর্শনে বাধা দেয় সে জন দৈত্য বা অসুরের সমতুল্য। সেই জন্য শ্রীদামের এই অভিশাপ। অন্যদিকে শ্রীদাম নির্দোষ, সে শুধু শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালন করেছে মাত্র। তাই না জেনে শুনে রাধিকার অভিশাপ দেওয়া ঠিক হয়নি। অন্যদিকে নির্দোষ শ্রীদামও রাধিকাকে একশত কৃষ্ণ বিরহের অভিশাপ দেন। সেই কারণেই মাথুর পর্যায়ে রাধিকার বিরহ যন্ত্রণার কথা বৈষ্ণব পদাবলীতে গাথা হয়েছে।

প্রদ্যৎ : ফিরৎ গোষ্ঠলীলা কী?

জয়নারায়ণ : ফিরৎ গোষ্ঠলীলা হল গোষ্ঠলীলার একটি ভাগ। ফিরৎ কথার অর্থ হল ঘরে ফেরা অর্থাৎ গরু বা গাভী নিয়ে ঘরে ফেরা। এই লীলাকে অনেকেই উত্তর-গোষ্ঠ লীলা বলে থাকেন। গোষ্ঠ লীলার তিনটি ভাগ আছে - ক) গোষ্ঠে গমন লীলা, খ) গোষ্ঠে বিহার লীলা, গ) ফিরৎ গোষ্ঠ বা উত্তর গোষ্ঠ। এই পর্যায়ে বাসুদেব দাস, বলরাম দাস, মাধব দাস পদ রচনা করেছেন।

প্রদ্যুৎ : কীর্তন গাওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু বলুন?

জয়নারায়ণ : লীলাকীর্তনের পদ্ধতি বলতে বিশেষ কিছু নেই। সাধারণভাবে যে কোনো পালা গান গাওয়ার আগে গৌরচন্দ্রিকা গাওয়া হয়। এই গৌরচন্দ্রিকা হবে, যে বিষয়ে বৃন্দাবনলীলা গাওয়া হবে তার ভাব অনুসারী। ধরা যাক কীর্তনের আসরে শ্রীরাধিকার পূর্বরাগ নিয়ে পালাগান গাওয়া হবে। তখন কীর্তনিয়ারা পূর্বরাগের গান করার আগে এমন একটি গৌরচন্দ্রিকা গাইবেন, যার মধ্যে সেই রাধিকার পূর্বরাগের অনুরূপ একটিভাব প্রকাশ পাবে। যেমন -

"আজু হাম কি পেখলুঁ নবদ্বীপ চন্দ্র।
করতলে করই বয়ন অবলম্ব।।
পুন পুন গতাগতি করু ঘর পন্থ।
খেনে খেনে ফুলবনে চলই একান্ত।।"- (রাধামোহনের পদ)

কীর্তনের আসরে এই গান শোনার সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতার মানস নয়নে ভেসে ওঠে, কৃষ্ণপ্রেমে আকুল প্রেমিক গৌরাঙ্গের অস্থির চিত্ত, যিনি কৃষ্ণের ধ্যানে করতলে মুখ রেখে বসে আছেন। যিনি কৃষ্ণকে একবার দেখার জন্যে বারবার ফুলবনে যাতায়াত করছেন। শ্রোতার মানসপটে কৃষ্ণকে নিয়ে গৌরাঙ্গের এই ছবিখানা মুদ্রিত হয়ে গেল। এরপরে কীর্তনীয়া বৃন্দাবনলীলাগান অর্থাৎ পূর্বরাগের পালাগান ধরলেন—

"ঘরের বাইরে দন্ডে শত বার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চায়।।" (চণ্ডীদাসের পদ)

গৌরচন্দ্রিকার গানে শ্রোতার হৃদয় আগেই ভাবরসে রসসিক্ত হয়েছিল তাই এই পূর্বরাগের গানটি গাওয়ার সাথে সাথে শ্রোতার হৃদয় মুহূর্তের মধ্যে ভাবরসে আপ্লুত হয়ে যায়। গৌরচন্দ্রিকার পর বৃন্দাবনলীলা বিষয়ক গান ও তার ব্যাখ্যা করা হয়। সর্বশেষে ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলনের গান গেয়ে পালাগান শেষ করা হয়।

প্রদ্যুৎ : লীলাকীর্তনে ব্যবহৃত রাগ-তালের ব্যাপারে কিছু বলুন?

জয়নারায়ণ : লীলাকীর্তন ধ্রুপদাঙ্গ, বিভাস, মল্লারি, কুজ্জরি প্রভৃতি রাগে গাওয়া হয়। এছাড়া গড়ানহাটি বা গড়েহাটি রীতিতে (যেটা নরোত্তম দাস প্রবর্তন করেন) উত্তর ভারতীয় মার্গ রাগের প্রভাব আছে। এছাড়াও কাফি, ধানসি, মালসি, দেশি রাগও আছে। তবে রেনেটি কীর্তন থেকে কীর্তনিয়ারা নিজেদের মত করে আসর পদ্ধতি তৈরি করতে থাকে। কীর্তনের গড়মান্দারণ রীতিতে উড়িষ্যার গীত রীতির প্রভাব দেখা যায়। এছাড়াও কীর্তনে ঝুমুর, খেয়াল, ধামাল প্রভৃতি লোকগীতির নানা রাগ বা সুর ব্যবহার করা হয়। কীর্তনে সাত মাত্রার কিয়ট তাল, দশকশি, মদনদোলা প্রভৃতি তাল ব্যবহার করা হয়।

প্রদ্যুৎ : আপনার খাতাতে অনেক পদ এবং তার অনুষঙ্গে নানা কথা ও ব্যাখ্যা লেখা আছে। কীর্তনগান গাওয়ার ক্ষেত্রে এই খাতার গুরুত্ব কতটা?

জয়নারায়ণ : অধিকাংশ কীর্তনিয়া যে সব পালাগান করেন, সেই পালার প্রাসঙ্গিক নানা তথ্য, শ্লোক, পদ ও বাস্তব দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করে একটা খাতাতে লিখে রাখেন। তবে কীর্তনিয়া ভেদে এই খাতা বা আঙ্গিকের পরিকল্পনা আলাদা আলাদা হয়।

প্রদ্যুৎ : ডট কম দুনিয়ার নতুন প্রজন্মেরর কাছে কীর্তনের আবেদন কেমন?

জয়নারায়ণ : আমরা বিভিন্ন অঞ্চলে পালাগান করতে যায়, সেখানে আমরা দেখি বেশির ভাগ দর্শক প্রবীণ। নবীন দর্শক থাকলেও তারা কেউ অন্যমনস্ক, কেউ স্মার্ট ফোন নিয়ে ব্যস্ত। তবে তারা কীর্তনের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান। এমন অনেক নবীন দর্শককে পেয়েছি যারা কীর্তন সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করেছে, নানা বিষয় জানতে চেয়েছে।

প্রদ্যুৎ : কীর্তন গান বাঙালি সমাজের একটা ঐতিহ্যস্বরূপ। একে টিকিয়ে রাখতে গেলে করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

জয়নারায়ণ : দেখ, শুধু কীর্তনগান নয়, বাউল, পুতুলনাচ, লোকগীতি, ঝুমুর, ভাদুগান প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি বাঙালি সমাজের ঐতিহ্য। এদেরও অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। কারণ, যুগ অনুসারে মানুষের রুচি বদলাচ্ছে, মানুষ কীর্তন, টপ্পা, ঝুমুর ছেড়ে পপ সংগীত বা অত্যাধুনিক গানে মেতে উঠেছে। তবে এও মনে রাখা দরকার গ্রামাঞ্চলে এখনও বহু জায়গায় কীর্তনগান হচ্ছে। আমি মনে করি এই ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখতে গেলে মানুষকে নিজেদের প্রাচীন ঐতিহ্যের মাহাত্ম্যের কথা, প্রাচীন সভ্যতার গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। তার জন্য বিভিন্ন মঠ, মিশন, সরকারী-বেসরকারী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলি যদি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ওপরে জোর দেয়, তবে এগুলি আবার নতুন করে জেগে উঠবে। শুধু আর্থিক সাহায্য নয়, মানসিক ও পরিবেশগত দিক থেকে যদি সাহায্য পাওয়া যায় তাহলে বাঙালির এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আরো সমৃদ্ধ হবে।

কাব্য-সমালোচক হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখোমুখি

সুরেশ দাস

প্রশ্ন : কবিতা দিয়েই কী আপনার লেখালিখির জগতে প্রবেশ?

উত্তর : না। কবিতা দিয়ে আমার লেখালিখির জগতে প্রবেশ নয়। লেখালিখি সামান্যই করেছি।

প্রশ্ন : কোন্ সময় আপনার লেখালিখির জগতে প্রবেশ ?

উত্তর : এম, এ পাশের পরেই চাকরি পাই। সুতরাং পেশাগত কারণেই আমার লেখালিখি শুরু।

প্রশ্ন : আপনার প্রথম রচনা কী ? কোন্ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ?

উত্তর : রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' চিত্রনাট্যের উপর আমি প্রথম লিখেছিলাম। এম, এ পড়াকালীন এই তাৎপর্যপূর্ণ প্রবন্ধটি লেখা। তাপস ভৌমিক সম্পাদিত কোরক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কোরক পত্রিকার সংখ্যা ভরাট করার জন্যই আমার লেখা।

প্রশ্ন : আপনার প্রথম কবিতার বই কী ?

উত্তর : প্রথম কবিতার বই 'মানুষের মুখ'। বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা চলাকালীন লেখা। সম্ভবত সালটা ছিল ১৯৯২। কোরক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথমে লিটিল ম্যাগাজিনে সমালোচনা, প্রবন্ধ লেখা।

প্রশ্ন : আপনার প্রথম সমালোচনার বই-এর নাম কী? সেটি কোথা থেকে প্রকাশিত হয়?

উত্তর : প্রথম সমালোচনার বই 'গল্প নিয়ে কবিতা নিয়ে'। প্রথম প্রকাশ হওয়ার পর দু'টোতে ভেঙে 'গল্প নিয়ে উপন্যাস নিয়ে' অপরটা 'কবিতা নিয়ে' – এই নামে প্রকাশিত হয়। দেবাশিষ-এর সম্পাদনায় 'বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ' থেকে প্রকাশিত হয়।

প্রশ্ন : 'কবিতা নিয়ে' বইটির ভূমিকায় আপনি বলেছেন গল্প ও কবিতা পাশাপাশি সহবাস করতে পারে এবং এই বক্তব্যটি প্রতিষ্ঠা করতে আপনাকে যুক্তি সাজাতে হয়েছিল। আপনার এরূপ মন্তব্যের কারণ কী ?

উত্তর : কতগুলো কোর এলিমেন্টে উপন্যাসের থেকে গল্পকে আমার আলাদা মনে হয়। তেলেনাপোতা আবিষ্কার, মহানগর এগুলো হয়তো আখ্যানধর্মী কিন্তু এর এফেক্ট কবিতার মতো। অল্প কথায় অনেক কথা বলেছেন গল্পকার। ফলে আমি কবিতা ও গল্পের মধ্যে এমন কিছু বেসিক এলিমেন্টকে লক্ষ করেছি যারা সাধারণত দ্যোতনা বা ব্যঞ্জনায় কথা বলে এবং তা কবিতার সঙ্গে যায়।

উত্তর : ব্যক্তিগত যন্ত্রণা, আবেগ নিয়ে গল্প, কবিতা লেখা যায়। কিন্তু সামাজিক প্রেক্ষাপট ছাড়া উপন্যাস লেখা যায় না। বড়ো অর্থে সমাজ থাকবেই। কবিতাতেও সমাজ থাকে। তবে তা কম। উপন্যাসে থাকে অনেক বেশি। সমাজকে না চিনলে তুমি পলাতক কবি হবে, এস্কেপিস্ট।

প্রশ্ন : কবি ও কবিদের কোনো সংজ্ঞা আছে কী?

উত্তর : কবি ও কবিদের কোনো সংজ্ঞা হয় না। কবিতার সংজ্ঞা অবশ্য বলা যায়। আমার ধারণা কবির ঐরকম কোনো সংজ্ঞা নেই। তবে একজন কবি, তার সব কিছুর মধ্যেই তার প্রধান সাফল্য, তার প্রধান প্রবণতা কবিতার দিকে, যেমন রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্যের সবর্ত্র তাঁর অগাধ ও সফল বিচরণ থাকলেও আমরা তাঁকে কিন্তু বিশ্বকবিই বলে থাকি। নাকি বিশ্ব ঔপন্যাসিক, না বিশ্ব গল্পকার, বিশ্ব নাট্যকার।

প্রশ্ন : ভালো কবি হতে গেলে ভালো মানুষ হওয়া কী আবশ্যিক?

উত্তর : ভালো মানুষ কীভাবে নির্ধারিত হবে। একটা শাসক দল কাউকে ভালো মানুষ বলে। আবার একটা বিরোধী পক্ষ কাউকে ভালো মানুষ বলে। কবিতা হল ভিতর থেকে উঠে আসা আবেগের বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং, কবি যে কোথাও ভালো মানুষ হবে আমরা তা আশা করি। তারও দৃষ্টান্ত সাহিত্যে রয়েছে। 'পদ্মানদীর মাঝি'তে হোসেন মিঞা চোরা চালান করে কিন্তু তার মধ্যেও কবিতা রয়েছে। তাই মানুষকে ঘিরে এত সহজে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। একটা ছোট্টো কারণে একটা মানুষ খারাপ হতে পারে না। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় উভয়েই মদ্যপান করতেন। শুধু তাই নয় তাঁদের বক্তব্য ছিল, মদ্যপান ছাড়া তাঁরা নাকি সাহিত্য রচনা করতে পারতেন না। যা নিষিদ্ধ বস্তু তা তারা পান করতেন। তাহলে কী তাঁরা খারাপ? তা কিন্তু নয়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সহায়তাপরায়ণ, পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। তাই তাঁর একটা দিক দেখে খারাপ বলা যায় না। সব মানুষ দোষে-গুণে গড়া। সাদা-কালোয় গড়া সে। কিন্তু তার মধ্যে ভালোর দিকটা বেশি থাকলে তবেই তাকে ভালো বলা হয়। মধুসূদন দত্ত উদ্ধত চঞ্চল ছিলেন। তবুও বাংলা সাহিত্যে তাকে মাথায় করে রাখতে কোনো অসুবিধা হয় নি।

প্রশ্ন : আপনার প্রিয় কবি কে? কেন?

উত্তর : আমার প্রিয় কবি একজন তো নয়, অনেকেই। একজনকে বাছা খুব কঠিন। এমন মনে হয় যদি রবীন্দ্রনাথ না থাকতেন তাহলে আমরা জীবনানন্দকে পেতাম না, যদি জীবনানন্দ না থাকতেন তাহলে শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে পেতাম না, শক্তি চট্টোপাধ্যায় যদি না থাকতেন তাহলে জয় গোস্বামীকে পেতাম না, আবার যদি জয় গোস্বামী না থাকতেন তাহলে হয়তো আজকের

বিনায়ক বা শ্রীজাতকে পেতাম না। এটা একটা পরম্পরা। সেই পরম্পরা বা আধুনিকতার উৎসে আমার প্রিয় কবি অবশ্যই জীবনানন্দ। কিন্তু আমার কাছে তাৎপর্যপূর্ণ কবি হলেন রবীন্দ্রনাথ। কেননা রবীন্দ্রনাথ হলেন সেই সূর্যটা। আর সব কটা সবুজ গাছপালা তার দ্বারা সালোকসংশ্লেষ করেছে বা করে চলেছে। তিনি যদি ১৯১৩তে নোবেল প্রাইজ না পেতেন তাহলে এই বাংলা ভাষার প্রতি আন্তর্জাতিক পৃথিবীর নজর এসে পড়ত না। রবীন্দ্রনাথের আগের ও তাঁর পরের বাংলা ভাষায় আকাশ পাতাল তফাৎ রয়ে গেছে। তবে আমার কাছে সেরা কবিতার বই হলো গীতবিতান। এর লিরিক আমার কাছে Best মনে হয়।

প্রশ্ন : আপনি কী তত্ত্বকে আশ্রয় করে সমালোচনা করতে পছন্দ করেন?

উত্তর : তত্ত্বকে না, জীবনকে আশ্রয় করে সমালোচনা করতে আমি পচ্ছন্দ করি। প্রত্যেক শব্দকে ধরে ধরে এর বিশ্লেষণ করতে হবে। কেননা কবি যত্ন সহকারে তাঁর কবিতায় শব্দকে প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রশ্ন : কবিতায় শব্দের ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত?

উত্তর : কবিতার উপর নির্ভর করে শব্দের ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত। শ্রমজীবী মানুষের জন্য লেখা কবিতায় জটিল শব্দ না থাকাই ভালো। কারণ কমিউনিকেট করা কাজ। তোমার আদর্শও তাই। অথচ তুমি মনে করো পোস্ট মর্ডানের কবিতা লিখছ - এই জগতটা জটিল তো এমনিই হয়ে গেছে। যেমন, স্টিফেন হকিনের কথা ব্যবহার করলে একজন যদি না জানে যে, কে এই স্টিফেন হকিন তাহলে তার পক্ষে জানা বা বোঝা কঠিন। আমাদের রেফারেন্সে এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে পাঠক যদি না জানে তাহলে তার পক্ষে জানা বা বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে। এর ক্লাসিকাল উদাহরণ মেঘনাদবধ কাব্য। একটা ডিকশিনারি থাকলে সহজেই শব্দের অর্থ বোঝা যায়।

প্রশ্ন : জটিল, দুর্বোধ্য শব্দের ব্যবহার আমরা অনেকের কবিতাতেই দেখেছি? অনেক সময় শব্দের সেই দুর্বোধ্যতার প্রাচীর পার করে ওপারে থাকা অব্যাখ্যাত রসে মনকে ডুবিয়ে রাখা পাঠকের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। কবিতায় বারংবার এরূপ শব্দের ব্যবহারকে আপনি কী প্রশ্রয় দেবেন?

উত্তর : জটিল শব্দ বেশি ব্যবহারে তার মাহাত্ম্য কমে যায়। কবিতা একটু আড়াল রাখতে চায়। প্রবন্ধের কাজ কমিউনিকেট করা। কবিতার কাজও তাই। কিন্তু সেটা একটা মোহিনী আড়াল রাখতে চায়। তোমাকে খুঁড়ে খুঁড়ে বার করতে হবে। এই দুর্বোধ্যতার একটা প্রেক্ষাপট হচ্ছে এলিয়ট এবং এজরা পাউন্ড। তারা নিজেরা বিশ্বাস করতেন কবিতা কয়েকজনের জন্য। সকলের জন্য নয়। chosen few-এর জন্য। পাঠক যদি অলস হয় তার জন্য নয়। তাকে

একটু সচেতন হয়ে খুঁজে বার করতে হবে যে, এই শব্দ কেন ব্যবহার করা হল? এটা ৩০-এর বাংলা কবিদের মধ্যে অনেকের মর্মে ছিল। এই ধারণা বদলে দিলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ চল্লিশের কবিরা। যারা কবিতাকে Musk People-এর মধ্যে নিয়ে যেতে চাইলেন, নিয়ে যেতে চাইলেন সকলের মধ্যে।

প্রশ্ন : আপনি কবি হওয়ার পাশাপাশি একজন খ্যাতনামা কাব্য-সমালোচকও বটে। একজন কাব্য-সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গিতে আপনি আপনার কবিতা কীভাবে সমালোচনা করবেন?

উত্তর : আমি আমার কবিতার সমালোচনা করব না। আমি কবিতা লিখে খালাস।

প্রশ্ন : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শঙ্খ ঘোষ প্রমুখ কবিরা তো নিজেদের কবিতা সমালোচনা করেছেন। তাহলে আপনি কেন আপনার কবিতা সমালোচনা করবেন না?

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ বলে, শঙ্খ ঘোষ শঙ্খ ঘোষ বলে নিজেদের কবিতা সমালোচনা করেছেন। মানুষ যেভাবে দেখবে সেটাই ঠিক আছে। আমি লিখেছি, ছেপেছি আমার কাজ শেষ। নিজের কবিতাকে কজনই বা নিস্পৃহভাবে খারাপ বলতে পারে। ফলে হয়ত কোথাও বাড়িয়ে বলব। ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলব। অতিরঞ্জিত হবে। তাই খারাপ ভালোর বিচার আমি করব না।

প্রশ্ন : অন্যান্য কবির কবিতা সমালোচনা করার সময় আপনার সমালোচক দৃষ্টিভঙ্গির কীরূপ পরিবর্তন ঘটে? আপনি কীভাবে সমালোচনা করতে পছন্দ করেন?

উত্তর : বরং অন্যদের কবিতা আমি যখন সমালোচনা করি, নিজে চেষ্টা করি আমি হলে কীভাবে কবিতা লিখতাম। যেখানে মনে হয় কবিতাটা outstanding হয়েছে। আমিও এমনটা পারতাম না। এই আইডিয়া এই ভাবনাটার তখন ভীষণ তারিফ করি। কিন্তু যখন দেখি কবিতাটা আরোও ভালো হতে পারত। একটা আইডিয়া ধরতে গিয়েও ধরা গেল না। যেন কিছু একটা মিস করে গেল তখন মনে হয় ইস্ একটা ক্যাচ মিস হয়ে গেল। এমন মনে হয়। সেটা আমি সমালোচনা করি। কিছু কিছু খারাপ কবিতাও রয়েছে। খারাপ কবিতা পড়তে খারাপ লাগে। আর আমি কড়া সমালোচনা করতেই পছন্দ করি।

প্রশ্ন : সময়ের নিরিখে কবিতা না কবিতার নিরিখে সময়?

উত্তর : দু'টোই। সময়ের নিরিখেও কবিতা আবার কবিতার নিরিখেও সময়। শঙ্খ ঘোষের 'যমুনাবতী'তে সেই সময়ের খাদ্য আন্দোলনের একটা চেহারা ধরা পড়েছে। যমুনা বারুদ বুকে নিয়ে তার বাসর রচে এমন কথাও আছে। আবার 'বাবরের প্রার্থনা'র কুড়ি বছর পর নক্সাল আন্দোলনে বাংলা দেশের যে অবস্থা, 'কবিতার মূর্হুত'তেও তিনি একথা বলেছেন। 'লাইনেই

ছিলাম বাবা'তে বামপন্থা ভেঙে পড়ছে। তাদের ideology আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে। রয়ে যাচ্ছে একটা রিক্ততা। যখন প্রতি মুহূর্তে মানুষের মুখে একটাই প্রশ্ন লেগে রয়েছে, তুমি কোন্ দল? দলে দলে শিবিরে ভাগ হয়ে যাওয়া একটা বাংলা দেশের ছবি সেখানে আছে। যেমন - আজকের কবিতায় কম্পিউটার, মাউস, ল্যাপটপ্, ফেসবুক শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। আজ থেকে ১৫-২০ বছর আগের কবিতায় এই সমস্ত শব্দের ব্যবহার আসেনি। কেননা তখনও আমাদের বাজারে এই সমস্ত দ্রব্য আসেনি। নীরেন চক্রবর্তীর কবিতায় 'টেলিফোন কথাটা', 'হ্যালো দম দম হ্যালো হ্যালো' আছে। ১০০ বছর আগে থাকার কথা নয়। কেননা তখনও আবিষ্কার হয়নি। এটাও একটা সৃষ্টির দাবি যে, সমকালের প্রভাব সাহিত্যে পড়বে। ফলে সময় ও কবিতা একে অপরকে প্রভাবিত করে।

প্রশ্ন : একই মানুষের কাছে একই কবিতা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পাঠের ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্তন ঘটে। স্বাভাবিক ভাবেই একাধিক ব্যক্তি বিশেষে একাধিক সময়ে একাধিকবার পাঠ একই কবিতার ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যার জন্ম দেয়। তাহলে কী কখনো কোনো কবিতার ক্ষেত্রে তার ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যার মধ্যে থেকে কোনো একটি ব্যাখ্যাকে প্রামাণ্য হিসেবে মেনে নেওয়া যেতে পারে?

উত্তর : না এটা হয় না। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে পায়ের নীচে কী ভূমিকম্প হচ্ছে? হচ্ছে না। অথচ তুমি Global-ই দেখ। পৃথিবীটা কিন্তু ঘুরছে। আমরা কিন্তু এই সিস্টেমের মধ্যে আছি। এই সিস্টেমের কোনো পরিবর্তন সম্ভব নয়। সেই রকম কোনো রচনা যখন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পড়া হয়। তখন নিজের কাছেই তা পৃথক পাঠের সৃষ্টি করে। যে মানুষ যে ভাবে নেবে, যে মাপে নেবে, যে মেধায় নেবে। সময় বদলায়, সমাজ বদলায়, ব্যক্তি বদলায়। মূলত তিনটি মাপকাঠি – (১) সময়, (২) সমাজ এবং (৩) ব্যক্তি। সাহিত্য বন্দি নয়। তাই এই মাপকাঠির বিচারে তারও পরিবর্তন ঘটে।

প্রশ্ন : প্রামাণ্য অনুবাদ কোন্‌গুলিকে বলা যাবে? তার প্রয়োজনীয়তা কতটা?

উত্তর : প্রামাণ্য কবিতা কোনগুলিকে বলা যাবে - তা বলা ভারী মুশকিল। তর্কটা হচ্ছে এই যে, অনুবাদ করলে কবিতা আর কবিতা থাকে কিনা। আমদের দ্বারা সারা পৃথিবীর সব ভাষা পারা সম্ভব নয়। জানি না। আমি বড় জোর ইংরেজি জানি। কেউ ইংরেজির পাশাপাশি ফরাসি জানে। তাহলে কি তুমি স্প্যানিশ কবিতা, লাতিন আমেরিকার কবিতা, রাশিয়ান কবিতা পড়বে না? কীভাবে পড়বে আমাদের উপায় নেই। তাই অনুবাদের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তবে সেই অনুবাদ যদি কোনো কবি করেন তাহলে তা ভালো হতে পারে। উঁচু দরের প্রাবন্ধিক যদি কোনো প্রবন্ধের অনুবাদ করেন, উঁচুদরের কোনো সৃষ্টিশীল মানুষ যদি কোনো গল্প বা উপন্যাসের অনুবাদ করেন তাহলে ভালো হতে পারে। ফিল্মের ক্ষেত্রে এ দায় নেই। কেননা sub-title দিলে যে কোনো ভাষার ফিল্ম বেরিয়ে আসে। সাহিত্যের মুশকিল এইটাই। তুমি

বড়ো জোর ৩টে বা ৪টে ভাষা জানবে। ৪০০ ভাষা তো আর জানবে না। অথচ আফ্রিকার কবিতা পড়তে ইচ্ছা করতেই পারে। কীভাবে পড়বে? বেশি আঞ্চলিক ভাষা জানো না। তাই অনুবাদের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আমরা যারা পৃথিবীর নানা প্রান্তের কবিতা পড়তে চাই, বুঝতে চাই, জানতে চাই, তাদের জন্যই এই অনুবাদের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আমরা রিলেট করতে পারি অন্যান্য সাহিত্যের সঙ্গে।

প্রশ্ন : Post Modern কবিতা কী?

উত্তর : Post Modern কবিতা এক কথায় বলা খুব মুস্কিল। প্রথমত, Post Modern ভালো করে বুঝতে হবে। দ্বিতীয়ত, বুঝতে হবে আমার দেশে কী Post Modern-র কন্ডিশন আছে? প্রথম বিশ্ব বা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডে আছে। আমার দেশে কী আছে? কারণ এখনো কিন্তু আমরা Modern-ই পুরোটা হতে পারিনি। এখনো চুঁচুড়াকে চিন্‌সুরা বলি, মেদিনীপুরকে বলি মিদনাপুর, বর্ধমানকে বার্ডওয়ান বলি। কলোনিয়াল ব্যাপারটা এখনো কাটেনি আমাদের। সদ্য আমরা ক্যালকাটা বলা ছেড়ে কলকাতা বলতে শিখেছি। Post Modern-এর পরের ধাপ। Third World Country এখনো পর্যন্ত সেই স্তরে যাওয়ার চেষ্টা করছে। শুধু একটা কথা বলতে পারি। Post Modernism-এর একটা লক্ষণ হচ্ছে Audio Visual Medium। এর প্রভাব মারাত্মক আর সেইটা, T.V প্রযুক্তিটা এসে যাওয়ার পর খানিকটা এসে গেছে। দেখবে সিরিয়ালের ধাঁচে উপন্যাস লেখা হচ্ছে। গল্প লেখা হচ্ছে। আমরা কথা বলছি সেই রকম। আমাদের ভাষা পাল্টে দিচ্ছে S.M.S। এগুলো Post Modernism-এর একটা লক্ষণ। Communication বেড়ে গেছে। আগে বাড়ির সঙ্গে কথা বলার জন্য P.C.O-তে যেতে হতো। এখন বুক পকেটেই ফোন। এইগুলো Post Modernism-এর লক্ষণ। কিন্তু Post Modern Poetry এখনো তৈরি হয়েছে বলে আমার মনে হয় না।

প্রশ্ন : তাহলে S.M.S-এর ভাষা কী কবিতার ভাষা হতে পারে?

উত্তর : পৃথ্বিরাজ রায় নামে একটি ছেলে এরকম একটি কবিতা লিখেছে। S.M.S-এর কবিতা। এগুলো আমার গিমিক মনে হয়। ভালো কবিতা হয়নি। আগে তো তাকে কবিতা হতে হবে। যা খুশি দাবি করলেই কি সেটা কবিতা। সেটা বাজিল, উঁচানো কথা।

প্রশ্ন : Anti Poetry কী?

উত্তর : Anti Poetry ব্যাপারটা মূলত লাতিন আমেরিকার একটা Concept। আমাদের চেনা কবিতার Pattern-কে সেখানে Challenge করা হয়। শব্দের ক্ষেত্রে তারা মারাত্মক দুঃসাহসী। সবচেয়ে মারাত্মক প্রতিনিধি ছিলেন মিকানল পারার। লাতিন আমেরিকার একজন কবি। শোনা যায় তাঁর কবিতা শুনতে নাকি লোকে ভিড় করত। আমরা অনেক সময় সুবোধ

সরকারের কিছু কবিতার মধ্যে Anti Poetry-র একটা ব্যাপার দেখেছি। আসলে কবিতায় যা যা লেখা হয় সেগুলো ভেঙে চুরে চুরমার করে দেওয়ার ব্যাপার রয়েছে। তারও আগে আমার মনে হয়, সমর সেনের মধ্যে Anti Poetry-র ব্যাপার কিছুটা রয়েছে। সমর সেনের কবিতা পড়লে দেখবে একটা মাস্তান কবিতা লিখছে বলে মনে হয়। তুষার রায়ের কবিতার মধ্যেও সেটা আছে। হাংরি জেনারেশোনের বেশ কিছু কবিতার মধ্যে সেটা আছে। শ্রুতি আন্দোলন, ৬-এর দশকের ধ্বংসকালীন আন্দোলনের মধ্যে এই ব্যাপারটা পাবে।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের শূন্য দশকের কবি-লেখক আর পশ্চিমবঙ্গের শূন্য দশকের কবি-লেখক – কারা এগিয়ে আছেন? আপনার কাছে দুই বাংলার শূন্য দশকের লেখকদের মধ্যে কারা প্রণিধানযোগ্য, কারা আপনাকে বেশি আকর্ষণ করে?

উত্তর : আমি বাংলা দেশের একেবারে সাম্প্রতিক কবিতা সম্পর্কে অতটা জানি না। যাদের জানি তারা ৯০-এর দশকের কবি। ফলে এটা আমি তেমন বলতে পারব না। তবে সাধারণভাবে আমার মনে হয়েছে এপার বাংলায় কবিতা অনেক Better। ওপার বাংলার আমার শ্রেষ্ট কবি মনে হয় আল মামুদকে। তারপর শামসুর রহমান। তারা খুবই ভালো কবি এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। বেলাল চৌধুরী, মহাদেব সাহা, নির্মলেন্দু গুণ প্রত্যেকেই ভালো কবি। কিন্তু এপার বাংলায় কবিতার Development অনেক Better। শূন্য দশকের কবিদের মধ্যে অনেকেই গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীজাত, বিনায়ক, শ্বেতা চক্রবর্তী ভালো লেখেন। হয়তো এখনো তৈরি হয়নি, তৈরি হচ্ছে।

প্রশ্ন : বহির্বঙ্গের সাহিত্য নিয়ে আজকাল বিস্তর কথা হচ্ছে। সাহিত্যে এই বিভাজন-ভূমি কী উচিত?

উত্তর : এটা তো সত্যি, বাস্তব যে বর্হিবঙ্গের একটা ভৌগোলিক বাস্তবতা আছে। যেমন - শিলচরের সাহিত্য, ত্রিপুরার সাহিত্য, বিহারের সাহিত্য, ঝাড়খন্ডের সাহিত্য। 'জাগরী'র সতীনাথই তো ছিলেন বাইরে। ফলে এটা তো বাস্তব। তোমাকে মানতেই হবে যে, বাংলাদেশের চেনা এই ভৌগোলিক কাঠামোর বাইরেও একদল মানুষ বাংলা ভাষা চর্চা করছে - দিল্লীতে বসে, বেনারস বসে, আসামে বসে, ত্রিপুরায় বসে, ওড়িশায় বসে, বিহারে বসে, ঝাড়খন্ডে বসে। সেটা তো একটা বাস্তব ব্যাপার। এবার মানের উৎকর্ষ-অপকর্ষ সেটা আরকেটা ব্যাপার। ত্রিপুরায় তো খারাপ কবিতা লেখার কথা নয়। শীলচর সেখানে বাংলার সত্যি Serious চর্চা আছে। তারা বাংলা ভাষার জন্যে প্রাণ দিয়েছেন। ফলে এই বিভাজন আছে। এই বিভাজন আসলে এরা পৃথক বলেই সার্থক। কার্যত এরা আমাদের পাশে আর একটা Diameter। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য কতটা এগোলো-পিছলো সেটা আমরা এদের বিচারে বুঝতে পারি। একটা মাপকাঠি রয়েছে।

প্রশ্ন : আপনার লেখায় কোনো অনুপ্রেরণা শক্তি কী আছে? যদি থাকে তা কে? কীভাবে আপনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন?

উত্তর : আমার কোনো as such অনুপ্রেরণা নেই। প্রেরণা-টেরণা আমি জানি না। যে জীবনটা আমি দেখি, যে জীবনটা আমি যাপন করি, তার যে ভালো এবং মন্দ দু'টোই আমার কবিতার বিষয়। আমার কবিতা অনেকটা ডায়েরির মতো। আমার ভিতর থেকে কিছু মন খারাপ, মন ভালো, ভালো লাগা, মন্দ লাগা, ভালোবাসা, ভালো না বাসা কবিতার অক্ষরের সঙ্গে চলে আসে। সেইটুকু আমি জানি।

প্রশ্ন : কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শে কী আপনি বিশ্বাসী? আপনার সাহিত্যে তার প্রভাব কতটা?

উত্তর : হ্যাঁ। আমি বামপন্থী। আমি রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী। সাধারণভাবে কবিতায় সেটা আসে না। আমি চেষ্টা করি সেটা না রাখতে। আমার মনে হয় আমার রাজনৈতিক মতাদর্শ কবিতায় নিয়ে আসলে সেগুলো স্লোগানে পরিণত হবে। কিন্তু ব্যক্তি আমি রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাস করি। সেটা কোথাও স্লোগানে পরিণত হোক চায় না। মানে তার উল্টো মতাদর্শের কবিতা লিখি এমন না। মনে করি সরাসরি রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে কবিতা লেখা আমার ধরন না। এটা কেউ পারলে ভালো। আমাদের মধ্যে জয়দেব বসু পারত। খুব ভালো রাজনৈতিক কবিতা লিখেছেন। আমার হয়তো কোনো একটা কবিতা বা দু'টো কবিতা রাজনৈতিক হলো। সাধারণভাবে আমি রাজনৈতিক কবিতা লিখি না।

প্রশ্ন : কবি ও কাব্য-সমালোচক হিসেবে সমাজের কাছে আপনার দায়বদ্ধতা কতটা বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : নিশ্চয় দায়বদ্ধতা আছে। নিশ্চয়। সমাজটা তো আমার প্রেক্ষিত। ভেবে দেখ আজকে আমার যতটুকু পরিচিতি রয়ছে, সেটা তো সমাজকে ঘিরেই। ভালো হোক বা খারাপ হোক এই সমাজকে ছেড়ে তো আমার অস্তিত্ব নেই। সেটাই তো আমার কাঠামো। এই সমাজটা আমার ধাত্রীদেবতা। ফলে আমার যা কিছু সেটা আমি এই সমাজকে ফিরিয়ে দিতে চায়। কোনো সন্দেহ নেই। নিশ্চয় দায়বদ্ধতা আছে।

প্রশ্ন : বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে অনেকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। একটি সুশীল সম্প্রদায়। অপর সম্প্রদায়কে কী এমন কোনো নামে চিহ্নিত করা যায়? যদি যায় তবে তাকে কী বলা হয়?

উত্তর : কথাটা তো Intellectual থেকে এসেছে। বাংলা বুদ্ধিজীবী করাটাই আমার কাছে ভুল মনে হয়েছে। Intellectual কথাটার যে essence সেখানে জীবিকার প্রশ্ন নেমে আসে। যেই তার সাথে জীবিকাকে তুমি জড়িয়ে ফেলছ তুমি সব কথা বলতে পারবে না। তোমার একটা পিছুটান, ভয় কাজ করবে। জীবিকা হারানোর ভয় কাজ করবে। রাজদ্বারে কলকে পাওয়া না

পাওয়া তোমার কাছে একটা Fact কাজ করবে। রাজার রোষ তোমাকে ভয়ার্ত করবে। Intellectual-এ সেই ভয় ছিল না। সক্রেটিস গণতন্ত্রের বিরোধের কথা বলেছেন। গ্যালিলিও তৎকালীন চার্চের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। ফরাসি বিপ্লবের সাহিত্যিকরা তৎকালীন সময়ের বিরোধিতা করেছেন। যারা Freedom-এ বিশ্বাস করেন, মুক্ত চিন্তায় বিশ্বাস করেন আমি তাদের বুদ্ধিজীবী বলি। আমাদের কিছু আসপেক্ট আছে যা বুদ্ধিজীবীকে আটকায়। আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা বুদ্ধিজীবীকে Freedom দেয় না তিনটি জায়গায় —

(১) বুদ্ধিজীবী যদি State Policy-র বিরুদ্ধে দাঁড়ায় রাষ্ট্র তাকে মানবে না। তোমাকে ততটুকু Space দেবে যতক্ষণ না তুমি State Policy-র বিরুদ্ধে যাচ্ছ।

(২) তুমি ধর্মের ক্ষেত্রে যদি খুব Radical হও State মানবে না। ডিরোজিওকে মানবে না। কাউকে মানবে না।

(৩) রাষ্ট্রের, তার সংজ্ঞা অনুযায়ী শ্লীলতা-অশ্লীলতার একটা মাপকাঠি আছে। কিন্তু তাকে অতিক্রম করলেই রাষ্ট্র তোমাকে অশ্লীল বলে আটকাবে।

(১) State Policy, (২) Religion, (৩) Opcidity। যুগে যুগে এই ব্যাপারগুলোই বুদ্ধিজীবীর কাছে চ্যালেঞ্জ হিসেবে এসেছে। সে কিভাবে নেবে।

প্রশ্ন : আমার শেষ প্রশ্ন, পাঠকের কাছে আপনার বার্তা কী?

উত্তর : পাঠকের কাছে সেই অর্থে আমার কোনো বার্তা নেই। বেশি করে বই পড়ুন। কবিতা পড়ুন। গল্প উপন্যাস পড়ুন। যাকে পছন্দ তাকে পড়ুন। যাকে পছন্দ হয় না তাকেও পড়ুন। কেউ পড়ছে মানে অনেক খারাপ কাজের বিরুদ্ধে তার Statement দিচ্ছে। সে আমার বই নাও পড়তে পারে। কারো বই তো পড়ছে। না হলে সে তো ঘুঁষ খেত। না হলে সে তো মারামারি করত। সে তো কাটাকাটি করত, অন্যায় করত। অন্যায় না করে সে বই পড়ছে। এর চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না। সে যা খুশি করুক। সে যার ইচ্ছে তার কবিতা পড়ুক। কারণ সাহিত্যপাঠ মানুষের মনকে সতেজ করে। ভাল করে। কল্যাণমুখী করে। এইটা বোধ হয় ভালো। আমাদের সময়কালটা তো অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। কেমন কেমন লাগে। প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললে ভয় লাগে। প্রতিদিন টিভি on করলে ভয় লাগে। রেডিও on করলে ভয় লাগে। যা যা শুনি, যা যা দেখি পুরোনো পৃথিবীটার প্রতি আস্থা থাকে না। কে পারে এইসব থেকে পৃথিবীটাকে অরো নতুন করে Hosting করতে। কবিতা পারে, গল্প পারে, উপন্যাস পারে, প্রকৃত বুদ্ধিজীবী পারে, অনুভুতিশীল মানুষ পারে। যে মানুষ কবিতা পড়ে, গল্প পড়ে, উপন্যাস পড়ে - স্বাভাবিকভাবেই সে আমার বন্ধু।

জহর সেন মজুমদারের মুখোমুখি

বিশ্বরঞ্জন পাইক

প্রশ্ন : জীবনের কবিতা ও কবি

উত্তর : প্রথমেই তোমায় বলি, বাংলা কবিতার একটা ঐতিহ্য ও পরম্পরা আছে; এই ঐতিহ্য ও পরম্পরা সম্পূর্ণতই জীবন সংলগ্ন; জীবন ছাড়া ঐতিহ্য হয় না, আবার পরম্পরাও হয় না; তুমি এই জীবন সম্পৃক্ত ঐতিহ্য ও পরম্পরার দিকে একবার ফিরে তাকাও; তা নয়তো তোমার উপলব্ধি আংশিক ও অসম্পূর্ণ থেকেই যাবে; এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই অমিয় চক্রবর্তীর 'সংগতি', বিষ্ণু দে-র 'দামিনী' কিংবা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'যেতে পারি, কিন্তু কেন যাবো' অবশ্যই জীবনের কবিতা; কিন্তু বাংলা কবিতার এই বিশাল ঐহিত্য ও পরম্পরায় এই তিনটি কবিতাই শুধু আলাদা করে জীবনের কবিতা হয়? হতে পারে? আমি তাই প্রথমেই এই তিনটি কবিতাকে জীবনের কবিতা হিসেবে নির্দিষ্ট চিহ্নিতরূপে আপত্তি জানাচ্ছি; প্রচুর, প্রচুর, কবিতা আছে – যা জীবনের সংযোগেই বিকশিত ও পরিব্যাপ্ত; তুমি বুঝতে ভুল করছো, আসলে সব কবিতাই জীবনের কবিতা, জীবন ছাড়া কবিতা কখনোই হয় না; কালকেও কবিতা ছিল জীবন সংলগ্ন, আজকেও কবিতা প্রথম ও শেষাবধি সেই জীবনেরই কবিতা; জীবন নেই – এমন কোনো কবিতার দৃষ্টান্ত তুমি কী দিতে পারবে? কবিতাও তো রক্ত মাংসেরই মানুষ; ল সেই রক্তমাংসস্পন্দন সর্বদাই তো জীবন বিজড়িত; আর সবচেয়ে বড়ো কথা, যার মধ্যে জীবন নেই, তা আর যা-ই হোক, অবশ্যই কবিতা নয়; তোমাকে তাই স্পষ্টই বলি – আজকের দিনের কবিতা বলে আলাদা কিছু হয় না; সময়ের বিভাজনকে মান্যতা দিয়েও বলি, কালকের দিনের কবিতাও যা – আজকের দিনের কবিতাও তাই; ধারাবাহিক – কিন্তু পরম্পর সংলগ্ন; বলবার ভঙ্গী হয়তো বদলে গছে, সময়ের চলমান প্রক্ষেপগুলোর হয়তো পরিবর্তন ঘটে গেছে, দেখা-র চক্ষু হয়তো অন্য রকম শল্যচিকিৎসায় এসেছে – কিন্তু তা বলে আজকের দিনের কবিতা জীবনবিবিক্ত কিছু নয়; জীবন যাপনেরই প্রতিফলন ও প্রতিসরণ ...

প্রশ্ন : 'শিল্প শিল্পের জন্যে' নাকি জীবনের জন্যে?

উত্তর : বাংলা কবিতার চলমান স্বভাবধর্মে দীর্ঘকাল ধরেই যেমন একদিকে কলাকৈবল্যবাদ রয়েছে, অন্যদিকে তেমনই রয়েছে মানব-অঙ্গীকারে দৃপ্ত সমুত্থান চেতনা; আমি কবিতার এমন বিপরীত শিবির বিভাজনে কখনোই বিশ্বাসী ছিলাম না; তার একটা কারণ হয়তো এমন হতে পারে যে আমি দু'ভাবনার কবিদের সঙ্গেই সর্বদা সম্পৃক্ত থাকতাম; একই সঙ্গে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, একইসঙ্গে রঞ্জিৎ সিংহ এবং নবারুণ ভট্টাচার্য, দু'ভাবনার ও দু'জগতের কবিদের সঙ্গেই অন্তরঙ্গ সংযোগ ছিল আমার; স্বীকরণও ছিল আমার; আর হয়তো

তাই আমি কখনোই ভাবিনি 'শিল্পের জন্য শিল্প' এবং 'মানুষের জন্য শিল্প' এমন বৈপরীত্য লিখন কর্মের ক্ষেত্রে আদৌ থাকতে পারে; তোমাকে, এই ভাবনার অন্তর্গত সংরচনা থেকে, তোমাকেই বলি বা স্বীকার করি – লিখতে লিখতে আমি এই দুইয়ের বৈপরীত্য ভাঙতেই উন্মুখ; আমি চাই সমীকৃত সংশ্লেষ, সমীকৃত মিশ্রণ; বাস্তব থেকে প্রচ্ছন্ন বাস্তবে, ক্রমাগত চলাচল করাটাই জরুরি; এই অলাচলে প্রেম আর বিপ্লব এক হয়ে যায়, যৌনতা আর দেশপ্রেম মিলেমিশে যায়; উদাহরণও তো দেওয়া যায়; যেমন রবীন্দ্রনাথ; যেমন জীবনানন্দ; যেমন অমিয় চক্রবর্তী; যেমন শঙ্খ ঘোষ; এই সমীকৃত সংশ্লেষ রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' ও 'মানসী', জীবনানন্দের 'মহাপৃথিবী' ও 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', কিংবা শঙ্খ ঘোষের 'পাঁজরে পাঁজরে শব্দ' ও 'প্রতিপ্রশ্নে কেঁপে ওঠে ভিটে' পাশাপাশি পড়লেই বোঝা যায়; বৃহৎ উজ্জীবনের প্রজ্ঞাদীপিত চৈতন্যে যেতে হলে এই সম্পৃক্ত সংশ্লেষ লিখনকর্মে ভীষণ ভীষণ জরুরি; আসলে একথা অবশ্য সত্য মানুষ একটাই – জীবন একটাই – কিন্তু মানুষ মাত্রই ভেতরে ভেতরে বহু সত্তা সমন্বিত, জীবন মাত্রই চূর্ণে চূর্ণে চলমান অসম্ভব বহুরৈখিক; একে ধরতে হলে, একে বুঝতে হলে, সম্প্রসারণশীল চৈতন্য ও বোধিসমন্বিত সমগ্রতা দরকার; আমি লিখতে লিখতে বারবার এই সমগ্রতার দিকেই এগোতে চেয়েছি; সুতরাং 'শিল্পের জন্য শিল্প' ও 'মানুষের জন্য শিল্প' – এই মতবাদ সর্বস্ব ব্যাপারটাই আমার কাছে হাস্যকর; এর কোনো শৈল্পিক গ্রহণযোগ্যতা নেই ...

প্রশ্ন : শিল্পে 'life it is' নাকি 'life it is to be' – কোন্‌টা প্রাধান্য পায়?

উত্তর : আমরা যেসব মানুষ দেখি, তার বহুরূপ; আমরা যে জীবনের মধ্যে বসবাস করি – তারও বহুরূপ; প্রত্যক্ষে প্রতিনিয়ত দেখতে দেখতে মনে হয়, চিনে ফেলেছি; সবটাই চিনে ফেলেছি; কিন্তু সত্যিই কি তাই? চেনা যা, মুহূর্তে তা অচেনা; আমি বারবার ঠিক এই চেনা-অচেনার দ্বান্দ্বিক দ্বিরালাপে সর্বদা নোঙর ফেলে বসে আছি; যা চেনা, যা স্পষ্ট এক প্রকাশ – সেই মানুষে সেই জীবনের পদচারণা করতে করতে ক্রমশ এই দৈনন্দিন বাস্তবতার প্রতি কেমন যেন একটা অনীহা ও বিবমিথা তৈরি হয়ে যায়; চারপাশে এতো রক্তি কেন? এতো মল মূত্র পুঁজ কেন? এতো ঘৃণা বমি রিরংসা কেন? ভেতরে ভেতরে কেমন যেন একটা বিরক্তি ও অসহায়তা দেখা দিতে থাকে; তোমার কাছে একটা কথা স্বীকার করতে বাধা নেই, যে, অনেক সময় এই প্রত্যক্ষতার সমূহ সংকট ও সর্বনাশের ভেতরে ভ্রমিভ্রান্ত হয়, মাঝে মাঝে, এও ভেবেছি – এইসব ছেড়ে পালিয়ে যাবো; তন্মুহূর্তে আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে মন; যেতে পারি, কিন্তু কেন যাবো? এও তো সত্য, পালিয়ে বেশিদূর যাওয়া যায় না; সুতরাং জীবনের এই প্রচুর অচিকিৎস্য ব্যাধির ভেতর সুধীন্দ্রনাথের উটপাখির মতো মুখ গুঁজে পড়ে থাকতেই হয়; আর ফাটা ডিমে তা দিতে দিতে, ধূ ধূ মরুভূমি ভেতর, আবার প্রবল স্বপ্নযন্ত্রণা নিয়ে জীবনেরই কাঠামো নতুন করে ভাবতে শুরু করি; এই ভাবনা শুধু আমার নয়; তোমার আমার সকলের;

ঠিক এরকম এক সংকটদীর্ণ আত্মরতি থেকেই একটা সময় 'life it is to be'-র দিকেই শুরু হয় টানা সম্মোহিত অভিযাত্রা; আমার লেখালেখিও ক্রমে ক্রমে তাই হয়তো বা একটা মহাজাগতিক অভিযাত্রা হয়ে উঠেছে; যা আসলে সার্বিকভাবে আক্রান্ত একজন মানুষের আত্মমগ্ন আত্মকথন, যে আত্মকথন ক্রমাগত বিড়বিড় করে বলে চলেছে একটা কথা – 'life it is to be...

প্রশ্ন : বর্তমানের কবিতা দুর্বোধ্য , বিষয়হীন, পান্ডিত্যে ভরা – এই অভিযোগ সম্পর্কে আপনার মতামত।

উত্তর : তুমি বলছো বটে এই কথা, কিন্তু আমি ঠিক বহুজনের অভিযোগ বলে একে সম্পূর্ণরূপে মেনে নিতে পারছি না; বাংলা কবিতা দুই বিশ্ব যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে অবশ্যই জটিল হয়েছে, বোধ ও বোধির চূড়ান্ত সংক্রমণে কোথাও কোথাও কখনো কখনো অসংলগ্ন মনস্তাত্ত্বিক কল্পের প্রয়োগে কিঞ্চিৎ দুরূহ হয়েছে, ঠিক কথা; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা জীবনের এবং বোধের বাইরে চলে গেছে – এমনটা ভাবা ঠিক নয়; তুমি লক্ষ করে দেখবে, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা কবিতায় মানে বই বা সহায়িকা-পাঠের যথেষ্ট প্রচলন ছিল; জীবনানন্দের কাল থেকে বাংলা কবিতা আস্তে আস্তে মানে বইয়ের বাইরে চলে গেলো কিংবা সেইসময় থেকে মানে বইয়ের গুরুত্ব কমতে শুরু করলো; তুমি যাদের 'বহুজন' বলছো, হয়তো তাঁরা মানে বইয়ের সাহায্য ছাড়া কবিতায় ঢুকতে পারেন না – এমনও তো হতে পারে; আসলে সময় বদলে গেছে, জীবন বদলে গেছে, দেখার চোখও পরিবর্তিত অস্থিরতায় বদলে বদলে গেছে – এই পরিবর্তিত অস্থিরতার ঘূর্ণাবর্তে বারবার বাংলা কবিতারও নানাবিধ বাঁকবদল ঘটে গেছে; সত্যি বলতে এই বাঁকগুলো, এই বাঁকবদলগুলো, অবশ্যই বুঝতে বা ধরতে হবে; তা নয়তো তোমার ভাষানুসারে বাংলা কবিতা কিন্তু ওইসব বহুজনের দ্বারা চিরটাকাল ক্রমাগত অভিযুক্তই হবে; এই অভিযোগ করবার আগে একথা কিন্তু বুঝতেই হবে যে তাঁরা ছড়া পড়ছেন না – কবিতা পড়ছেন; উদাহরণও দেওয়া যায়; ধরা যাক এই বহুজনের কেউ সুধীন্দ্রনাথের 'যযাতি' বা 'জেসন' পড়ছেন – পড়তেই পারেন – কিন্তু পড়তে পড়তে তাঁকে কিন্তু জানতেই হবে যযাতির স্বরূপ কিংবা জেসম-এর কার্যাবলী; আমি উর্বশী কে জানলাম না, আর্টেমিস কে তাও জানলাম না – অথচ বিষ্ণু দে-র 'উর্বশী ও আর্টেমিস' পড়ে আত্মবোধির ও আত্মচেতনার জাগরণ তথা সম্প্রসারণ চাইলাম – এটা হয় না; হতে পারে না; কবিতা পড়ারও একটা অনুভূতিজাগ্রত ক্রমানুশীলন আছে; এই ক্রমানুশীলন না থাকলে একজন পন্ডিত বা শিক্ষিতের পক্ষেও কবিতা বোঝাটা কিন্তু দুরূহ হয়ে যাবে...

প্রশ্ন : 'আর এক আরম্ভের জন্য' প্রবন্ধে কবি শঙ্খ ঘোষের মন্তব্য 'সাহিত্যের বিকেন্দ্রীকরণ' এবং আপনার মতামত—

উত্তর : তুমি কবি শঙ্খ ঘোষের যে মন্তব্যটির কথা বলেছো, তার আগে ও পরে তিনি কী বলেছেন, কী ভেবেছেন, তাও কিন্তু গভীর মনোনিবেশ দাবি করে; আসলে 'বিকেন্দ্রীকরণ' শব্দটির মধ্যেও কিন্তু অনেক ঢেউ অনেক নিভৃত তরঙ্গ রয়ে গেছে; দু এক কোথায় তা ধরা বা বলাও সম্ভব নয়; তবে একইসঙ্গে, বিকেন্দ্রীকরণ-এর সঙ্গে তুমি যখন পূর্বের ঐতিহ্যের কোথাও বললে – তখন আমারও ভেতর অন্য এক সমসংসক্তির ভাবনা স্ফুটতর হয়ে উঠছে; সেই জাগ্রত সমসংসক্তি থেকে বলি – আমাদের সর্বদাই লক্ষ রাখতে হবে বিকেন্দ্রীকরণ কোন্ দিকে যাচ্ছে, কী তার অভিমুখ কী তার উদ্দেশ্য; লক্ষ রাখতে হবে কে এবং কীভাবে তাকে চালাচ্ছে; আধুনিকতা যেভাবে এই ব্যাপারটাকে দেখেছে, উত্তর আধুনিকতা সেই ভাবনাকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে; সত্তরের দশকের রাজনৈতিক সংবদ্ধতায় গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরে ফেলার আহ্বান কিংবা গ্রামে গ্রামে বীজে ও শিকড়ে ছড়িয়ে যাবার সমপ্রাণতা, নব্বইয়ের দশকের বিশ্বায়নকেন্দ্রিক বিকেন্দ্রীকরণের কাছে এসে যখন তুমুল ধাক্কা খেলো – তখন কিন্তু আমাদেরও অনেক কিছু ভাববার সময় এসে গেছে; ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গেলে, কেন্দ্রনির্ভর পীড়নশৈলী স্তব্ধ করতে হলে, বিকেন্দ্রীকরণ অবশ্যই প্রয়োজন; সে সাহিত্যে আসবে কী করে – যদি আমরা জীবন না বদলাই? যদি আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন না ঘটে? আগে সময়, সমাজ ও পারিপার্শ্বিক বাস্তবের বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন, তা যদি হয়, তা হলে সাহিত্যেও আর এক আরম্ভের নব্য আকল্পচেতনা পরিস্ফুট হবে; বিবেকী বীক্ষণ এবং বিবেকী চৈতন্য ছাড়া পূর্বের পরম্পরাগত ঐতিহ্য যেমন বজায় রাখা যাবে না, তেমনই দেশ ও বিশ্বের কোথাও বিকেন্দ্রীকরণের যথার্থ উপযোগও সৃষ্টি করা যাবে না; জানি না, ঠিক বোঝাতে পারলাম কিনা – ব্যাপারটা দীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ; আসলে পাশ্চাত্যনির্ভর এবং পাশ্চাত্য আগত আধুনিকতা আমাদের বীজ ও শিকড়ের অনেক ক্ষতি করে গেছে; এখন সেই ক্ষতির মেরামত দরকার; বিকেন্দ্রীকরণ যদি সেই মেরামত হয়, তবে যুগে যুগে, কালে কালে, তাকে অবশ্যই স্বাগত...

প্রশ্ন : আপনার কবিতা নীড়ে ফেরার গান শোনায় – আপনার অভিমত—

উত্তর : মনে হচ্ছে, তুমি আমার কবিতা, সত্যি সত্যিই খুব মন দিয়ে পড়েছো; না পড়লে এমন কথা তুমি বলতে পারতে না; আসলে প্রথমেই বলি, তুমিও দেখবে – মানুষ মাত্রেরই মূল অন্তর্গত প্রবণতা নীড়ে ফেরা; জন্ম থেক মৃত্যু পর্যন্ত, মানুষ চায়, বারবার চায়, নীড়ে ফিরতে, আশ্রয়ে ফিরতে; একটু আগেই তুমি কবি শঙ্খ ঘোষের কথা বলছিলে; তিনি একবার সুমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার (বইয়ের দেখা : জুলাই সেপ্টেম্বর ২০০৯) চমৎকারভাবেই এ ব্যাপারে বলেছিলেন – 'সকলেই একটা আশ্রয়ের কথা ভাবছে, জন্ম মুহূর্ত থেকে যে কোনও মানুষের সেইটেই সবচেয়ে বড়ো সন্ধান, সেই হাহাকারই সবচেয়ে বড়ো হাহাকার, মানুষ চিরকালই শুধু আশ্রয় ভিখারি', ঠিকই বলেছিলেন তিনি; বলতে বলতে মনে

পড়ে যাচ্ছে জীবনানন্দের কথা, তিনিও বলেছিলেন, 'সব পাখি ঘরে ফেরে, সব নদী'; কিন্তু ফেরার সন্ধানটা থাকে, সত্যি কি ফেরে? ফিরতে পারে? আমার লেখালেখিও ক্রমাগত নীড়ের সন্ধান করে, কিন্তু নীড় পেয়েছে কী? জানিনা; জানিনা; আসলে চলমান জীবনটা সব অর্থেই নীড়ের স্বপ্নের ভেতর পরিক্রমা করে; ছোট্ট ছোট্ট পরিক্রমা; মা একটা নীড়, দেশ একটা নীড়, বিশ্ব একটা নীড়; আমি ঘুরতে ঘুরতে সেইদিকে যাই – যা আসলে বিশাল ও পরিব্যাপ্ত মহাজাগতিক নীড়; কি আছে সেইখানে? মূলীভূত সৃষ্টিচেতনা; এই জীবনের চরম ও পরম সত্য; এই মহাজাগতিক নীড় উদ্ভিদজগৎ প্রাণীজগৎ আর চেতনাজগৎ নিয়ে সব যুগেই একটা পার্থিব নীড় – অপার্থিব নয়, অপার্থিব নয়, অপার্থিব হয়ে যাবে কেন? আমি সবসময় পরম্পরাযোগে সেই নীড়ই খুঁজে চলেছি – যে নীড় আমাদের সেই পূর্বপুরুষের, পূর্ব ঐতিহ্যের, অবিনাশী বীজ ও শিকড়ের; একদিন আমাদের বাবারা দাঙ্গার স্মৃতি নিয়ে বরিশাল থেকে বাদুড়িয়া চলে এসেছিলেন; আজ আমি বাদুড়িয়া থেকে বরিশালে চলেছি – নীড়ের সন্ধানে, আশ্রয়ের সন্ধানে; কিচ্ছু পেতে নয়, কিচ্ছু চাইতেও নয়; শুধু বিস্মিত অবাক হয়ে বসে থাকবো বলে, গাছের পাশে, জলের পাশে, মাঠের পাশে, চলেছি - শুধুই চলেছি; কানে কানে কে যেন বলছে – তোমারও নেই ঘর, আছে ঘরের দিকে যাওয়া...

প্রশ্ন : অমিয় চক্রবর্তীর আস্তিক্যবোধের সঙ্গে আপনার কবি মেজাজের মিল – আপনার অভিমত—

উত্তর : এইবার, তোমার এই গড়ে তোলা ভাবনায়, আমি মৃদু একটা কামড় বসাবো; তাহলে তুমি বলছো অমিয় চক্রবর্তীর কথা, আমি বলবো যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর কথা; মনে আছে, সন্ধ্যেবেলা, বাবা, যতীন্দ্রনাথের 'ঘুমের ঘোরে' কবিতাটা চোখ বন্ধ করে, শোনাতেন; দেখতে দেখতে, ঘোর লাগা , আবিষ্ট, মুগ্ধ সম্মোহিত, বাবার দিকে তাকিয়ে মনে হতো ওই আমার পরমাত্মা, ওই আমার জীবন দেবতা ... মনে আছে, সন্ধ্যেবেলা, মা রান্না করতে করতে, গুনগুন গান করতেন – আমি বনফুলগো ... দেখতে দেখতে, শুনতে শুনতে, একই সমপ্রাণে, মায়ের দিকে মনে হতো ওই আমার চিরকালীন চৈতন্যময়ী, ওই আমার আদি অন্তহীন একমাত্র জগজ্জননী ... আমার ভেতরে যদি কোনো আস্তিক্যবোধ এসে থাকে, তা এসেছে ওইখান থেকে, বাবা থেকে মা থেকে ... কিন্তু মুশকিল হলো, আমাদের দেশে আস্তিক্যবোধ বললেই ঈশ্বর চলে আসে, ঐশী বিশ্বাস চলে আসে; এইভাবে ঈশ্বর থেকে বা ঐশী বিশ্বাস থেকে আমি কিন্তু কখনোই তথাকথিত আস্তিক নই, বাংলা কবিতায় যতীন্দ্রনাথ প্রথম আমূল সংশয়ে ঈশ্বর ভেঙেছেন, তাও প্রথম দিকে, ঘুমের ঘোরে কিংবা নবান্নে, পরে অমিয় চক্রবর্তী; তবে অমিয় চক্রবর্তীর অবস্থান হাঁ এবং না-এর মাঝখানে; তিনি কোথাও সোচ্চারে ঈশ্বর বা ঐশী বিশ্বাসকে বর্জন করেননি, আবার তুমুল আগ্রহে গ্রহণও করেননি; আধুনিক একটা দ্বিধা – অথচ অনাধুনিক হয়ে যাবার ভয়, হয়তো প্রবল ছিল; আমার মধ্যে যে আস্তিক্যবোধের কথা তুমি তুলেছো, সে আস্তিক্যবোধে উদ্ভিদজগৎ ও প্রাণীজগতই সতত সঞ্চরমান; একটা দীর্ঘ

দাঁড়িয়ে থাকা গাছ, একটা চুপচাপ দর্শন প্রতিভূ প্যাঁচা, একটা লম্বা সরু আঁকাবাকা পথ, একটা হরিণা – এরা সবাই, চলার পথে, কখনো আমার জীবনদেবতা কখনো জগজ্জননী; তোমাকে স্পষ্ট বলি – দেয়ালে ঝুলে থাকা একটা নীলচে টিকটিকিও কিন্তু যখন তখন আমাদের জীবনে রূপকে সঙ্কেতে জীবনদেবতা হয়ে যেতে পারে; এমনকি ময়লা লোম ওঠা কুক্কুরীও হতে পারে কাঙ্ক্ষিত, নমস্য, জগজ্জননী, আমার আস্তিক্যবোধ এই বাস্তবেরই আস্তিক্যবোধ...

প্রশ্ন : 'পরমাত্মা ও জীবনদেবতা, তুমি শুধু পাশে থেকো' – এ কোন জীবনদেবতা?

উত্তর : এই বিষয়ে আর বেশি কিছু বলতে চাই না আমি; আগের প্রশ্নের উত্তরে হয়তো কিছুটা ভাবনার উন্মোচন করতে পেরেছি; তবে এক্ষেত্রে তোমরাই শেষ কথা বলবে; তোমরা যেভাবে ভেবেছো, আমি বলবো সে ভাবেই ভাবো; তবে আমি শুধু এইটুকু সংযোগ করবো – আমি সবের মধ্যেই, জীবনদেবতা ও জগজ্জননী, দুইই দেখতে পাই; উদ্ভিদ থেকে যে কোনো প্রাণী, যে কোনো প্রাণী থেকে এই মর্ত্যের ধূলি ধূসরিত মানব-মানবী সবের মধ্যেই আমার জীবনদেবতা সবের মধ্যেই আমার জগজ্জননী... প্রেমে, যৌনতায়, সংশ্লেষে, আশ্লেষে, ঘুরতে ঘুরতে হাঁটতে হাঁটতে এই বাস্তবেই আমি নানাবিধ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় মুক্ত হয়ে আছি; সংযোগ সংসর্গ, যাবতীয় সংযোগ সংসর্গ, মলমূত্র পুঁজ, লিঙ্গ ও যোনির যুগযুগান্ত ব্যাপী মহামিলন সবের মধ্যে – সবের মধ্যেই জীবনদেবতা ও জগজ্জননী; সুতরাং তার সন্ধান আমি পাইনি – একথা বলবো কেমন করে? আসলে এভাবেই আমি বাংলা কবিতার চলমান ধারায় আস্তে আস্তে পৃথক হয়ে গেছি, আলাদা হয়ে গেছি; শ্রীচৈতন্য, রামপ্রসাদ, চন্ডীদাস, বামাক্ষ্যাপা, কাহ্ন, ভুসুকু সবাই সবাই এই মহাজাগতিক আস্তিক্যবোধে আমাদের সকলের প্রাণ – পরম্পরার মধ্যে বারবার ফিরে ফিরে আসে; আমি এই প্রাণচক্রের অংশ ও অংশীদার; আমিও এক বীজ ও শিকড় সংলগ্ন প্রাণী মাত্র; জৈব জীবনের জীবচক্রে ও বীজচক্রে পিঁপড়ের মতো শুধু এগিয়ে যাচ্ছি কোনো এক জীবনদেবতার দিকে; কোনো এক জগজ্জননীর দিকে; হয়তো বা সৃষ্টি সূচনার উৎসের দিকে, একজন প্রাণের বা প্রাণীর বেঁচে থাকবার জন্য যা যা দরকার, যৌন ও অযৌন, নীড় ও ঠিকানা, আমিও তা সর্বাগ্রে চাই; অনেকেই কাগজে কলমে বিজ্ঞাপনে নানা কিছু চায়; সেই বিজ্ঞাপনে কেউ চায় চাকরি, কেউ বা বিবাহযোগ্য মেয়ে; আমি এমন বিজ্ঞাপন মারফৎ কখনও কিচ্ছু চাইনি; কিন্তু আমি জানি – আমার কবিতা চেয়েছে; কিন্তু কী চেয়েছে? সখারূপী জীবনদেবতা; কিন্তু কী চেয়েছে? প্রেমিকারূপী জগজ্জননী, অন্যদের মতো আমিও তো রক্ত মাংসের নির্জলা এক প্রাণী মাত্র; সুতরাং প্রাণীরূপে এইটুকুতো আমি চাইতেই পারি...

প্রশ্ন : আপনার কবিতায় জলের প্রসঙ্গ –

উত্তর : ঠিক ধরেছো; এই জন্যেই আমার কবিতায় বারবার ঘুরে ফিরে জলের প্রসঙ্গ আসে; শুধু জল নয় – অগ্নির প্রসঙ্গও; আমরা সবাই জানি প্রাণের সঙ্গে, প্রাণীর সঙ্গে, সৃষ্টির আদিম এই দুই প্রসঙ্গের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে; জল ও অগ্নি – সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই আমাদের জীবনের দুই মৌল উপাদান; মিথ-পুরাণের কাহিনিগুলো পড়লেও তা স্পষ্ট বুঝতে পারবে; আমার

ধারাবাহিক কাব্যচর্চা অনুসরণ করে তুমি যদি এও বলো যে, জল ও অগ্নি, আসলে আমার জীবনের জগজ্জননী ও জীবনদেবতা, নতমস্তকে আমি তাও মেনে নেবো; আমি জানি না, বাংলা কবিতায় অন্য কোনো কবি, বারবার, এইভাবে, জল ও অগ্নিকে জীবনসংযোগের জৈব উদ্‌যাপনে স্বীকার ও স্বীকরণ করেছেন কিনা; সম্ভব নয়; আমার খুব ভালো লাগলো তুমি এই জলে দৃষ্টি রেখেছো বলে; তবে এক্ষেত্রে তোমায় একটা ব্যাপারে তীব্র সাবধানও করি, তা হলো, আমার কবিতায়, জল ও অগ্নি , নানা স্থানে নানাভাবে ব্যবহৃত হয়েছে; ফলে এরা কবিতার এক এক জায়গায় এক এক রকম ভূমিকা পালন করেছে; তুমি কিন্তু জল ও অগ্নিকে কখনোই একমাত্রিক ধরে নিও না; তাহলে কিন্তু বিরাট ভুল হয়ে যাবে; আসলে জীবন ও যৌনতাকে, আত্মগ্লানি ও অন্তর্গহন প্রজ্ঞাদীপ্তিকে, বুঝবার জন্য জানবার জন্য, আমি বহুবিধ প্রক্রিয়ায় জল ও অগ্নির সমাপতন গড়ে নিয়েছি; মানুষের গহন গভীরে যে জল ও অগ্নির যূথবদ্ধ চৈতন্য আছে – তাকে বার করে আনবার জন্য আমি শুধু কবিতাকে পথ বা সিঁড়ি হিসাবেই ব্যবহার করেছি; এছাড়া জল আর অগ্নি নিয়ে আমি কী করতে পারতাম বলো; আমিতো সামান্য প্রাণীমাত্র; সাঁতার শিখতে গিয়ে জলে ডুবে যাই, আর, উড়তে পারিনা বলে আকস্মিক পড়ে যাই অগ্নির ভিতর...

গোপীনাথ কীর্তনীয়ার মুখোমুখি

সুমন কুমার বিদ

সুমন : আপনার নাম কী?

গোপীনাথ : গোপীনাথ কীর্তনীয়া।

সুমন : আপনি কী কীর্তনীয়া?

গোপীনাথ : না না আমরা বাউল, তবে আমাদের প্রাচীন উপাধি কীর্তনীয়া। যা বংশ পরম্পরায় আজও বিদ্যামান।

সুমন : আপনার জন্মস্থান সম্বন্ধে কিছু বলুন।

গোপীনাথ : আমার জন্ম বর্ধমান জেলার গরম্বা গ্রামে। সেখানেই বড় হয়েছি তবে আমার পিতৃপুরুষ পূর্ববঙ্গের বাসিন্দা ছিলেন। পরে পিতামহ এদেশে চলে আসেন।

সুমন : বাউল কি আপনার সখ?

গোপীনাথ : বলতে পার, তবে তা বংশ পরম্পরায় অর্জিত। আমার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ সকলেই বাউল ছিলেন। তাই বলতে পার বাউলের সাথে আমার রক্তের সম্পর্ক। ছোটবেলা থেকেই বাউল নিয়ে আছি। বাউলের সাথে একরকম একাত্ম হয়ে গিয়েছি। বাউল গান গাওয়া আমাদের নেশা, এই নেশা একদিনের নয়, মাত্র আট বছর বয়সে আমার বাউলে হাতেখড়ি হয়; তারপর তা একসময় নেশায় পরিণত হয়। ছোটবেলায় দেখেছি সন্ধ্যার সময় আমার পিতা, পিতামহ এবং পাড়ার অনেকেই একসাথে বাউল চর্চা করত। সেই থেকেই একটা টান অনুভব করি। তারপর একদিন নিজেই কবে বাউল হয়ে যাই বুঝতে পারিনি।

সুমন : আপনি কোন্ সম্প্রদায়ের বাউল?

গোপীনাথ : রাধাকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের বাউল। আমার গুরুদেব (কানে হাত দিয়ে) দীনবন্ধু দাস ছিলেন রাধাকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। সেখান থেকেই আমি রাধাকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই।

সুমন : বাউল বলতে আপনি কী বোঝেন?

গোপীনাথ : বাউল হল আসলে ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে তাকে পাবার জন্য আপন হৃদয়ে ব্যাকুলতা। বাতুল বা ব্যাকুল শব্দ অর্থাৎ মনের মানুষের জন্য সাধকের যে ব্যাকুলতা তা থেকেই বাউল শব্দটি এসেছে বলে জানি। আসলে বাউল কিন্তু বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনার দ্বারা প্রভাবিত। বাউল সাধকেরা তাদের গানে যে 'মনের মানুষ', 'অধর চাঁদে'র কথা বারবার বলেছেন, কখনো বলেছেন 'অচিন পাখি', একে কখনো তুমি সাধারণ খোলা চোখে দেখতে পাবে না, শুধুমাত্র অন্তরে অনুভব করতে পারবে। সাধকের অভীষ্ট দেবতাকে মনের গভীরে উপলব্ধি

করার সাধনাই হল বাউল সাধনা। লালনের একটা গান আছে 'তোমায় হৃদ্-মাঝারে রাখবো ছেড়ে দেব না।' সাধকেরা এই মনের মানুষকে তাদের হৃদ্মাঝারে ধরে রাখতে ছেয়েছেন। বক্ষ মাঝে অনুভব করতে চেয়েছেন। এই তাদের চরম প্রাপ্তি, বলতে পার মোক্ষ, মুক্তিও বটে। তাই মনে রেখো বাউল গান নিছক গান নয়; বৈষ্ণব, শাক্ত কবিতার মতো এও সাধন সঙ্গীত।

সুমন : বর্তমানে দেখি বাউলের আধুনিকীকরণ হচ্ছে। বিভিন্ন শিল্পী বাউল গানকে গ্রহণ করছে, কিন্তু তাদের গানের ধরন পরিবর্তন হয়েছে। আপনার কি মনে হয় এই আধুনিকীকরণের মধ্য দিয়েই বাউল আপন অস্তিত্ব রক্ষা করে বেচে থাকবে? নাকি মূল শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তা একসময় মৃত শ্যাওলায় পরিণত হবে?

গোপীনাথ : দেখ বাউল আমাদের মাটির নিজস্ব সম্পদ হলেও একসময় তা নিস্প্রভ হয়ে পড়ছিল পরবর্তীকালে কিছু মহান ব্যক্তির প্রচেষ্টায় তা পুনরায় চর্চিত হতে থাকে। তাই পল্লীগ্রামের অন্তরালে মন্থর গতিতে বয়ে চলা বাউল আধুনিক নগর জীবনের ছোঁয়া পেল। বর্তমানে অতিআধুনিক জীবনে বাউলকে অনেকে নিজের প্রয়োজনানুসারে ইচ্ছামত ব্যাবহার করছে। ফলে বাউল অনেক সময় মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। তাছাড়া বর্তমানে একতারা, দোতারার পরিবর্তে নতুন অত্যাধুনিক বাদ্যযন্ত্র, যার ফলে আধুনিক সমাজে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদে বাউলকে পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে আর আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। তবে তুমি যে বললে না অস্তিত্ব রক্ষার লড়ায়, সেটা আপাতভাবে ঠিক মনে হলেও আমার মনে হয়, এই আধুনিক জাঁকজমক দীর্ঘস্থায়ী হবে না, ক্ষণস্থায়ী একটা বুদবুদের সৃষ্টি করে তা অদৃশ্য হয়ে যাবে। কিন্তু দেখ টিকে থাকবে সেই প্রাচীন বাউলই। এখনও তো ওটা নিয়েই মানুষের কৌতূহল বেশি। দু-একজন হয়তো এগুলি বিকৃত করে ভিন্নভাবে তা পরিবেশন করছে তবে তা চিরস্থায়ী আসন পাবে না।

সুমন : একসময় মানুষ স্বাধীনভাবে বাউল চর্চা করেছে। কিন্তু আজকের দিনে যেখানে দু'মুঠো অন্নের জন্য মানুষকে প্রাণপাত পরিশ্রম করতে হচ্ছে, সেখানে বাউল গান কতটা নিশ্চয়তা প্রদান করে প্রাত্যহিক জীবনে?

গোপীনাথ : দেখ প্রথমেই বলি বাউল আমরা অর্থ উপার্জনের জন্য গাই না। মনের চাহিদা থেকে 'মনের মানুষের' খোজে বাউল সাধনায় অগ্রসর হয়েছি। হ্যাঁ এটা ঠিক বর্তমান সামাজিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে অর্থের প্রসঙ্গটা এড়ানো কঠিন। অর্থ না থাকলে উপবাস থাকবে সমস্ত পরিবার। তাই এটা একটা অবশ্যই ভাবনার বিষয় তবে কি জানো বর্তমানে আমাদের জন্য সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা হয়েছে। মাসে কাছাকাছি বিভিন্ন অঞ্চলে ৩/৪টি করে গান গাওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। এছাড়া অতিরিক্ত ১০০০ টাকা মাস প্রতি সরকারি অনুদান রয়েছে। তাছাড়া পাশাপাশি চাষাবাদ রয়েছে। এইভাবে দিন ঠিক কেটে যায়। আসলে কি জানো পেটে খিদে নিয়ে নির্বিকার চিত্তে গান গাওয়ার দিন আজ অতীত। শুধু গান গেয়ে তো আজ এতোগুলো পেট চলে না।

সুমন : এই সরকারি উদ্যোগ আপনারা কীভাবে দেখছেন?

গোপীনাথ : দেখ, এটা অবশ্যই বলব একটা ভালো পদক্ষেপ। এর ফলে আমাদের মধ্যে নতুনভাবে এক উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছে। অনেকের মধ্যে দেখেছি আগ্রহ বেড়েছে। সরকারের এই স্বীকৃতি যেমন মানসিকভাবে আমাদের অনেকটা পরিতৃপ্তি দিয়েছে, তেমনি উৎসাহও বৃদ্ধি পেয়েছে। বলতে পার এই উদ্যোগ আমাদের ঝিমিয়ে পড়া জীবনে নতুনভাবে বাউলকে আঁকড়ে ধরে বাঁচার সুযোগ করে দিয়েছে।

সুমন : আজও কি গ্রামেগঞ্জে পূর্বের ন্যায় বাউলের সমান কদর আছে?

গোপীনাথ : একেবারেই নেই বলব না, তবে হ্যা আগের তুলনায় চাহিদা অনেকটা কমেছে বৈকি। একটা ঘটনা বলি শোন। অনেকদিন আগে বাচ্চা বয়েসে দাদুর সাথে গ্রামে গ্রামে একতারা নিয়ে বাউল গাইতে যেতাম। তখন কোনো গ্রামে বাউল গাইলে সেখানকার ছেলে-মেয়েরা কাজ-বাজ ফেলে গান শুনতে ছুটে আসত। অনেক জায়গায় আবার খাওয়া-থাকার ব্যাবস্থা করে দিত। রাত্রে থেকে গান গাইতে অনুরোধ করত। তখন যে খাতির ছিল, তা এখন আর কৈ? এখন তো গ্রামের পথ দিয়ে গান গেয়ে গেলেও মানুষ সেভাবে আগ্রহভরে ছুটে আসে না। এখন বড়-বড় শিল্পীদের দিয়ে আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে সুসজ্জিত মঞ্চে বাউল গাওয়ানো হয়। আমাদেরও অনেক সময় অনেক জায়গায় ডাক পড়ে, যেতে হয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় কি জানো আগ্রহটা অনেক কমে গেছে। আর আজ বাউল গানের ভেতরের কথা কটা লোক বুঝতে পারে বল, কিন্তু শোনা চাই।

সুমন : বর্তমানে নিত্য নতুন যন্ত্রের সাহায্যে বাউল গান গাওয়া হয়ে থাকে কিন্তু আমাদের সাবেকি বাউল সাধারণত দেশীয় বাদ্য ডুগি, একতারার সহায়তায় গাওয়া হত। এই আপাত ভিন্ন দুই বিপরীত প্রবাহকে মিলিয়ে আপনারা কীভাবে মানিয়ে নিচ্ছেন?

গোপীনাথ : দিন দিন সময়ের সাথে সাথে মানুষের রুচির বদল হচ্ছে। তাই একদিন যেমন গ্রামীণ দেশীয় যন্ত্র একতারা, তবলায় মানুষ মেতে ছিল আজ তা মূল্যহীন। আমরা আগে লহরী, একতারা, অনেক সময় খোল, তবলা নিয়েও গান গাইতাম। এখন মানুষ তা শুনবে না। মঞ্চে নিত্য নতুন বিদেশী বাদ্য মানুষের মনোরঞ্জন করছে। ফলে আজকের দিনে মিউজিক(Music) গানকে ছাপিয়ে যাচ্ছে। আমরাও এখন যুগের চাহিদা অনুযায়ী তালিম নিই কিছু কিছু নতুন যন্ত্রের সাথে গলা মেলানোর। যদিও সব যন্ত্রের সাথে আমরা মানিয়ে নিতে পারি না।

সুমন : আপনার কি মনে হয় আপনার সন্তান-সন্ততি মানে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই বাউলের হাত ধরে এগিয়ে চলুক? নাকি তারা শিক্ষার মধ্য দিয়ে অন্য পেশা বেছে নিলে ভালো হবে বলে মনে করেন?

গোপীনাথ : আমরা বংশ পরম্পরায় বাউল। প্রপিতামহ, পিতামহ এবং পিতা সকলেই বাউল ছিলেন। আমিও বাউল, আমার ছেলেদের রক্তেও বাউল রয়েছে। তাই ওরাও সারাজীবন বাউল নিয়েই রয়েছে। তবে আমার নাতি-নাতনিরা লেখাপড়া করে, স্কুলে যায়। আমি জানি না তারা এটা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতে পারবে কিনা। তবে তাদের মধ্যে সেই আগ্রহ দেখি না। আমার

ইচ্ছে ওরাও যেন বাউল ত্যাগ না করে। তবে কিনা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। তাই ওরা যা ভালো বুঝবে তাই করবে। ইচ্ছে হলে বাউল ধরে রাখবে নইলে শিকড় ছিন্ন হয়ে অন্য পথে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবে।

সুমন : বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকেরা, যারা দেহতত্ত্বের সাধনা করতেন তাদের মধ্যে দেখি সাধনার অঙ্গ হিসেবে একজন সাধন সঙ্গিনী থাকত। পরবর্তীকালে বৈষ্ণবযুগেও এই সাধন সঙ্গিনী বিদ্যমান। আপনারাও বাউলে দেহতত্ত্বের কথা বলেন। আপনাদেরও কি কোনো সাধন সঙ্গিনী রয়েছে?

গোপীনাথ : দেখো আমাদের তো তেমন কোনো সাধন সঙ্গিনী নেই, তবে আমাদের মধ্যে অনেকের সহকারী বাউল রয়েছে। এই যেমন আমার সহকারী বাউল হল সারদা(একটি মেয়ে)। তবে যে অর্থে বৌদ্ধ সাধকরা সাধন সঙ্গিনীর সহায়তায় দেহতত্ত্বের সাধনা করতেন সে অর্থে আমাদের কোনো সাধন সঙ্গিনী নেই।

সুমন : দেহতত্ত্বের সাধনা করতে গিয়ে বৌদ্ধ সাধকেরা যে পঙ্কিল আবর্তে পা ডুবিয়েছিলেন, আপনাদের দৃষ্টির নিরিখে সেটা আপনি কিভাবে দেখবেন?

গোপীনাথ : বৌদ্ধ সাধকেরা যেভাবে সাধনা করত সেই পথ হয়তো ভুল না। সেখানে পুরুষ-প্রকৃতির মিলনে জীবনের চরম সার্থকতা প্রাপ্ত হত। কিন্তু কি জানো সব কিছুরই সীমা থাকা প্রয়োজন। সীমা অতিক্রম করলেন মানে তুমি বিপথে চালিত হলে। এখানে সংযমের প্রসঙ্গটা এসে যায়। এই সংযম না থাকলেই তুমি ভুল পথে পা বাড়ালে, তার ফলেই হয়তো তোমার চরম সর্বনাশ হতে পারে। ঠিক এই কথা খাটে বৌদ্ধ সাধকদের ক্ষেত্রে; তারা প্রথম দিকে সঠিক মার্গে চালিত হয়েছেন, কিন্তু কর্দমাক্ত; পিচ্ছিল পথে পা ঠিক রাখতে পারেননি, স্লিপ করেছেন। সংযমের অভাবেই তাদের এই দশা। নইতো তাদের থিয়োরি খুব মজবুত ছিল। সেটা ধরে রাখতে তারা ব্যর্থ হল। আসলে কি জানো সব কিছুরই ভালো খারাপ দুটি দিক থাকে; তারা যেমন ভালো দিকটাকে গ্রহণ করেছিলেন, অনেকে তেমনি খারাপ পথে পা বাড়িয়েছেন রিপুর তাড়নায়। তাই আমি বলব সংযমই হল প্রধান ফ্যাক্টর। যদি সংযম থাকে যে কোনো কাজই নিষ্ঠার সাথে করলে সফলতা পাবে।

সুমন : এই মনের মানুষের খোজ যেখানে দ্বিজ ভূষণ বলেন - "তোমায় হৃদ্‌মাঝারে রাখিব ছেড়ে দেবনা/ছেড়ে দিলে সোনার গৌর আর তো ফিরে পাব না" – এই যে খোজ তা কী আপনার ভ্রান্ত বলে মনে হয়?

গোপীনাথ : ভ্রান্ত কেন হবে। সবই বিশ্বাস। তুমি কি ঈশ্বরের বিশ্বাস কর না? তুমি কি ঈশ্বর দেখেছ? না, তবে তবুও তুমি তাকে মনে মনে ডাক; বিপদ পড়লে তার কৃপা প্রার্থনা করে মনে স্মরণ কর। এই তো মনের মানুষ। যার মাধ্যমে তুমি ভবসাগর পার হবে, যে তোমার উত্তরণ ঘটাবে সেই তো মনের মানুষ। শ্রীরামকৃষ্ণ, বামাখ্যাপা এরা তো কালী সাধনার মাধ্যমে মনের মানুষের সাধনা করেছেন পেয়েওছেন তা কি তুমি মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিতে পার। তারা তাদের জীবনের চরম সত্য তো এই সাধনার পথেই পেয়েছেন। ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেব

ভাবাবেশে আকুল হয়ে নৃত্য করতেন কিভাবে? অন্তরে কৃষ্ণকে অনুভব করেছেন বলেই তো সম্ভব হয়েছে। এদের কথা ছাড়ো ভবাপাগলা, লালন ফকিরকেই দেখ না। মনের মানুষের অন্বেষণে সারাটা জীবন নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। তা কি এমনি এমনি, অন্তরে এমন কিছু উপলব্ধি করেছেন যা তাকে প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করেছে, পথচ্যুত হতে দেয়নি। আর যদি বল আমার কথা তাহলে বলব, সাংসারিক যন্ত্রণাময় জীবনে গৃহে নিভৃতে এই যে আমরা বাউল গাই তাতে মনে শান্তি পাই। এটাই আসল কথা তুমি কি করছ; কেন করছ; আর এতে তুমি মানসিকভাবে শান্তি পেলে কিনা; যদি এই কথা মনে রাখ - আর তোমার কৃত কাজের মধ্যে শান্তি খুজে পাও, আনন্দ পাও তাহলে বুঝবে তুমি জিতে গেছ। জানবে তুমি মনের মানুষ পেয়ে গেছ।

সুমন : আপনার স্বরচিত কোনও গান রয়েছে? শোনাবেন একটু?

গোপীনাথ : হ্যা, গান আমরা লিখি বইকি; সময়ের প্রয়োজনে লিখতেই হয়। লেখার তাগিদ অনুভব করলেই আপনা থেকেই গান বেরিয়ে আসে। আমরা খুব ছোটবেলা থেকে দামোদরের বন্যা দেখছি। তখন হুঠহাট খুব বন্যা হত; এখন তো পরিস্থিতির অনেক বদল হয়েছে। সরকারী উদ্যোগে এখন বন্যা নিয়ন্ত্রণ অনেক সহজ হয়ে গেছে। তো ১৩৮৫ সালে আমাদের এখানে দামোদরে খুব বন্যা হয়েছিল। অনেক ক্ষতি হয়, ঘর-দোর, গরু-ছাগল অনেক ভেসে যায়। প্রচুর ক্ষতি হয়েছিল সেবার। অনেকে মারা যায়। তো সেই ঘটনাকে নিয়ে একটা গান লিখি। এ অঞ্চলে তখন এই গানটা খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।

(হারমনিয়ামের সহযোগে গাইলেন)

“ওরে গেলরে দেশ ভেসে গেল
বন্যারই জলে।
ওরে ১৩৮৫ সালে মঙ্গলবারে
এমন বৃষ্টি নামল রে ভাই, সৃষ্টি গেল রসাতলে
বন্যারই জলে।
ওরে সকালবেলা বন্যা এল
ঘর-বাড়ি সব ভেসে গেল।
কত মানুষ, গরু-ছাগল-ভেড়া
ওরে ভেসে যাচ্ছে নদীর জলেতে
গেল রে দেশ ভেসে গেল
বন্যারই জলে।
ওরে ছেলে বলে মায়ের কাছে
আমায় কিছু দাও মা খেতে রে
আমাদের ক্ষুধায় উদর জ্বলে যায় মা
আমরা বসে গাছের ডালেতে
গেল রে দেশ ভেসে গেল
বন্যারই জলে।

আরে গোপীনাথ তাই বলেছে রে ভাই
এখন হার ছাড়া আর গতি নাই
গেল রে দেশ ভেসে গেল
বন্যারই জলে হায়! বন্যারই জলে।"

সুমন : বাউল তো শুধুমাত্র গান নয়, বাউল মানুষের সুখ-দুঃখময় জীবনের কথা বলে। এই যন্ত্রনাময় জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখা যায় এমন কোনো গান কী শোনাবেন?

গোপীনাথ : হ্যাঁ আমারই লেখা একটি গান আছে। তখন আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমার একটি খারাপ রোগ প্যারালাইসিস হয়েছিল, মনে হয়েছিল আর হয়তো বাঁচব না তাই একটি গান লিখেছিলাম ।

(হারমনিয়াম সহযোগে)
"এখনো কি বসে বসে
তুমি ভাব, তুমি সাজলো
এবার তোমার আর এক বিয়ে হবে।
ওরে চার জনাতে কাঁধে লয়ে
তোমায় লয়ে যাবে, তুমি সাজলো
এবার তোমার আর এক বিয়ে হবে
তোমার মা কাঁদিবে ও সজনী, বিয়ের কথা শুনে
পুত্র-কন্যা কাঁদিবে বসে মাথায় হাত দিয়ে
মাথায় হাত দিয়ে" (সংক্ষিপ্ত)

সুমন : আচ্ছা এই গানে মৃত্যু অর্থে বলতে চেয়েছেন - 'এবার তোমার আরেক বিয়ে হবে' — একদিকে বিয়ে মানে নতুন জীবনের সম্ভাবনা, অন্যদিকে মৃত্যু মানে জীবনের অবসান। সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী এই দুই জিনিসকে কেন্ মিলিয়ে দিয়েছেন?

গোপীনাথ : আসলে আমাদের গ্রামেগঞ্জে একথা প্রচলিত যে, মানুষের তিনবার বিয়ে হয়। জন্মের পর ছয় মাসে যে প্রথম ভাত খাওয়ার অনুষ্ঠান বা তোমরা যাকে বল অন্নপ্রাশন সেটা প্রথম বিয়ে; দ্বিতীয় বিয়ে হল যখন কোনো পুরুষ বা নারী পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়। তৃতীয় বিয়ে হল তার মৃত্যু। সেই প্রসঙ্গে আমার এখানে আবার বিয়ের কথা এসেছে। তুমি বললে জন্ম ও মৃত্যু বিপরীতধর্মী তাহলে কেন দুটোকে এখানে এক করা হয়েছে। আসলে আমরা মনে করি মৃত্যুর পর মানুষ স্বর্গে বা নরকে যায়। সেখানে তাকে কর্ম ফল অনুযায়ী শাস্তি পেতে হয়। কিন্তু আসলে তা কি হয় আমরা কেউই জানি না। বাউল মনের মানুষের খোঁজ করে। তারা বিশ্বাস করে জীবনের অন্তিম লগ্নে বা তার পরে সে এই মনের মানুষের সাথে মিলিত হবে। তাই মৃত্যুকে নঞর্থক না ভেবে এক জীবন থেকে নতুন জীবনের সূচনারূপে দেখতে পারি। সে জীবনে হয়তো মিলন হবে মনের মানুষের সাথে। একই সাথে আমরা এই গানে পাই আরও একটা জিনিস সেটা হল সাধারণ পারিবারিক জীবনের সুখ-দুঃখের কথা। মৃত্যু হলে পরিবারে ঘনিয়ে আসে চরম দুর্যোগ। চার জনের কাঁধে চড়ে ফুল, চন্দনে সজ্জিত করে তাকে নিয়ে

যাওয়া হয় নদীর ঘাটে। লক্ষ করবে বিয়ের সময়ও ফুল চন্দন মাখিয়ে বরকে চারজনের কাঁধে পাল্কীতে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হত। তবে এখানে ব্যাপারটা ভিন্ন; মা কাঁদে, পুত্র-কন্যারও অশ্রু থামে না। তাই এই অন্তিম বিয়ে মানুষের জীবনে নিয়ে আসে চরম অসহায়তা; এইভাবে গানের মধ্য দিয়ে উঠে আসে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখের কথা।

সুমন : বাউল মানুষকে উত্তরণের পথ দেখাতে পারবে বলে আপনি মনে করেন? আজকের দিনে বাউল কতটা প্রাসঙ্গিক।

গোপীনাথ : দেখ তোমার প্রশ্নটি হয়েছে শহরকেন্দ্রিক জীবনের প্রেক্ষিতে। এটা তোমার পক্ষে বোঝা মুশকিল হলেও, একেবারে অসম্ভব নয়। আচ্ছা বুকে হাত দিয়ে বল শহরের মাঝে তুমি কি একাকিত্ব বোধ কর না? আমি জানি কর। গানও শোনো। শহরের থেকে দূরে কোনো প্রত্যন্ত অঞ্চলে দিন কয়েকের জন্য কাটিয়ে এসো না। সেখানে থেকে, মাটিতে বিছানো মাদুরে, সন্ধ্যার অন্ধকারে টিমটিমে আলোর মাঝে বসে বাউল গান যদি শোনো আমি কথা দিচ্ছি সেই মুহূর্তে শহরের যান্ত্রিক জীবন তোমার কাছে তুচ্ছ বলে মনে হবে। মানসিক শান্তি লাভ করবে। এট কি মুক্তি নয়? উত্তরণ নয়! আমাদের এখানে কত মানুষই তো আসে শহর থেকে, দু-একদিন থাকে, গান শোনে, মনের ভার কমে। আচ্ছা এখানে নাই বা এলে, কিন্তু শহরে বসেই যদি কোনো এক মন খারাপের দিনে তোমাদের ওই বড় বড় ফোনে বাউল গান শোনো দেখবে তোমার মন ভালো হয়ে যাবে। এটাই উত্তরণ। মানছি সাময়িক কিন্তু উত্তরণ তো। তাহলে দেখো বাউল আজকের দিনেও কতটা প্রাসঙ্গিক। আজও বহু মানুষ বাউল শোনে, ভবিষ্যতেও শুনবে। বাউল বাংলার মাটির নিজস্ব সম্পদ তার মানে আমাদের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। আশা করি তোমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পেয়েছো।

BENGALI DEPARTMENT

Ramakrishna Mission Vidyamandira

(A Residential Autonomous College affiliated to Calcutta University)

Belur Math, Howrah-711 202, West Bengal

Phone : (033) 2654-9181/9632

Website : www.vidyamandira.ac.in • e-mail : vidyamandira@gmail.com

9 788193 476277